নির্বাচন '৯৬

এনজিও

প্রশাসন
কালো টাকা

এবং
কারচুপি

গোলাম ফারুক সম্পাদিত

নির্বাচন '৯৬
এনজিও প্রশাসন কালো টাকা
এবং কারচুপি

গোলাম ফারুক সম্পাদিত

মিম্‌মা প্রকাশন, ঢাকা

www.pathagar.com

নির্বাচন '৯৬
এনজিও প্রশাসন কালো টাকা
এবং কারচুপি
গোলাম ফারুক সম্পাদিত
প্রকাশক ঃ
মিম্‌মা প্রকাশন, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান
মূল্য ঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

Nirbachan '96 NGO Proshasan Kalo Taka abong Karchupy
(Election '96 NGO The Bureaucracy Black money & Corruption)
Edited by : Golam Farouque, Mimma Prokashan, Dhaka.
Price : Taka 70.00 US$ 5

www.pathagar.com

সূচী

১. জয়-পরাজয়ের সংসদ '৯৬ ঃ আমলা, এনজিও এবং পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা
আয়াজ এম. রহমান ৫

২. দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী এনজিও'র ভূমিকা
খোকা চৌধুরী ১৩

৩. নির্বাচন '৯৬ ঃ কেয়ারটেকার সরকার প্রশাসন ইত্যাদির ভূমিকা
মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৭

৪. নির্বাচনে সহায়তার নামে ফেমা কি করতে চায় ২৬

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ
মুজাহিদুল ইসলাম ৩৫

৬. এনজিও ঃ দারিদ্র ব্যবসা ও বণিকের রাজদন্ড
মীযানুল করিম ৪৪

৭. নির্বাচনে প্রার্থীরা কোটি টাকা ব্যয় করলেন কেন
নাজিম উদ্দিন মস্তান / মিলন ফারাবী/মিজু রহমান ৫৩

৮. নির্বাচন ও এনজিও'র ভূমিকা
মিজানুর রহমান ৬০

৯. নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয়ে নির্মূল কমিটির ভূমিকা এবং বিবিধ প্রসঙ্গ
সোহেল মাহমুদ ৬২

১০. গ্রামীণ ব্যাংক ঃ মহাজনী শোষণের অভিনব হাতিয়ার
মীর ইলিয়াস হোসেন ৭১

১১. পাঁচ রকমের ভোট চুরি
রাহমান মাসুম ৮৯

১২. নির্বাচনী কারচুপি ঃ ৯৬ স্টাইল
এ কে এম বদরুদ্দোজা ৯৩

১৩. অবাধ নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচনের স্বরূপ
সালাউদ্দিন বাবর ৯৭

www.pathagar.com

১৪. নির্বাচন তদন্ত কমিটি বিলুপ্ত করা হল কেন
মিজু রহমান ১০২
১৫. এক নজরে ভোট কারচুপির নানা কৌশল ১০৪
১৬. নির্বাচনী জরীপ ব্যবসা
আবু বকর সিদ্দিকী ১০৫
১৭. বাংলাদেশে নির্বাচন '৭৩-৯১ ..... ১০৯
১৮. নির্বাচন '৯৬ ঃ দলগত অবস্থান
সালাউদ্দিন বাবর ১১৫
১৯. নির্বাচন ১২ জুন '৯৬ ঃ ভোট কারচুপির দলিল
গ্রন্থনা ঃ তাহমীদ আল ফারুক ১৪২
২০. একটি জাতীয় দৈনিকের দৃষ্টিতে নীল নকশা নির্বাচন নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব এবং
নির্বাচনের আগের রাতে দান খয়রাত ১৮৪
২১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত করে বিদায় নিলেন
আবদুস শহিদ ১৯০

www.pathagar.com

জয় পরাজয়ের সংসদ '৯৬
আমলা, এনজিও এবং পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা

আয়াজ এম, রহমান

ক্ষমতার মসনদ আইনকে জলাঞ্জলী দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ যখন কোন রাজনৈতিক দলের একমাত্র চাওয়া এবং পাওয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তখন নিয়ম নীতি, নৈতিকতা ও শৃংখলার সঙ্গে আপোষ করে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়। বৃহৎ জনগোষ্ঠি এটা বোঝেনা কেননা তাদের দায় দায়িত্ব অতি সীমিত। বাংলাদেশের গত ১২ই জুনের সংসদ নির্বাচন শেষে সংখ্যাধিক্য পেয়ে এবং তার সঙ্গে অন্য দু'টি দলের সমর্থন নিয়ে ইতোমধ্যেই সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা এবং অসীম ত্যাগের ফলাফল তারা লাভ করেছে। তাদের যা পাবার তারা তা পেয়েছে। দেশের সর্ব বৃহৎ বিরোধী দল বিএনপি ক্ষমতা ত্যাগ সত্তেও বহু সংখ্যক আসন জিতে নিয়েছে। তারা পুনঃক্ষমতা পাবার প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। গত কিছু দিনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বাভাবিক ভাবে তরান্বিত হয়েছিল যে পেছন ফেরার কথা কেউ চিন্তা করছেন না। ভালো হতো যদি সবাই পেছনের দিনগুলো তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে সবার জন্যে কাজ করতেন। কিন্তু তাতো হবার নয়। কারণ সাম্প্রতিক অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি না দিলে বিশ্লেষণ না করলে এবং ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচনা না হলে একই বিষয়ের পূণরাবৃত্তি হবে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তা সুবিচার বলে বিবেচিত হবে না। কেননা অন্যায় অব্যবস্থা ও অবৈধ নিয়মকে মেনে নেওয়া যেমনি পাপ তেমনি এ সম্পর্কে একবারে চুপ থাকাও অনুচিত।

২। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে পনেরই ফেব্রুয়ারীর 'অবৈধ' নির্বাচন। নির্বাচনকে অবৈধ বলার নৈতিক ও আইন সংগত ভিত্তি এখন আর নেই। সেই নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সংসদে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বৈধতা নিয় প্রশ্ন ওঠেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন এবং সে ১২ই জুনের নির্বাচনের পর গঠিত সরকারকে যদি কেউ অবৈধ সরকার বলে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে বিকৃত মস্তিস্ক প্রসূত বলে অথবা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। অথচ ক্ষমতার মসনদে আসীন আওয়ামী লীগের সমর্থক পত্রিকা বা বুদ্ধিজীবীদের অনেকে এখনো সাবেক বিএনপি আমলের সর্বশেষ সাংবিধানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাসহ

www.pathagar.com

অন্যান্য ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। আইন অনুযায়ী সংবিধান অনুযায়ী যদি বর্তমান সরকারকে বৈধ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বলা যেতে পারে তাহলে বর্তমান সংসদকে সপ্তম জাতীয় সংসদ বলতে আপত্তি বা অনীহা কেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন না হলে ১২ই জুনের নির্বাচন হতো না। অতএব ষষ্ঠ জাতীয় সংসদকে বাদ দিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদ কল্পনা করা এক ধরনের অবৈধ মানসিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টারই শামিল। দুঃখ জনক হচ্ছে আওয়ামী লীগসহ সব দল এ বিষয়টি চেপে যেতে চাচ্ছে, অর্থাৎ ক্ষমতা। সেজন্য বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়ে নিজেদের অধিকতরো বৈধ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বিএনপির ক্ষমতা ত্যাগের প্রাককালে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকটি অভূতপূর্ব ও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল যা এদেশের ইতিহাসে এই প্রথম। অবশ্য এ প্রথম বলেও এসব ঘটনার পটভূমি রচিত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং পরিকল্পিত উপায়ে। এসব ঘটনার প্রথমটি হলো দেশের রাজনীতিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ কর্তৃক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচন পর্যবেক্ষনের নাম করে সারা দেশে দেশী বিদেশী ব্যক্তি ও সংস্থার অনধিকার চর্চা।

৩। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনৈতিক কার্যক্রমে যে তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করেছিলো অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি গ্রুপ, এনজিও সমূহ এবং তথাকথিত নির্বাচন পর্যবেক্ষক বাহিনী, তারা বস্তুত আগে ভাগেই একটি পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং সে পক্ষকে নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে দেখার জন্য তারা সর্ব প্রকার আয়োজন সম্পন্ন করেই মাঠে নেমেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম তাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়তা করেছিল। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই অন্য কারুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪। বর্ণিত তিনটি শক্তির চূড়ান্ত টার্গেট ছিল দু'টো শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা আদর্শ। প্রথমতঃ ইসলামপন্থী দল ও জোট সমূহ এবং এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী। এদের দ্বিতীয় টার্গেট ছিল বিএনপি বা জাতীয়তাবাদী শক্তি। এ ক্ষেত্রে আবার কিছুটা অগ্রাধিকার ছিল।রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি এখন পরিচ্ছন্ন বা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে পরিচিত নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে তারা দূর্নীতি ও শোষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াও এমন অনেক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিল যারা জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের সমূহ ক্ষতিসাধনের জন্যই এ দলটিতে আশ্রয় নিয়েছিল অত্যন্ত কৌশলে। শেষ পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে বিএনপির আদর্শ চ্যুতিতে তারা সফলও হয়েছে। এ কারণে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে দেশের ব্যাপক সংখ্যক নিরব জনতা তাদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। অথচ

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সেই জনতাই দেখলো যে বিএনপি বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। বিএনপি ইসলামী নীতি নৈতিকতা ও আদর্শের সঙ্গে বেঈমানী করেছে আর আওয়ামী লীগ ক্ষনিকের জন্যে হলেও আল্লাহ রাসুলের (সাঃ) নাম করে জিকির আজকার করে মাথায় কালো কাপড় পরে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগকে তারা নিরাপদ ভাবলো।

তা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলের ঐতিহ্য, এলাকা ভিত্তিক নেতৃত্ব, কোন কোন ক্ষেত্রে ভালো কাজ এবং এককভাবে দল নেত্রীর ইমেজের কারনে ক্ষমতাচ্যুত হলেও বিএনপির অবস্থান একবারে নড়বড় হয়ে যায়নি। জাতীয় পার্টির দু' প্রধান নেতা যদি তাদের পুরোনো অভ্যাস অথবা আদর্শের মহব্বতে আওয়ামী লীগকে আগাম সমর্থন না দিয়ে বিএনপিকে সমর্থন দিতো তাহলে বিএনপি ক্ষমতার অনেক কাছাকাছি গিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেও পারতো। জাতীয়পার্টির আওয়ামী অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৭টি আসনে নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েই সর্বপ্রকার সংশয় ও ঝুঁকি মুক্ত হলেন। এটি কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে ঘটে গিয়েছিল এমন ভাবারও কারণ নেই। আমার মনে হয় এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রাচীন ও পরিকল্পিত রূপরেখার বাস্তবায়নও হতে পারে।

ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রের অগ্রাধিকার তালিকায় প্রথমটি হচ্ছে ইসলামী শক্তিসমূহ। যেহেতু জামায়াত ইসলামী বিগত বছরগুলোতে কিছুটা হলেও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছিলো সেহেতু সেই রাজনৈতিক শক্তিকে এ মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত না করা হলে ভবিষ্যতে ত্রিমূখী ষড়যন্ত্রের হোতারা এদশে অবাধ অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চালাতে ব্যর্থ হবে। এই চিন্তা থেকেই ইসলামী বিরোধীরা গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে সরকার বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগোনোর সুযোগ গ্রহণ করে তারা প্রবেশ করে আমলাতন্ত্রে, তারা গঠন করে এনজিও, তারা সংগঠিত করে তথাকথিত মানবাধিকার গোষ্ঠি, এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী।

বালা বাহুল্য, এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা বিএনপি আঁচ করেত পারেনি। তাদের এক ধরণের অহমিকা ছাড়াও ছিল অদক্ষতা। এছাড়া তাদের ভেতরেও ছিল সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরই বসবাস। সুতরাং তারা সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্রের কৌশল তাদেরকে আভ্যন্তরীন ভাবে দুর্বল করে রেখেছিল। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর হিসেবে দারুণ ভুল ছিল। শেষতক তারা শত্রু মিত্র ভুলে গিয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে লাগলো। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে জামায়াত ভেবেছিল অনেক রাজনৈতিক বন্ধু তারা পেয়েছে। কিন্তু তা ছিল ক্ষণিকের ধোকা। এবং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়েছে আওয়ামী লীগ। জামায়াত বুঝতেই পারেনি তাদের সীমাবদ্ধতার সীমানা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত সেই পাকিস্তানী আমলেও ছিল অগ্রণী শক্তি। জামায়াত প্রধানের ভাষা আন্দোলনের অতীত নিয়ে মানুষের কোন ভাবনা নেই। বাংলাদেশের মানুষ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে স্বৈরাচার বা

www.pathagar.com

দূর্নীতিবাজদেরও মাথায় উঠাতে পারে যদি মানুষকে সেভাবে বোঝানো যায়। গত নির্বাচনেও তাই হয়েছে। জামাতের গণতান্ত্রিক মিত্রদের দেশী বিদেশী প্রভূরা, মন্ত্রনা দাতারা জামায়াতকে বাংলাদেশ থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে।

৫। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা নতুন নয়। এর একটি দেশীয় এবং একটি বিদেশী ডাইমেনশন রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জামায়াত দল হিসেবে নিষিদ্ধ থাকলেও ইতিপূর্বে তারা ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধকের যে পরিচয় সৃষ্টি করেছিল তার প্রবাহ ছিল সক্রিয়। সাময়িকভাবে মুসলিম মূল্যবোধের চেতনা বাধা গ্রস্ত হয়ে সুপ্ত থাকলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে বেশ কিছু ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছিল তখন সেই সুপ্ত চেতনা আবার জাগ্রত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন এবং জামায়াতের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি অর্জনকে দেশী বিদেশী শক্তি আতংকের বিষয় বলে মনে করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত যখন ১৮টি আসন পেয়ে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দেবার ক্ষমতা অর্জন করে তখনই দেশী ইসলাম বিরোধী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক অংগণ ছাড়াও সংবাদপত্র, সাহিত্য সাংস্কৃতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বক্ষেত্রে জামায়াত বিরোধী তৎপরতা চলতে থাকে। সবচাইতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এনজিও সমূহ। জামায়াত বিরোধী ষড়যন্ত্রের আন্তর্জাতিক ডাইমেনশন হচ্ছে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। ইরান ও সুদান বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র এবং বিশ্বের বিভিন্নদেশে ইসলামী আন্দোলন ও শক্তিসমুহকে নানা কৌশলে পরাস্ত করার জন্য নিয়োজিত শক্তিসমূহ আন্তর্জাতিক এনজিও সমূহ, তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন এবং পর্যবেক্ষক মহল বাংলাদেশে ইসলামী চেতনার সৃষ্টি ও বিকাশকে বিনষ্ট করার জন্য যে পরিকল্পনা এঁটেছিল জামায়াত তাতে পরাস্ত হয়েছে। জামায়াত মনে করেছে গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রিয় পাত্র হবে। এটি যে ভূল জামায়াত নেতৃত্ব সম্ভবতঃ এখন বুঝতে পারছেন। যে তিনটি শক্তি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে পরাস্ত করার জন্যে কাজ করেছে তার প্রথমটি হচ্ছে আমলা চক্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের শাসনামলে আমলারা ছিল নিগৃহীত। নানা ধরণের দমন নীতি ও বৈষম্য এবং স্বজনপ্রীতির ফলে আমলারা আতংক গ্রস্ত ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্টের পর আমলারা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে শুরু করে। জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ আমলে আমলারা মোটামোটি সুখেই ছিল । তবে এই দুই আমলে বহিরাগতদের প্রশাসনে এনে আত্মীকরনের ফলে আমলাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। এরশাদ আমলে সিনিয়র আমলারা সুযোগ সুবিধার কাছাকাছি ছিলেন, বেগম জিয়ার আমলে আমলারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রম যে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কার্যক্রম সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে তোলে। আমলাদের একটি অংশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় নিজেদের প্রিয় ও পছন্দের দলকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন শুরু করে। বস্তুতঃ বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে জনতার মঞ্চে আরোহণকারী কর্মকর্তাদের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থক। ঘটনাটি ব্যতিক্রমী এজন্যে যে, পাকিস্তানের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে যোগদানকারী বাঙালী কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই সে সময় প্রত্যক্ষ ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বামপন্থী কিংবা সুবিধাবাদী বুর্জোয়া মুৎসুদ্দিদের দল আওয়ামী লীগের সমর্থক থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে যোগদানের পর এরা পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির সেবা ও সহযোগিতা করেছিলেন। তারা কখনো সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়নি। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সহায়তা করেনি। উনসত্তরের গণ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিনটি পর্যন্ত তাদের অনেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাকিস্তানীদের সহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। প্রশাসন ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়নি এমনকি বিপদের মুহূর্তেও। এই প্রথমবার সৈয়দ আহমদ, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সফিউর রহমান, ওয়ালিউর রহমান, আলমগীর ফারুক চৌধূরীরা এদের পছন্দের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মত হয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন তাদের জুনিয়র সহযোগিরা। আরো দু'টো দল জামায়াত ও জাতীয়পার্টি আন্দোলনে থাকলেও আমলারা সেসব মঞ্চে যাননি।

অবশেষে বিএনপির পদত্যাগের পর যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলো তখনই ক্ষমতাসীন হলেন আওয়ামী লীগ সমর্থক আমলারা। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য আওয়ামী লীগকে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিএনপির ক্ষমতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই। মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমদের সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই আওয়ামী দলীয় আমলাদের নিয়ন্ত্রনেই কাজ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে যেমন গুরুতর প্রশ্ন না উঠলেও একথা সত্যি যে দেশের সচিবালয় থেকে শুরু করে জেলা থানা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মতো শক্তি নির্বাচন কমিশনের নেই।

নির্বাচনের আগে ও পরে নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বহু অভিযোগ ও নালিশ হওয়া সত্ত্বেও তারা সামান্যই কর্ণপাত করেন। নির্বাচন আচরণবিধি লংঘন করা প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর পরই বিভিন্ন দল এমনকি আওয়ামীগও নানা রকম কারচুপির অভিযোগ উথাপন করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি ব্যবস্থা নিয়েছে বা নেবে তা স্পষ্ট নয়। সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর একজন প্রার্থীকে অনেকটা লাজ লজ্জাহীন ভাবেই দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

সবকিছু দেখে শুনে মনে হয়েছে যে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের জন্য এক শ্রেণীর সরকারি আমলা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য লজ্জার এবং ভবিষ্যত সরকার গুলোর জন্য শেখার ও মনে রাখার বিষয়। যে সরকারী আমলাশ্রেণী, পেশাজীবী, সরকারি কর্মচারীদের সমিতিগুলো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলিয়েছিল, প্রকাশ্যে সরকারি ক্ষমতা সুযোগও সম্পদ ব্যবহার করেছিল এবং যাদের হস্তক্ষেপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কাজ করতে হয়েছিল তাদেরকে স্বপদে রেখে নির্বাচন করলেতা যে নিরপেক্ষ হতে পারে না তা সবাই বুঝেলেও জামায়াত বোঝেনি। জাতীয় পার্টির বোঝেও কিছু করার ছিল না। বর্তমান মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে স্বাধীনতাত্তোর মুক্তিযোদ্ধা ব্যাচের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মরত। তাই জামায়াতের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত সচেতন একথাও জামায়াত নেতৃত্ব বোঝেনি।

৬। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নিরবে কাজ করে আসছে এদেশের শতসহস্র এনজিও। বিদেশী এনজিও এবং তাদের এ দেশীয় এজেন্টরা বিগত এক যুগ ধরে সেবা ও সাহায্যের নামে বাংলাদেশের জাতীয় সত্ত্বা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সমুলে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে আসছে। তাদের তৎপরতা আশংকা জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৯১ সালে বিএনপি এবং জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধির পর থেকে। বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ও ইসলামী বিরোধী তৎপরতার একটি অংশ। পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদের মধ্যে পরিচালিত ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন ঠেকানোর নীল নকশার ভিত্তিতেই চালানো হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। এনজিওর মাধ্যমে সাহায্যের নামে তৃণমূল পর্যায়ে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য বিদেশী শক্তি কাজ করছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালনের অবকাশ থাকলেও অনেক এনজিও তথাকথিত মানবাধিকারের নামে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে। বিগত নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় দলগুলোকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে অনেক এনজিও শক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এনজিও সমূহ সরকারি নীতিমালা মেনে চলার কথা থাকলেও সরাসরি তারা রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে। যেসব সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পত্রপত্রিকা এদেশে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আসছে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দান, রাজনৈতিক বক্তব্য ও বিবৃতি দানের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে সমর্থন দানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে এনজিও গুলো রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী শক্তিসমুহের জোরালো সমর্থনের কারণে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধির মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। এনজিওদের শক্তিশালী সংগঠন 'এডাব' ইতিমধ্যেই একটি রাজনৈতকি শক্তি

www.pathagar.com

হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সংগঠন ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কাজ করলেও বিগত সরকার নিজস্ব দুর্বলতার কারনে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সদস্যরাও এনজিও কার্যক্রমের সংগে জড়িত। নিজ নিজ এলাকায় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনজিওর মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে রাজনৈতিক এলিটরা সক্রিয়। কর্মকাণ্ডে সক্রিয় বলে কেন্দ্রীয়ভাবে এনজিও সম্পর্কে কিছু বলা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দুঃজনক হলেও সত্যি যে বিএনপি আমলেই এনজিওদের বাড়াবাড়ি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। বিএনপির প্রশ্রয় পেয়ে কোন কোন এনজিও বিএনপির ঘোষিত আদর্শ ও নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

জামায়াতসহ ধর্মীয় দলগুলোকে ঠেকানোর জন্য বিএনপির একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এনজিওদের উৎসাহিত করা হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত ঐসব এনজিও বিএনপি বিরোধী আওয়ামী লীগের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আন্দোলনের শেষ দিনগুলোতে কতিপয় প্রধান প্রধান এনজিও এবং এডাব রাজ পথে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জামায়াত বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি দারুন খুশী হলেও অবশেষে সেসব এনজিও সরাসরি সরকার উৎখাতের আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। গত নির্বাচনে ইসলাম পন্থীদের পরাজিত করার জন্য কোন কোন এনজিও পরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক সংযোজন হচ্ছে তথাকথিত আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের হস্তক্ষেপ। বিগত নির্বাচনে শত শত বিদেশী পর্যবেক্ষক নির্বাচন শুরুর আগে থেকেই বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো এবং যা-তা মন্তব্য দানকে সরকারিভাবে উৎসাহিত করা হয়। কমনওয়েলথ্ সচিবালয় বা সার্কের পর্যবেক্ষকদের ভূমিকাকে মেনে নিলেও বলা যায় কতিপয় পর্যবেক্ষক আগে থেকেই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে অভিনন্দিত করে এবং তাদের ফলাফলকে পূর্ব থেকে আঁচ করতে পেরে পূর্ব পরিকল্পিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। দেশের অনেক অঞ্চলে নির্বাচনে কারচুপি ও সহিংসতা সত্ত্বেও তারা এক তরফা সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। তাছাড়াও তারা অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দানের জন্য আহবান জানায় এবং প্রধান বিরোধী দলকে পরাজয় মেনে নিতে অনুরোধ করে। আমার কাছে এটি অত্যন্ত নিলর্জ্জ ও কলংকিত বলে মনে হয়েছে। তাদের তৎপরতায় মনে হয়েছে যে সব কিছু যেন আগে থেকেই সাজানো।

বিদেশী পর্যবেক্ষকের সাথে সাথে বাংলাদেশী বহু পর্যবেক্ষক দল গড়ে ওঠে। এদের কেউ এনজিও আবার কেউ মানবাধিকার সংস্থার কর্মী বলে পরিচিত। এরা বহু অর্থ ব্যয় করেছে যা এসেছে বিদেশী সূত্র থেকে। বলা বাহুল্য , জনগণের জন্যে এসব

www.pathagar.com

অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হলেও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে তথাকথিত পর্যবেক্ষনের নামে এসব অর্থ ভাগ ভাটোয়ারা করে নেওয়া হয়।

আপাত দৃষ্টিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিষয়টি জরুরী মনে হলেও ভবিষ্যতে এরই ফাঁকে শুরু হবে দেশের প্রতিটি বিষয়ে অবাঞ্ছিত নাক গলানো। এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে অযাচিত উপদেশ দিতে এগিয়ে আসবে এরা। বাংলাদেশ এবার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন করছে। পঁচিশ বছর সময়কে দীর্ঘ সময় বলা গেলেও মানতে হবে যে জাতির সামনে একটি অনাগত ভবিষ্যত পড়ে আছে। সাধারণ প্রচলিত "এক মাঘে শীত যায় না" -প্রবাদটি আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে।

আজকে অনেকে মনে করতে পারেন ত্রিমুখী প্রচেষ্টার ফলে একটি রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অন্যান্য শক্তিগুলোক উৎখ্যাত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আসলে কি তাই? আওয়ামী লীগ তার ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে ধর্ম কর্মের কথা বলায় এদেশের মানুষ বিএনপিকে পুরোপুরি বিশ্বস্ত ভাবেনি। কিন্তু এটি ভুলে গেলে চলবেনা আওয়ামী লীগ মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগ মানুষের সমর্থনে সরকার গঠন করেছে। যারা এদেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি মুছে দেবার পরিকল্পিত প্রচেষ্টার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করেছে তারাই আবার আওয়ামী লীগকে সরিয়ে বিকল্প কিছু বানানোর পথ খুঁজতে শুরু করবে॥ জনগণকে বোকা বানানো সম্ভব একবার বা দু'বার। কিন্তু জনগণ নিজেরাই নিজেদের প্রকৃত পথ খুঁজে নেবে ভবিষ্যতে। কেননা এদেশে রাজনীতি, এদেশে প্রশাসন জনগণেরই জন্যে।

www.pathagar.com

দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী এনজিও-র ভূমিকা

খোকা চৌধূরী

কোন জাতিরই সব উন্নয়নমূলক কাজ একমাত্র সরকারের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয় না। সম্ভব যদি হতোও, তাহলেও তা কাম্য নয়। এজন্য যে, তার ফলে সরকার জনজীবনের একান্ত ব্যক্তিগত থেকে সব পর্যায়ে এমনভাবে অনুপ্রবেশ শুরু করে যে তার ফলে জনজীবন শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতিতে পড়ে। সোবিয়েত ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট চীন, ফ্যাসীবাদী জার্মানী, এমনকি এই বাংলাদেশেও-অল্পদিনের জন্য হলেও-শ্বাসরুদ্ধকর বাকশালী শাসনামলের ভয়ংকর স্মৃতি, তারই সাক্ষ্য দেয়। এ জন্যই উন্নয়নমূলক কাজে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সংগঠন - নন গবর্ণমেণ্টাল অর্গানাইজেশন, সংক্ষেপে এন.জি.ও -এর ভূমিকা আছে।

একই সঙ্গে, এক জাতির উন্নয়নে অন্য জাতির সাহায্যটাও একটি ভাল জিনিষই হবার কথা। এটা আন্তর্জাতিক সহমর্মিতারই একটি দিক। জাতীয় উন্নয়নে এই বিদেশী সাহায্য সরকারী পর্যায়ে হতে পারে। আবার বেসরকারী পর্যায়েও হতে পারে। বেসরকারী পর্যায়ে তা বিদেশী এনজিও-র দ্বারাও হতে পারে।

কিন্তু এখানে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকারের সংরক্ষনের জন্য একটি জরুরী দিক হলো এই যে, এক জাতির বেসরকারী কোন সংগঠন বা ব্যক্তি অন্য আরেক জাতির বেসরকারী কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে সাহায্য দিতে হলে তা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উভয় সরকারের জ্ঞাতে এবং সার্বক্ষণিক প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হতে হবে। দাতা এন.জি.ওর নিজের দেশের সরকারের অজ্ঞাতে, বা তার তত্ত্বাবধানগত অধিকার ডিঙিয়ে যদি ঐ এন.জি.ও. অন্য কোন দেশের সরকার বা বেসরকারী কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা দেয়, তা দাতা এন.জি.ও এর নিজের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করার শামিল। এবং এই জন্য, দণ্ডনীয় অপরাধ।

একইভাবে সহায়তাগ্রহীতার দেশের সরকারের অজ্ঞাতে বা তার তত্ত্বাবধানগত অধিকারকে ডিঙিয়ে ঐ দেশের কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে ঐরূপ সহায়তা দান - সে দু'টাকার ঋণই হোক, বা বিশ হাজার টাকার একটি মোটর সাইকেলই হোক - তা, ও একইভাবে সহায়তাগ্রহীতার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকার লংঘনের শামিল। এবং একই ভাবে, একই কারণে দন্ডনীয় অপরাধ।

www.pathagar.com

বিদেশী এন.জি.ও. যখন তার ওপর দেশীয় সরকারে উপরোক্ত তত্ত্বাবধানগত সার্বভৌমত্বগত অধিকারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো তা দূরে থাক-উল্টো সেই দেশীয় সরকারের ভাঙা গড়ার তত্ত্বাবধানে নেমে পড়ে, তখন? তা সহায়তাগ্রহীতার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকারের লংঘনই শুধু নয়- তার প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনও বটে। ১৯৯৬ সনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সহায়তাদানকারী বিভিন্ন বিদেশী এবং বিদেশী-সাহয্যপুষ্ট এন.জি.ও.বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকার লংঘনে এইরূপ চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। এই ধৃষ্টতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকারের বিরুদ্ধে তথা খোদ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধমূলক কার্যক্রমের শামিল।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বুঝবার জন্য লক্ষণীয় যে, এইসব বিদেশী ও বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও-গুলো সম্মিলিতভাবে জাতীয় নির্বাচন তদারকীর মত কর্মসূচী নিয়ে "ফেমা" (ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এজেন্সী) নামক সংস্থা গঠন করে প্রায় ১ লাখ কর্মী নিয়োগ করে সারা দেশে। প্রায় ৬০টি এনজিও এই "ফেমা"র অন্তর্ভূক্ত ছিল।

মাঠ পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে জানা গেছে, এবং এনজিওদের কোন কোন কর্মকর্তা নিজেও বড় গলায় দম্ভ ভরে স্বীকার করেছেন যে নির্বাচন তদারকীর ভান করলেও আসলে তাঁরা নির্বাচনে কোন কোন দলের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য সফল প্রয়াস পরিচালিত করেন। এ বিষয়ে নীচে একটু পরে আরও বলব।

আন্তর্জাতিক আইনের চিরকালের একটাই স্বীকৃত নীতি এই যে - কোন বিদেশী, বা বিদেশীর কোন প্রতিনিধি কোন দেশেরই রাজনীতিতে অংশগ্রহন করতে পারবেনা। এমনকি তাকে প্রভাবিতও করতে পারবে না। অতীতে বহু দেশের ভেতর বহু যুদ্ধই এই নীতিটি রক্ষার জন্য হয়ে গিয়েছে। দেশের ভেতর উন্নয়ন সহায়তামূলক কাজে নিয়োজিত থাকবার অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী বা বিদেশী সাহায্য পুষ্ট এন.জি.ও.-দের বেলায়ও এই নীতির কোন বরখেলাপ হবার কথা নয়। এই নীতির বরখেলাপ হলে সেটাকে দেশের বিরুদ্ধে নীতি ভঙ্গকারী বিদেশী সংস্থার তরফ থেকে যুদ্ধমূলক কার্যক্রম বলে ধরবার কথা। তা আন্তর্জাতিক আইন মতেই।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এইরূপ উক্ত নীতি বরখেলাপমূলক কার্যক্রমের কারণেই আলীবর্দী খান, এবং সিরাজদ্দৌলাহর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন স্বাধীন সরকার তাকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুলক কার্যক্রম ধরে নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং নামক ঐ বেসরকারী সংস্থা- এন.জি.ও-এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করেন। তাতে উক্ত এন.জি.ও-এর নুন খাওয়া দেশীয় বেঈমানদের কার্যক্রমের ফলে কিভাবে অবশেষে বাংলাদেশের সরকারের প্রতিরক্ষা পঙ্গু হয়ে পড়ে, এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা হারায়, তা জানা আছে।

এখন ১৯৯৬ এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রেতাত্মার মতই আবির্ভূত হয়ে বিদেশী- ও বিদেশী-সাহায্যপুষ্ট - এন.জি. ও. উপরোক্ত নীতির

www.pathagar.com

বরখেলাপ করে দেশীয় রাজনীতিতে হয় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করছে, নয় তাকে প্রভাবিত করছে। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বগত অধিকারের বিরুদ্ধে এমন যুদ্ধমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিরোধ দাঁড় করাবার পূর্বেই উক্ত বিদেশী সংস্থাসমূহের নূন খাওয়া দেশীয় বেতনভুকেরা ঐসব বিদেশী সংস্থার পক্ষে কার্যক্রমে নেমে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ এই ধরণের একটি প্রধান বিদেশী এন.জি.ও., 'আশা'র নির্বাহী প্রধান শফিকুল হক চৌধূরী খোলাখুলিই বলে ফেলেছেন যে, এ নির্বাচনে কোন কোন দলের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পেছনে রয়েছে, "দেশব্যাপী এন.জি.ও. কার্যক্রম, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কাজ এবং সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল শক্তির প্রয়াস"[১] (দ্রষ্টব্য, 'এনজিও এবং নারী নেতৃত্ব...." বাংলা বাজার পত্রিকার ১৯/৫/৯৬)।

স্পষ্টতঃ আশা নামক বিদেশী-সাহায্যপুষ্ট এন.জি.ওটি নিজেই স্বীকার করছে যে তাদের-এবং তারা অন্য যেসব বিদেশী এন.জি.ও. নিয়ে এই দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপমূলক প্রয়াস পেয়েছে, তাদের-প্রয়াস কোন কোন দলের নির্বাচনী বিপর্যয় ঘটাতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের প্রয়াস প্রত্যক্ষভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে।

কোন দল হেরেছে আর কোন দল জিতেছে সেই প্রশ্নে না গিয়ে, এবং উক্ত এন.জি.ও. দের হস্তক্ষেপের ফলে যেইসব দল হেরেছে তাদের সমর্থনেও না গিয়ে নিছক নীতির একটি প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে। তা হলো বাংলাদেশে কোন দল জিতবে বা হারবে তা বাংলাদেশের লোকেরা নিজেরাই ঠিক করবে? না তাতে বিদেশী এন.জি.ওদের নাক গলানোমূলক 'প্রয়াস'-এর একটি নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণমূলক ভূমিকা থাকবে?

দেশীয় রাজনীতিতে ঐরূপ ভূমিকা পালন বিদেশী এন.জি.ও. সহ যে কোন বিদেশীর -এবং বিদেশীর প্রতিনিধির-জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বগত অধিকার লংঘনের শামিল। এবং এ জন্যই তা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক কার্যক্রম। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহন, বা তার সমর্থন পর্যন্ত বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহীতা। এই বিচারে এমতাবস্থায়ত' প্রতীমান হয়-আশার কার্যনির্বাহী সম্পাদক উক্ত ব্যক্তিটি খোদ আশা, তার সঙ্গে উক্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য বিদেশী এন.জি.ও., তাদের বেতনভুক কর্মকর্তা, এবং বেতনভুক কর্মী কর্মচারীরা সরাসরি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বগত অধিকারে বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতায় জড়িত। এই গুরুতর অপরাধের কি প্রতিকার, তা সকলেরই জানার কথা। তবে আশা করি, তাদের এই রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কর্মকাণ্ড যে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক-তা অনুধাবন না করেই তাতে তাঁরা সরলমনেই জড়িয়ে পড়েছেন। পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, যেসব দেশীয় অমাত্য ও সমাজপতিগণ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক সিরাজুদ্দৌলাহ বিরোধ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের অনেকেও সেই সময় তাঁদের ঐ কাজের গুরুভার অনুধাবন

www.pathagar.com

করেননি। আশা করি 'আশা'সহ বিভিন্ন এন.জি.ও.-এর যেসব দেশীয় কর্মকর্তা কর্মী এভাবে নিজের অজান্তেই এইরূপ রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কর্মকান্ড করে বসতে শুরু করেছেন, তারা তাদের ঐসব কর্মকান্ডের রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক চরিত্র অনুধাবন করে বিরত হবেন।

এন.জি.ও.-দের এইসব কর্মকাণ্ডের কোন কোনটির সাধারণ রাষ্ট্রদ্রোহীতার চেয়েও গুরুতর। সাধারণ যুদ্ধ আর রাষ্ট্রদ্রোহীতার চেয়েও বড় হলো, যে কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক কার্যক্রমের জঘন্যতম প্রকার - "জেনোসাইড"। ঘটনাচক্রে "জেনোসাইড" শব্দটির বাংলা অনুবাদ "গণহত্যা" হিসেবে প্রচলিত হয়ে পড়লেও, "জেনোসাইডে"র অর্থ "গণহত্যার" চেয়ে ব্যাপকতর। "গণহত্যার" ইংরিজি প্রতিশব্দ "ম্যাসাকার"। "ম্যাসাকার", বা "গণহত্যা", "জেনোসাইডে"র একটি ক্ষুদ্রতর প্রকার বা পদ্ধতি মাত্র।

"জেনোসাইডের" প্রকৃত বাংলা প্রতিশব্দ হবে "জাতিহত্যা"। তাই বাংলাতে যা "গণহত্যা" বলে প্রচলিত হয়ে পড়েছে তা আসলে "জাতিহত্যা"। এই "জাতিহত্যা" "গণহত্যার" চেয়েও ব্যাপকতর বলেই জঘন্যতরও।

জেনোসাইড অর্থাৎ জাতিহত্যা বা "গণহত্যা" সংক্রান্ত ১৯৪৮ সনের আন্তর্জাতিক দলীল অনুযায়ী "জাতিহত্যা" (বা "গণহত্যা") হলো যে কোন জাতিকে হয়, (১) সশরীরে নিশ্চিহ্ন করে প্রত্যক্ষভাবে হত্যা করে ফেলা- যাকে ম্যাসাকার বা প্রকৃত গণহত্যা বলা হয়; নতুবা, (২) তার সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে লংঘন, দমন বা পরিবর্তন করে জাতি হিসাবে তার স্বকীয়তাকে নষ্ট করে ফেলে তাকে পরোক্ষভাবে হত্যা করা।

বাংলাদেশে বর্তমানে সক্রিয় বিদেশী বা বিদেশী-সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর প্রায় সব ক'টি অতি সুচতুরভাবে নানারকম মুখরোচক আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলির আড়ালে, ঋণ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধাদানের লোভ দিয়ে, সরলপ্রাণ গ্রামীণ মানুষ, বিশেষতঃ মহিলাদের দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সনাতন সংস্কৃতি ও রীতিনীতি ভাঙাতে তৎপর রয়েছে। এটা 'জাতিহত্যা' অর্থাৎ জেনোসাইডের উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকার। কোথাও কোথাও "নারী মুক্তি" কোথাও "প্রগতি" ইত্যাদির নামে এভাবে বাংলাদেশের স্থানীয় ও পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ভেঙে তারা জাতি হিসাবে বাংলাদেশের স্বকীয়তাকে বিলুপ্ত করে বাঙালী জাতিকে জাতিহত্যা করছে।

জাতির উন্নয়নে এনজিওদের সহায়তা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এইসব জাতিহত্যা মূলক ও রাষ্ট্রদ্রোহী আচরণকে সচেতন ও কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

১। (দ্রষ্টব্য, 'এনজিও এবং নারী নেতৃত্ব....' বাংলাবাজার পত্রিকা ১৯/৫/৯৬)।

www.pathagar.com

নির্বাচন ৯৬ঃ কেয়ারটেকার সরকার/প্রশাসন ইত্যাদির ভূমিকাঃ আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাপা- জামায়াতের রাজনীতির সমীক্ষা

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

কেয়ারটেকার সরকারের ভূমিকা ঃ দীর্ঘ আন্দোলনের ফল হিসেবে বিএনপি সরকার পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দলীয় সরকারের অধীন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব বিধায় কেয়ারটেকার সরকারের জন্য আন্দোলন হয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করে আরও দশজন উপদেষ্টা সমন্বয়ে কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এ কেয়ারটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৩ জন সদস্য এমন ছিলেন যাদেরকে কট্টর আওয়ামী লীগার বললে অত্যুক্তি হবে না। অপর তিন জন মোটামুটিভাবে বিএনপির সমমনা। অন্যদের নিরপেক্ষ বলা যায়। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ গোটা নির্বাচন কমিশনটিই পুনর্গঠিত হয়েছিল আওয়ামী পন্থীদের সমন্বয়ে। বিশেষ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার একজন কট্টর আওয়ামী লীগপন্থী হবার সুবাদে গোটা নির্বাচন কমিশনই এ দলের পক্ষে সম্ভাব্য সকল আনুকূল্য প্রদর্শন করেছে। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট কোন অভিযোগ করা হলে সাথে সাথে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনাকে কোন অভিযোগ করেই কোন ফল পাওয়া যায়নি। শুরু থেকেই তারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রধান উপদেষ্টার হাতে রাখা হলেও কার্যতঃ সচিব তা পরিচালনা করেছেন এবং তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না। 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের তালিকা সম্পর্কে আপত্তি জানানো সত্ত্বেও প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তারা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ হলে এমনটি হতে পারতো না। ফলে 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে যেভাবে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে হেস্তন্যাস্ত করার চেষ্টা হয়েছে বা বিএনপিকে যত কঠোরভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে ঠিক সেভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে প্রশ্ন করা হয়নি। যেসব কঠিন প্রশ্ন তাদের করা যেত সাংবাদিকরা স্বেচ্ছায় তা এড়িয়ে গেছেন। সাংবাদিকদের বা প্রশ্নকারীদের এ ভূমিকা দর্শকদের নজরেও পড়েছে।

নির্বাচনের আচরণবিধি লংঘিত হয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মোটেই গ্রাহ্য করেনি। রাজধানী ঢাকায় এমন প্রার্থী ছিলেন যারা শুধু পোস্টার লাগিয়ে

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। যা দৃশ্যমান সে ব্যাপারেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন অভিযোগ পেয়ে একজন কর্মকর্তাকেও কোথাও বদলী বা অপসারণ করেনি। প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন ছিল যে শক্তি খাটিয়ে যে যা করতে পারে এ ব্যবপারে প্রশাসনের কিছুই করার নেই। এমনিভাবে ভোট কেন্দ্র সংখ্যা কখনো বাড়ানো বা প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ বা বাতিল ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক রিটার্নিং অফিসার চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত প্রিজাইডিং অফিসার পরিবর্তন করা হয়েছে বিশেষ দলকে সুবিধা প্রদানের জন্য। ভোট গ্রহণের দিনও আচরণবিধি বা আইন-কানুন মেনে চলার ব্যাপারে কোন তোয়াক্কা করা হয়নি। অনুরূপভাবে ফল প্রকাশের ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। মোদ্দা কথা কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে বর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন ছিল সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার পরিবর্তে কমিশন একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে।

অন্যান্য সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে। আর এবার যেন নির্বাচন করেছেন প্রশাসনের লোকরা নিজরাই একটি দলের পক্ষ হয়ে। সকল এলাকার জন্য এক কথা প্রযোজ্য না হলেও অধিকাংশ এলাকাতেই এটা ঘটেছে এবং বাকী এলাকায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রশাসনের একটি বড় অংশ দল বিশেষের পক্ষে জড়িয়ে পড়ার কারণে কেয়ারটেকার সরকার কার্যতঃ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

এনজিও ও পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ঃ বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোতে তালিকাভূক্ত ৯১৭টি এনজিও এবং সামাজকল্যাণ বিভাগে রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত সাড়ে এগার হাজার এনজিও কাজ করেছে। এনজিওগুলো বিদেশী অর্থে পরিচালিত বিশেষ করে বড় বড় এনজিওগুলো। এসব এনজিও আসলে বিদেশী শক্তির এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। এসব এনজিওর ভূমিকা জাতিদ্রোহীমূলক এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এদের সম্মিলিত বাজেট বাংলাদেশের বাজেটের চাইতে অনেক বড়। এসব এনজিও সরাসরি বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করে থাকে এবং এদের উপর বাংলাদেশ সরকারেরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এরা বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থাৎ আইনলংঘন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এনজিওগুলোর তৎপরতা ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। সরলপ্রাণ মহিলাদের এরা সবচাইতে বেশী বিভ্রান্ত করেছে। ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় গেলে মহিলাদের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে, কঠোর পর্দা প্রথা চালু করে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হবে, উপরন্তু এনজিওদের সুবিধা বর্তমানে মহিলারা যা পাচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে এ ধরণের মিথ্যাচার চালিয়ে মহিলাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তির ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের দুর্বলতার সুযোগ সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তি এখানে একটি বড় সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তারা বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছে এমনকি রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাও করেছে বা বৈঠকাদিরও আয়োজন করেছে। নির্বাচনে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী শক্তি আগামী দিনের বিশ্বে যে শক্তিকে প্রতিপক্ষ মনে করে সেই ইসলামী শক্তির যাতে উন্মেষ না ঘটে তার জন্য যা কিছু করা যায় সবই তারা করেছে। ইসলামপন্থীদের কোনঠাসা করার ব্যাপারে তারা আপাততঃ সফল হয়েছে।

কালোটাকার ভূমিকা ঃ '৯৬ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কালো টাকার অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অর্থ ও বিত্তের মালিকরা একটি আসনে বিজয়ী হওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। তাছাড়াও তাদের পছন্দনীয় দলগুলোকে বিপুল আর্থিক সহায়তা দান করেছে বাইরের শক্তিগুলো, এমন অনেক প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন যাদের রাজনীতি বা জনগণের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। বড় সংগঠনের আশ্রয় নিয়ে কালো টাকার মালিক, অবৈধ সুবিধাভোগী, আদম ব্যবসায়ী, অসৎ ব্যবসায়ী অনেকেই এবারে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। টাকা দিয়ে শুধু ভোটই কেনা হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে অফিসার ও পোলিং এজেন্টদেরও ক্রয় করা হয়েছে। মাস্তান ভাড়া তো আছেই।

জাল ভোট ঃ অনেকের মত রেকর্ড পরিমাণ জাল ভোট হয়েছে এবার। ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা, পরিচয়পত্র না থাকা এবং জাল ভোট প্রদানে পারদর্শীদের পরিকল্পিত অভিযান নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। যে পরিমাণ ভোট কাষ্ট হয়েছে কাগজে কলমে আসলে বাস্তব চিত্র তা নয়। বড়জোর ৫৮ থেকে ৬০ ভাগ ভোটার হাজির হয়েছে। ১৩-১৫% ভাগ ভোট জাল ভোট বা কারচুপি করে নেয়া হয়েছে।

ভোট কেন্দ্র দখল ও সন্ত্রাস ঃ সারাদেশে কম করে হলে ও পঞ্চাশের অধিক আসন এমন আছে যেখানে কেন্দ্র দখল করে নির্বাচনের জয়লাভের '৮৮ বা '৮৬ স্টাইলও হার মেনেছে। সাংগঠনিক শক্তি ও প্রশাসনকে ব্যবহার করেই এটা ঠান্ডা মাথায় করা হয়েছে। জনগণ বা কোন কোন দল সরলভাবে মনে করেছে নিরপেক্ষ ভোট হবে। কিন্তু অনেক জায়গায় ১২টার মধ্যেই নির্বাচন শেষ হয়েছে এবং লক্ষাধিক ভোট গণনার কাজ ৬টা /৭টার মধ্যে শেষ করে ফলাফল নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শেরপুরের সদর আসনে একটি ভোট কেন্দ্রে একজন সাংবাদিক রিটার্নিং অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কিছুক্ষণ আগে দেখলাম কয়েক ঘন্টায় কয়েক শত ভোট পড়েছে আর এক ঘন্টা পরে এসে দেখা গেল আরও তেত্রিশ শত ভোটারের ভোট দেয়া শেষ। এই তেত্রিশ শত ভোটার কোন দিক দিয়ে আসলেন আর গেলেন এবং এত অল্প সময়ে তারা কিভাবে ভোট দান কর্মটি সম্পাদন করলেন তা একটু বুঝিয়ে দিবেন কি? তিনি

www.pathagar.com

তার কোন সুষ্ঠু জবাব দিতে পারেননি। উপরন্তু ঐ রিটার্নিং অফিসার মটর সাইকেলের লাইসেন্স না থাকার অযুহাতে একজন অনুমতিপ্রাপ্ত কার্ডধারী সাংবাদিককে সারাদিন আটক রেখে দিন শেষে তিন হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেন। সাংবাদিকটির অপরাধ ছিল তিনি রিটার্নির্ং অফিসার মহোদয়ের গাড়ী দেখে তাকে জানিয়েছিলেন, 'পূর্বাঞ্চলে একটি দল সশস্ত্র লোকদের দিয়ে কেন্দ্র দখল করে সীল মেরে নিয়েছে।' রিটার্নিং অফিসার সে ব্যাপারে কিছু না করে সাংবাদিকটিকেও আটক করে দিলেন। রিটার্নিং অফিসারের উদ্দেশ্য ছিল এ সাংবাদিকের মারফত এ খবর অন্য এলাকায় গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লোকেরাও শক্তি প্রয়োগ করতে পারে বা এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই তিনি ঐ সাংবাদিককে আটক করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

সেনাবাহিনী নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ঃ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল সেনাবাহিনীকে সে ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়নি বা সেনাবাহিনী তা করতে পারেনি। সেনাবাহিনীকে সরাসরি কোন কাজ করতে দেয়া হয়নি। বেসামরিক প্রশাসন ডাকলেই কেবলমাত্র তারা কোথাও যেতে পেরেছেন। তাদের সামনে কিছু হলেও তাদের কিছু করার ছিল না। সুতরাং সেনাবাহিনীর থাকা না থাকায় নির্বাচনে কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

মিডিয়া ও জরীপ সংস্থার ভূমিকা ঃ ব্যতিক্রম ছাড়া সংবাদপত্র প্রায় একচেটিয়াভাবে দল বিশেষের পক্ষে বা কোন দলের বিপক্ষে কাজ করেছে। ক্ষমতায় থাকা সত্বেও বিএনপি সংবাদপত্রের আনুকূল্য পায়নি। জামায়াতের তো প্রশ্নই আসে না। বরং জামায়াত বিরোধী ভূমিকা পালনে কতিপয় সংবাদপত্র ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে। জরিপের নামে ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এসব ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই নেয়নি।

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের পিছনের কারণ ঃ

(১) আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা নির্বাচনকে গ্রহণ করেছিল অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে এবং নির্বাচনে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

(২) আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও মনিটারিং ছিল তুলনামূলকভাবে উন্নত। ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে প্রিজাইডিং, পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি ব্যাপারে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছে।

(৩) প্রচারকৌশল ও নমনীয়তা ঃ প্রচারের দিন থেকে আওয়ামী লীগ সর্বত্র এগিয়ে ছিল বলা যায়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বা দলীয় বক্তব্য নির্বাচনের আওয়ামী লীগের জন্য ইতিবাচক ফল দিয়েছে। অতীতে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে অনেকাংশে সফল হয়েছে। দলটির ফ্যাসিস্ট চরিত্রের কারণে জনমনে দলটি সম্পর্কে যে ভীতি ছিল নমনীয় আচরণ, ক্ষমা প্রার্থনা,

www.pathagar.com

গণসংযোগ, প্রচারণা 'একটিবার সুযোগ দিন', ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মানুষের সমবেদনা আকৃষ্ট করতে বেশ সফল কাম হয়। আওয়ামী লীগের কর্মীরা অনেকাংশে উগ্রতা পরিহার করে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। ভোট গ্রহণের দিনে তাদের ছিল বড় শক্ত ভূমিকা।

(৪) শেখ হাসিনার মস্তকাবরণ ও হিযাব ঃ হজ্বব্রত পালন করে এসে আওয়ামী নেত্রী যে মস্তকাবরণ ও হিযাব পরিধান করেছিলেন এবং শালীন পোশাক পরিধান করেছেন তা অনেকের কাছে দৃষ্টিনন্দন ছিল। অনেকেই এটাকে প্রশংসা করেছেন। এ কৌশলে আওয়ামী লীগ সফল হয়েছে। হাতে তসবিহ, সাদা শাড়ী, হাতের কবজী পর্যন্ত ঢাকা জামা ও মাথায় কাপড় এসব জিনিস সাধারণ ভোটারদের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে যে অন্য একজন নেত্রীর চাইতে শেখ হাসিনার চাল চলন নিরহংকার ও শালীন এবং ইসলাম সম্মত।

(৫) জামায়াতের সাথে আন্দোলন ঃ এটা ছিল বড় রাজনৈতিক কারণ আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে। বিএনপির যারা বন্ধু ছিল বা বন্ধু হতে পারতো আওয়ামী লীগ সফলভাবে তাদেরকে বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। জামায়াতের মত একটি ইসলামী দলের সাথে আন্দোলন করায় সাধারণ্যে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ধারণা হয় যে দলটি ইসলামের ব্যাপারে নমনীয় হয়েছে।

তাছাড়া দলটি যে ভারত পন্থী এ দোষও অনেকাংশে কমতে সাহায্য করে এ আন্দোলন। পক্ষান্তরে জামায়াতকে যেসব ভারত বিরোধী ভোটার পছন্দ করতেন তারা জামায়াতের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করতে থাকে বা দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। অংকের হিসেবেও আওয়ামী লীগ আন্দোলনের বেনিফিট পেয়েছে। এদিক থেকে ভারতপন্থী বা আওয়ামী পন্থী ৩০% ভাগ ভোটার অন্য দিকে ভারত বিরোধী ও আওয়ামী বিরোধী ৭০% ভাগ ভোটার। ৭০% ভোট ভাগ হয়ে গেছে তিনটি বড় দল অর্থাৎ জামায়াত, বিএনপি, জাপার মধ্যে। ফলে গত ৯১ এর নির্বাচনে অল্প ভোটে যে সব এলাকায় আওয়ামী লীগ হেরে গিয়েছিল সেসব এলাকায় অনায়াসেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জিতে গিয়েছেন।

(৬) প্রশাসন, এনজিও, মিডিয়া, কলোটাকা ঃ এসবের সুবিধা পেয়েছে আওয়ামী লীগ।

(৭) মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ঃ নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছে আওয়ামী লীগ। এ দলটির যে কোনভাবে হোক ক্ষমতায় যাওয়া উচিত এজন্য মুক্তিযোদ্ধারা যে যেখানে ছিলেন অধিকাংশই আওয়ামী লীগের উত্থানের জন্য কাজ করেছেন।

www.pathagar.com

বিএনপি কেন ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারলোনা ঃ

(১) বিএনপির মধ্যে অতি অহংকার কাজ করেছে। '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াতের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ক্ষমতা লাভের পরও নিজেদের ব্যাপারে অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল দলটির মধ্যে।

(২) মিত্রদের ধরে না রাখতে পারা বিএনপির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। যে জামায়াত বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিল সেই জামায়াতকে বিপরীত পক্ষে ঠেলে দিয়েছে বিএনপি। রাজনৈতিক দিক থেকে এটিই সবচাইতে বড় কারণ দলটির ক্ষমতায় ফিরে না আসার ।

(৩) দলে বাম ঘেষাদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং সমন্বয়ের রাজনীতি থেকে বিচ্যুতি। বি, চৌধুরীর মত প্রভাবশালী নেতারা ভারসাম্যহীন উক্তি ও বুলি গ্রহণ করে বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেন অনেকাংশে।

(৪) দলীয় আভ্যন্তরীণ কোন্দল বিএনপির অনেক প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ ঘটিয়েছে। সারা বছর কোন্দল লেগেছিল অনেক জায়গায়। সাংগঠনিকভাবে তার প্রতিকার করা হয়নি।

(৫) ছাত্রদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানী ও বাড়াবাড়ি বিএনপির বিজয়ের পথে অন্যতম বাঁধা হিসাবে কাজ করেছে। ছাত্রদলের হাতে প্রতিপক্ষ দলের অনেকেই খুন হয়েছে এবং এদের চাঁদাবাজীর কারণে অনেকে বিএনপি থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

(৬) ইসলাম ও ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বিএনপির অনাকাঙ্খিত ভূমিকা জনগণকে আশাহত করেছে। বিএনপিও কার্যতঃ ভারত তোষণ নীতিই গ্রহণ করেছিল তবে পতনের পর ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়ে অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

(৭) নির্বাচন পরিচালনা ও প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দূর্বলতা দলটির জন্য ক্ষতিকারক হয়েছে।

(৮) সন্ত্রাস মোকাবিলায় বিএনপি যথাযথ ভূমিকা নিতে বা জালভোট ও কেন্দ্র দখল ঠেকাতে বর্থ হয়েছে। অনেক জায়গায় বিএনপির নেতা কর্মীরা কালো টাকার হাতে বিক্রি হয়ে যায় যা বিএনপি রোধ করতে পারেনি।

(৯) প্রশাসন ও এনজিও এবং পর্যবেক্ষণ দল বিশেষ করে ফেমা সম্পর্কে বিএনপির ধারণা পরিস্কার থাকা সত্ত্বেও অন্য দলের সাথে সমন্বিত কোন পদক্ষেপ বিএনপি নিতে পারেনি।

(১০) জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিগুলোর সাথে নূন্যতম কোন সমঝোতায় আসতে না পারার কারণেও বিএনপি পিছিয়ে গিয়েছে। অনেকে চেয়ারপারসন বেগম

www.pathagar.com

খালেদা জিয়াকে ধারণা দিয়েছেন যে একাই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন এবং আগামী ১৫ বছর তারাই ক্ষমতায় থাকবেন।

(১১) সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা এ দলের বড় দূর্বলতা। কেয়ারটেকার ইস্যু মানতে বিলম্ব করে বিএনপি বড় ভুল করেছে।

জামায়াতের এ অনাকাংখিত ফলাফল কেন?

(১) ৩০০ আসনে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাংগঠনিক শক্তি জামায়াতের ছিল না। নির্বাচনের ব্যাপক অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল নেতাকর্মীদের ।

(২) জামায়াত ধরেই নিয়েছিল কেয়ারটেকার সরকার হয়ে গেছে কাজেই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে। এ কারণেই জামায়াত নিজের অবস্থান সম্পর্কেও যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি।

(৩) রাজনীতিতে অস্থিতিশীল ভূমিকা জামায়াতের সবচাইতে বড় ক্ষতি করেছে। '৯১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপিকে সমর্থন দান ও ২ বছর পরই আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন করায় জামায়াতের নিজস্ব ভোট ব্যাংকের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

(৪) জামায়াত সাংগঠনিক জটিলতার কারণেই তার সকল জনশক্তি ও শুভাকাংখী মহলকে কাজে লাগাতে পারেনি। আর্থিক দূর্বলতাও একটি বড় কারণ। প্রার্থীদের অর্থের যোগান দিতে সক্ষম হয়নি।

(৫) সন্ত্রাস ও জালভোট মুকাবিলায় যথাযথ কার্যপন্থা নিতে পারেনি। এজন্য জামায়াতের প্রস্তুতিও উল্লেখযোগ্য ছিল না।

(৬) কালো টাকার যে খেলা হয়েছে জামায়াতের নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যায়ের প্রার্থীরা তার মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থও খরচ করতে সমর্থ ছিলেন না।

(৭) প্রশাসন, এনজিও, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সংবাদ মাধ্যম ছিল জামায়াতের বৈরী। এসবের মুকাবিলায় জামায়াতের প্রস্তুতি ছিল না।

(৮) স্থানীয় সরকার, এলিট শ্রেণীর উপর জামায়াতের প্রভাব ছিল অনল্লেখযোগ্য।

(৯) জামায়াত যে ধরনের শাসনের কথা বলছে সম্ভবতঃ দেশের সাধারণ গণমানুষ এখনও পর্যন্ত সে ধরনের শাসনের জন্য তৈরী হয়নি। ফলে জামায়াতের আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনের শ্লোগান জনগণের মধ্যে আবেগ বা জোয়াড় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

www.pathagar.com

(১০) সাধারণভাবে যে ধরণের নেতৃত্বের দ্বারা এদেশে নির্বাচন প্রভাবিত হয় ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণেই জামায়াত তা পেশ করতে পারেনি। নেতৃবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করেছেন কিন্তু সাধারণ মজলুম মানুষের মধ্যে দলের পক্ষে আবেগ সৃষ্টি করে ভাসমান ভোটারদের টানতে পারেনি।

(১১) ইসলামী ও আদর্শের দিক থেকে কাছাকাছি দলগুলোর সাথে কোন ধরণের সমঝোতায় পৌছাতে না পারাটাও জামায়াতের অনাকাঙ্খিত ফল লাভের জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন।

(১২) জামায়াত ক্যাডার ভিত্তিক দল হওয়া সত্বেও দলকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্য জনশক্তির মাঝে যে মরিয়া হয়ে উঠা বা সিরিয়াসনেস প্রয়োজন ছিল তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

(১৩) জামায়াতের নৌকা ঠেকাও বক্তব্য বুমেরাং হয়েছে এবং তা জামায়াতের বিরুদ্ধে চলে গেছে।

(১৪) অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির কারণে মহিলাদের মধ্যে এক ধরনের জামায়াত ভীতি সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে মহিলা ভোট গ্রামাঞ্চলেও জামায়াতের বিরুদ্ধে চলে গেছে।

(১৫) জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা যেমন ১৯৭১ সালের ভূমিকা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে সে ব্যাপারে খোলাখুলি ও পরিস্কার বক্তব্য না রাখতে পারার কারণেও জামায়াতের ক্ষতি হয়েছে বলে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

উপসংহার ঃ নির্বাচনের ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে যারা ঢালাও মন্তব্য করছেন তারা আসলে সঠিক কথাটা বলতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগের বিজয় লাভকে যারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক বেশী ইতিবাচক কথা বলছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করে আওয়ামী লীগের উত্থান হয়েছে বলে ধরে নেয়া হলে মারাত্মক ভুল হবে। '৯১ এর নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে পড়েছিল কাষ্ট ভোটের ৩৮% আর এবার আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৩৭.৫%। বিএনপি পেয়েছিল ৩১ ভাগ এবার পেয়েছে ৩৪% এবং জাতীয় পার্টি ভোট পেয়েছে দ্বিগুণ এবং জামায়াতের ভোট ১২% থেকে কমে এসেছে ৯% ভাগে। কমুনিষ্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি নির্বাচনী দৃশ্যপট থেকে একেবারে ছিটকে পড়েছে। গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেনের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং সাইফুদ্দিন মানিক মাত্র চারশত ভোট পেয়েছেন। ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে এগিয়েও বিএনপি

www.pathagar.com

আসন কম পেয়েছে। জাপার প্রভাব বৃহত্তর রংপুরেই সীমিত হয়ে গেছে। আসন বাড়ে নাই, ভোট বৃদ্ধি পাওয়া স্বত্ত্বেও জামায়াতের আসন সংখ্যা ৩ এ নেমে এসেছে। এতদ্‌সত্ত্বে ভোটের বিচারে দেশে প্রধান দল চারটি। আগামী নির্বাচনের চিত্রটা কি হয় তা এখনই মন্তব্য করার সময় আসেনি। যারা মনে করছেন দ্বিদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীতে তা প্রমাণিত হয় না। ইসলামের পক্ষে যে একটি ভোট ব্যাংক বাংলাদেশে আছে তা কমুনিস্ট পার্টির মত নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা বাংলাদেশে নাই। এই ভোট সামনে বাড়বেই, কমবে না, বলেই মনে হয়। কারণ ক্ষমতায় যাবার পর আওয়ামী লীগ আর যাই করুক ইসলামের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী কায়দায় পদক্ষেপ নিলে ইসলামী শক্তির তাতে অগ্রসর হবার সম্ভাবনাই সৃষ্টি হবে। আলজিরিয়া, মিশর বা তুরস্কে তাই হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেদের আস্থা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে আশা করা যায় ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বহুদলীয় বৈচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশ স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচনে সহায়তার নামে ফেমা কি করতে চায়?

বাংলাদেশের শোষিত-লাঞ্ছিত জনগণের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ বিদেশী প্রভূরা। গ্রামবাংলার কোটি কোটি আদম সন্তান ঋণে জর্জরিত। এনজিও'র দেয়া ঋণ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে হাজার-হাজার গ্রামের লক্ষ-কোটি নারী-পুরুষ-কিশোর-বৃদ্ধাকে। লক্ষ্য একটিই--- এই অগনিত মানুষরা যাতে দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিঃশেষ হলেও রুখে না দাঁড়ান; যাতে দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়; যাতে এই সর্বস্বহারা মানুষেরা সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি না করেন; তাই গ্রামে-গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণের ভিক্ষামুষ্ঠি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিপুল আয়োজন--- গ্রামীণ ব্যাংকসহ নানান নামের হাজারো এনজিও। এমনকি বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণের ডালি নিয়ে আজ হাজির হচ্ছে দরিদ্রের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋন বাড়ছে, বেড়ে চলেছে গরীব মানুষের সংখ্যা। এ পরিস্থিতি শাসকদের জন্য সুখকর নয়। তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারে না।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকেনা; যখন শাসনযন্ত্রে স্বচ্ছতা থাকে না; যখন শাসন যন্ত্র হয়ে ওঠে বণিকের মুনাফা লোটার যন্ত্র, যখন শাসনযন্ত্র আপামর মানুষের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্খা-প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করতে পারে না; তখনি দরকার হয় শাসনযন্ত্রে গণতান্ত্রিক রীতি-আচার-পদ্ধতির প্রসাধনী প্রলেপ। দেখাতে হয়ঃ " এই দেখ, তথ্যমাধ্যম স্বাধীন, কত কথা বলে; নিশ্চিন্তে ভোট দেয়া যায়; ভোটের পবিত্র আমানত রক্ষিত হয়; আর নির্বাচিতও করা যায় মনের মত লোকদের"। এসব আবরণের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় নির্বাচনে বণিক আর শিল্পপতির পুঁজি শক্তি। নির্বাচন তথা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা দেখাতে গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন নাম ও রংয়ের সংগঠন ও জোট। রাজনীতিতে এতটুকু না থাকলে সে সমাজ বিস্ফোরিত হবে। তাই গণতন্ত্রের নামে এত আয়োজন।

এ প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে ফেয়ার ইলেকশন মনিটারিং এলায়েন্স বা ফেমা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক একটি ফিল্ম-সোসাইটিও পথে নেমেছে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে। আশি ভাগ নিরক্ষরের এই দেশে ভোট আন্দোলনকারীদের পরনের গেঞ্জিতে শ্লোগান লেখা ইংরেজীতে। আর দাতারা, যারা আজ প্রভূর ভূমিকায় সমাসীন, নিশ্চিত হতে চায় নিজেদের হাতে গড়া এই সংগঠনগুলিকে দিয়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে

www.pathagar.com

বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে। উদ্দেশ্য একটিই--- পরিস্থিতি যাতে থাকে অপরিবর্তনীয়, স্থির; যাতে স্থিতাবস্তা বজায় থাকে; যাতে শাসনযন্ত্রের উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে না ফেলে। এই কৌশলের রয়েছে এক গভীর পটভূমি। বাংলাদেশে ফেমার জন্ম সেই পটভূমিতে। কি সেই পটভূমি? অত্যন্ত সংক্ষেপে সেই প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পটভূমি

যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পারমাণবিক ভস্মের মধ্যে থেকে বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হয়। কিন্তু '৬০ ও ৭০র দশকে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিপ্লব ও গনজাগরনের ফলে মার্কিন আধিপত্যের ভিত কেঁপে ওঠে। ভিয়েতনামের জনগণ দীর্ঘ গণযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেন এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই গোটা ইন্দোচীন থেকে মার্কিন অবস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক'বছর পরেই ইরানে দুর্নীতিবাজ শাহতন্ত্রের পতন মার্কিন শাসকদের আস্থাকে কাঁপিয়ে তোলে। ক্রমহ্রাসমান আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে মার্কিন নীতি প্রণেতারা লজ্জাস্কর পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করে এবং বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সরকারগুলোকে মোকাবেলায় নয়া কৌশল নির্ধারণের কাজে হাত দেয়। এই অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে তাদের নয়া কৌশল- লো- ইনটেনসিটি কনফ্লিক্ট (এল আই সি) বা সীমিত মাত্রার সংঘাত।[১] হারিয়ে যাওয়া আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রিগ্যান আমলে শুরু হয় বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী মার্কিন তৎপরতা। সেটাই ছিল এ যাবৎকালের মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম শান্তিকালীন সামরিক প্রস্তুতি। মার্কিন শাসকরা সারা পৃথিবীতে মোতায়েন করে তাদের সকল শক্তি- রাজনৈতিক ও সামরিক। বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী জোয়ারকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন শাসকরা গড়ে তোলে নিকারাগুয়া, আফগানিস্তান ও এঙ্গোলাসহ বিভিন্ন দেশে প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহী গেরিলাদল।

মার্কিন সমরনায়করা ভিয়েতনামে পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করে নতুন যে রাজনৈতিক -সামরিক রণকৌশল দাঁড় করায়, তাতে তাদের প্রকৃত শত্রু দরিদ্র দেশগুলোর জনগণকে আর সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রতিহত করার কায়দা কৌশল রয়েছে। তবে সোভিয়েত রাশিয়া তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের কারণে বহু বছর ধরেই ভেতর থেকে ধ্বসে পড়ছিল। এদিকে মার্কিন সমরনীতি প্রণেতারা দেখতে থাকল যে সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউরোপে প্রতিহত করার জন্য তারা বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে ,অথচ নিয়মিতই লড়তে হচ্ছে অনুন্নত, দরিদ্র দেশগুলোতে, জনগণের বিরুদ্ধে। আর সে লড়াই প্রচলিত কৌশলের লড়াই নয়। তাই নাকানি-চুবানি খেতে হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে। প্রচলিত পন্থার লড়াইতে কোন কোন ক্ষেত্রে অস্ত্রশক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করে। অপ্রচলিত পন্থার লড়াইতে অস্ত্রশক্তি নির্ধারক উপাদান নয়। মার্কিন সমরনীতি প্রণেতারা এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের কারণ একটি বাস্তবতা উপলব্ধিরব্যর্থতা। সে বাস্তবতা হচ্ছে অপ্রচলিত লড়াই

www.pathagar.com

যতটুকুনা সামরিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। অতএব ভবিষ্যতে অপ্রচলিত লড়াইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি জড়িয়ে পড়তেই হয়, তাহলে কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছেঃ ক. মার্কিন অভিযানের (সামরিক রাজনৈতিক প্রচার) লক্ষ্যবস্তু হবে জনগোষ্ঠী; শত্রুর সামরিক শক্তি নয়, ঐ দেশের মানুষের মন বা চিন্তার পদ্ধতি; খ. এ জন্য অভিযানের লক্ষ্যবস্তু যে দেশ বা জনগোষ্ঠী, তাদের ইতিহাস সংস্কৃতি, সংবেদনশীল ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; গ. কেবল বিপ্লবী শক্তি ধ্বংস করাই যথেষ্ট নয়, প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনও সংগঠিত করে সেটিকে ঐ জনগোষ্ঠীর কাছে বৈধরূপ দিতে হবে এবং ঐ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিবিপ্লবী ভাবধারা /আন্দোলন/সংগঠনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে; ঘ. এ উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে; ঙ. বিভিন্ন দেশের জনগনের মুক্তির আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়ার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ঐ দেশটিতে মার্কিন এই কৌশলে সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে, যে গোষ্ঠীটি আবার ঐ দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে বৈধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।[২] এইসব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৩ সলে গঠিত হয় নাশলনাল এনডোমেন্ট ফর ডেমোক্রেসী (এন ই ডি)[৩]

সি আই এ বা মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বহুদিন ধরে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা, হত্যা ইত্যাদি সংগঠিত করলেও কোন দেশেই মার্কিন সমর্থক শাসক গোষ্ঠীকে বেশী দিন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারছিল না, মার্কিন স্বার্থের অনুকূল শাসন ব্যবস্থাকে কোন দেশেই স্থিতিশীল রূপ দিতে পারছিল না এবং কোন দেশেই সামাজ কাঠামোকে এমনভাবে রূপ দিতে পারছিল না যেভাবে ঐ সমাজকাঠামো মার্কিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে মদদ যোগাতে পারে। এমনকি মার্কিন স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোন একটি দেশের নির্বাচনকে ব্যবহার করা সহ বিভিন্ন সূক্ষ্ম কৌশল কাজে লাগাতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন দাঁড় করানো এবং সেই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে মদদ দেয়ার উপযুক্ত লবি দাঁড় করাতেও পারছিল না[৪]

নতুন কৌশলে মধ্যে স্থির হয় যে এতদিন ধরে যেসব রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ীদের সংগঠন, সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক জোট বা সংগঠনকে সি আই এ অর্থ জুগিয়েছে ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনাও দিয়েছে, সেগুলোকে এই মদদ দেয়ার কাজটি করবে এন ই ডি। তবে এন ই ডি, সি আই এর স্থলাভিষিক্ত হবে না। এন ই ডি কেবল সি আই এর গোপন তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক জোট সংগঠন তৎপরতাকে প্রকাশ্যে মদদ যুগিয়ে যাবে। এই ভাবে প্রকাশ্যে মদদ যোগানোর ফলে গোপন তৎপরতার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেটা থাকবে না। এন ই ডি'র গঠন প্রকৃতি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এটি কার্যত মার্কিন সরকারের একটি বিশেষ শাখা। এর তহবিল যোগায় মার্কিন কংগ্রেস আর সে অর্থ দেয়া হয় মার্কিন তথ্যসংস্থা ও মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে। আবার শেষোক্ত সংস্থা মার্কিন পররাষ্ট মন্ত্রনালয়ের অধীন[৫] এন ই ডির

www.pathagar.com

সকল মঞ্জুরী অনুমোদন করে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন দেশে এন ই ডি'র কর্মসূচী সমন্বয় সাধনে ও সরঞ্জাম জোগানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে মার্কিন দূতাবাসসমূহ। এন ই ডি'র বিভিন্ন কর্মসূচীতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। (৬) এন ই ডি '৮০র দশকে যে দেশসমূহে সর্বাধিক পরিমাণ হস্তক্ষেপ করে সেই দেশসমূহ হচ্ছেঃ নিকারাগুয়া, আফগানিস্তান, চিলি, এলসালভাদর, ফিলিপাইন, প্যারাগুয়ে, হাইতি, পেরু, মেক্সিকো, ইত্যাদি।

দুনিয়া জুড়ে জনগণের মধ্যে জেগে ওঠে গণতন্ত্রের আকাঙ্খা। চীনের নেতা মাও সেতুং বলেছিলেনঃ দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব। আর তারা এই বিপ্লব চান গণতন্ত্র কায়েমের জন্য। সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মাও এ ধারাটিই লক্ষ্য করেছিলেন। আর দেশে দেশ গনতন্ত্রের জন্য জনগনের আকাঙ্খাকেই কাজে লাগালো এন ই ডি তথা মার্কিন সরকার। এন ই ডি নয়া মার্কিন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য "গণতান্ত্রিক" সরকার, "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা ইত্যাদি কায়েমের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসলো, যা কার্যত ছিল মার্কিন স্বার্থরক্ষার অজুহাত মাত্র। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পেছনে যুক্ত হলো একটি আদর্শগত যুক্তি, যার নাম "গনতন্ত্র"। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনগনের কাঙ্খিত গণতন্ত্র আর মার্কিন প্রচারিত গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এন ই ডি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, সংগঠন, ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে সাহায্য দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেল এবং সে সুযোগ পেল গণতন্ত্র রক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির নামে। এখন আর এন ই ডি'র মাধ্যমে মার্কিন হস্তক্ষেপকে সি আই এ-র ঘুষ, গোপন তহবিল, গোপন হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বলার সুযোগ কমে গেল। এন ই ডি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের নাম হয়ে উঠল "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দ্বিদলীয় সহায়তা"। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার নামে অন্যদেশে হস্তক্ষেপের বদলে এখন ব্যাপরটি রূপ নিল "গণতন্ত্র বিকাশে সহায়তা প্রদান" এবং গণতন্ত্রের এই যুক্তিটির গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী। মনে রাখতে হবে অন্যদেশে মার্কিন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রকৃতি গোপনের বদলে প্রকাশ্য রূপ নিলেও হস্তক্ষেপের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল না। তবে গণতন্ত্রের সাইনবোর্ড থাকার কারণে মার্কিন শাসকদের পক্ষে মার্কিন জনগণের কাছ থেকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের কাছ থেকে; এবং যে দেশটিতে হস্তক্ষেপ করা হয; সেই দেশটির জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন প্রাপ্তি সহজতর হয়।

এন ই ডি কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ের জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে তৎপরতা চালায়। এন ই ডি'র অধিকাংশ অর্থ প্রথমে দেয়া হয় বিভিন্ন মার্কিন সংগঠনকে। এই সংগঠনসমূহ ঐ অর্থ পাচার করে হস্তক্ষেপাধীন দেশটির বিভিন্ন সংগঠনের কাছে। এই সংগঠনগুলো তখন আবার সেই অর্থ হস্তান্তর করে প্রকৃত প্রাপক জোট, সংগঠন, আন্দোলন, গোষ্ঠী, ব্যক্তির কছে। এন ই ডি'র তহবিল হস্তান্তরের এই কাজে কেবল

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রেই নিয়োজিত রয়েছে বিভিন্ন বর্ণ ও চরিত্রের কয়েকডজন সংগঠন। এন ই ডি গঠিত হয়েছে কয়েকটি সংগঠনের সম্মিলনে। এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন দেশে এন ই ডি'র কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করে। সংগঠনসমূহ হচ্ছে ডেমোক্রেটিক পাটির আন্তর্জাতিক বিভাগ এন ডি আই বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট, রিপাবলিকান দলের আন্তর্জাতিক শাখা এন আর আই বা ন্যাশাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট, মার্কিন চেম্বার অব কর্মাসের শাখা সি আই পি ই বা সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেস, মার্কিন শাসন ব্যবস্থার সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন এ এফ এল সি আই ও বা আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার এন্ড কংগ্রেস অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনস্ এর আন্তর্জাতিক শাখা এফ টি ইউ আই বা ফ্রি ট্রেড ইনষ্টিটিউট। অন্য দেশে হস্তক্ষেপ করার কাজে এন ই ডি অনুপ্রবেশ করে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক জোট, সংগঠনের ক্ষেত্রে এন ডি আই এবং এন আর আই এর মাধ্যমে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এফ টি ইউ আই এর মাধ্যমে এবং ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাদের সমিতির ক্ষেত্রে সি আই পি ই এর মাধ্যমে। এছাড়া আরও অনেক সংগঠন রয়েছে যেগুলো মার্কিন হস্তক্ষেপের কর্মসূচীতে সাহায্য করে। এই সংগঠন মদদ জোগায় প্রধানত বিভিন্ন নাগরিক জোট, সংগঠন ইত্যাদিকে। উল্লেখ্য এই সংগঠনসমূহের পরিচালকমণ্ডলীতে অভিন্ন ব্যক্তিরাই রয়েছেন। একই চরিত্রের ও একই ধরনের সংগঠনসমূহের কর্মসূচীতে প্রভাবিত বা প্ররোচিত হয়ে অথবা চাপের ফলে অন্য দেশের হস্তক্ষেপের কাজে মদদ জোগায়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ

বহুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি অন্য দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপ করে আসছে। তারা প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপ করে তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। বৃহৎ দেশগুলোর দূতাবাসসমূহ কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে কোন কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতাকে মদদ জোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কয়েক ডজন দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ করেছে। এই দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে ইতালি, গ্রীস, কাঙ্গো, ভিয়েতনাম, গুয়াতেমালা, চিলি, জ্যামাইকা ইত্যাদি। মার্কিন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের অনুকূল মনোভাবাপন্ন শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন করাই কোন একটি দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য।কোন একটি দেশের বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও তাকে বৈধতা দেয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র " অবাধ" নির্বাচনী খেলাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে। ১৯৮৪ সালে ইতালির নির্বাচন, চিলির নির্বাচনী ঘটনাবীলতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় ফিলিপাইন, নিকারাগুয়া, বাংলাদেশ এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী ঘটনাসমূহ। এইসব দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তক্ষেপের মার্কিন কৌশলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্যসমূহের চরিত্র মৌলিক নয়। সাম্প্রতিককালে নির্বাচনী হস্তক্ষেপের মার্কিন কৌশলটি অধিকতর

www.pathagar.com

সূক্ষ্ম, গভীর, জটিল, ও ঘন বুননে আবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে তাদের এ কৌশলটি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোলামেলা ও প্রত্যক্ষ। প্রায় ক্ষেত্রেই তা বর্বরোচিত রূপ নিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সরাসরি মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে রপ্তানী করা হাতো। কিন্তু নয়া কৌশলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে উত্তমরূপে মিশ্রণ ঘটানো হয়। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও উরুগুয়েতে সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মার্কিন নীতি প্রণেতারা তাদের নয়া কৌশল সম্পর্কে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে।(৭) এর পর নয়া কৌশল নিয়ে মার্কিনীরা হাত পাকায় ফিলিপাইন, পানামা, প্যারাগুয়ে ও চিলিতে। শেষোক্ত দেশসমূহে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর একাংশ মার্কিনীদের কৌশল বাস্তবায়নের সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

মার্কিনীরা কোন একটি দেশে আজকাল গায়ের জোরে নির্বাচন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হ্রাস করেছে। এর পরিবর্তে তারা একটি ব্যাপক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ চালায়।

এই উদ্দেশ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে অফিস অফ ডেমোক্রেটিক ইনিসিয়েটিভ। এই অফিসটিকে যুক্ত করা হয় মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এই কাজে আড়াই কোটি ডলারের অধিক ব্যয় করে। ১৯৮৭ সাল থেকে এন ই ডি অফিস অব ডেমোক্রেটিক ইনেসিয়েটিভের অধিকাংশ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মার্কিন রাষ্ট্র ও সমর নায়করা লক্ষ্য করেছে যে কোন একটি দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারলে ঐ দেশের সমাজটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সমাজটিকে মার্কিন পরিকল্পনাধীনে পরিচালিত করা যায়। এর ফলে সমাজটিতে মার্কিন স্বার্থের অনুকুল ব্যবস্থা এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রর্বতন সহজসাধ্য হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের কৌশল বলতে কেবলমাত্র জনসংযোগ বোঝায় না। এই কৌশলের উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্থায়িত্ব প্রদান করা, যেগুলো মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকবে ও মার্কিন নির্দেশে পরিচালিত হবে। এই কৌশলের অধীনে মার্কিন শাসকরা হস্তক্ষেপাধীন এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যে কাঠামোকে বাহ্যত ও আপাত দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে হয় এবং এই কাঠামোর সাহায্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়। সব সংঘাতের ফলে সমাজটিতে যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে এবং দরিদ্র জনগণে অনুকুলে কোন আমূল পরিবর্তন না হয় সেই চেষ্টা চালানো হয। এই কাজে ঐ দেশটির শাসকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম এবং শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী বুদ্ধিজীবীরা সাহায্য করে। তারা মার্কিন পরিকল্পনাধীনে পরিচালিত রাজনৈতিক কাঠামো ও কার্যক্রমকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে প্রচার চালাতে থাকে। এই কাজে জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

চেহারার দু'একটি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গৃহিত হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে তারা সমাজটিতে আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লব সংগঠিত করার প্রচেষ্টাকে ভন্ডুল করে বিরাজমান অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে। নিরাপদ পথ দিয়ে যৎসামান্য ক্ষোভ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ বের করাই তাদের কৌশল। সামাজিক অসন্তোষ এবং সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের ব্যাপক আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্গমনের পথ করে দেয়া হয়। এতে অসন্তোষ ও ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে রয়েছে কার্যক্রমের সহায়তাদান, ভোটদানে ভোটারদের উৎসাহিতকরণ, ব্যালট বাক্স পর্যবেক্ষণ , জনমত জরিপ, নির্বাচন কমিশনের ভোট গণনার সমান্তরালে আরেকটি ব্যবস্থাধীনে ভোট গণনা, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন বা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। মার্কিনী এই নির্বাচনী শিল্পে ব্যবহৃত হয় দলগঠন, গণতন্ত্র চর্চা, সংসদ পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ; ভোট প্রদান প্রশিক্ষণ; নির্বাচন মনিটারিং সর্বপোরি জনগণের মনস্তত্ত্বকে ইচ্ছামত ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল। ঐ সমাজের জনগণের মনোভাব ও প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে মার্কিনীরা ঐ সমাজের অভ্যন্তরে থাকা তাদের সহযোগীদের সাহায্য নেয়। আবার সহযোগীদের সাহায্যও করে। এই সাহায্য করে অর্থ ও বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম দিয়ে। এই সাহায্য তারা দেয় প্রকাশ্যে। এতে সুবিধা হচ্ছে গোপনে দেয়া সাহায্যের কথা কখনও প্রকাশ হয়ে পড়লে তা নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। কিন্তু প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে তথাকথিত কোন মহৎ নামের আড়ালে টাকা পয়সাসহ বিভিন্ন সাহায্য দিলে তাতে দোষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর; যা এখন বাংলাদেশে হচ্ছে।

বাংলাদেশের এই কৌশলটি যে ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে

বাংলাদেশে মার্কিনীরা প্রধানত বৃটিশ ও জাপানীদের সঙ্গে আঁতাত করেছে। এ কাজে তাদের ঘনিষ্ট সহযোগী রয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ। এরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে নির্বাচন প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তাদের এ কাজে সাহায্য করছে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনজিওসমূহ, যারা মিলে গঠন করছে ফেমা বা ফেয়ার ইলেকশন মনিটারিং এলায়েন্স। ফেমা ছাড়া এ ধরণের আরও কিছু সংগঠনের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে তাদের কেন এত আগ্রহ?

দীর্ঘদিন থেকে মার্কিন প্রচার মাধ্যম বলে আসছে যে বাংলাদেশের কোন রণনৈতিক গুরুত্ব নেই। কেবলমাত্র মানবিক কারণে বাংলাদেশে মার্কিন সাহায্য দেয়া হয়। কিন্তু কথাটি ডাহা মিথ্যা। সাবেক মার্কিন সিনেটর ও সিনেটে বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান চার্লস্ পারসি এক নিবন্ধে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রধানত রণনীতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসককে মদদ দিয়েছে।(৮) উল্লেখ্য

www.pathagar.com

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। পারসি আরও বলেছেনঃ " যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ এই অঞ্চলে (দক্ষিণ এশিয়া) চলমান বাজারমুখী সংস্কার ও গণতন্ত্র মার্কিন স্বার্থসমূহ সংগতিপূর্ণ ....." মার্কিন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহলের কাছে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। মার্কিন রাষ্ট্র নায়কদের অনুরূপ আরও বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই বাংলাদেশের গুরুত্ব মার্কিনীদের কাছে কম নয়। বরং অনেক বেশী। আর সেজন্য এরশাদ আমল থেকেই বাংলাদেশে চলছে মার্কিনী নকসার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সংক্রান্ত সাব কমিটিতে এক শুনানীকালে তৎকালীন ডেপুটি এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী অফ স্টেট টেরেসিটা শেফার বলেছিলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে কাজ করছে। ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। মার্কিন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় এ সব কর্মসূচী পরিচালিত হয়। (৯) এই ভাবেই মঞ্চে প্রবেশ ফেমার।

উপসংহার

ফেয়ার ইলেকশ্ন মনিটারিং এলায়েন্স বা ফেমা বাংলাদেশের এনজিওদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। তবে ফেমা গঠনের পেছনে বিদেশী শাসকদের উদ্যোগই প্রধান। দাতা সংস্থাগুলোর তরফ থেকে ফেমা প্রকল্প সমন্বয় করার দায়িত্ব পেয়েছে এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং বিদেশী প্রভূদের এ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ নিক ল্যাঙটন। ফেমা প্রকল্পে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো আমাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে কেন তাদের এই অর্থ প্রদান? এটা কি হস্তক্ষেপ নয়? বাংলাদেশের সাধারণ জনতা কাকে নির্বাচন করবেন সেটা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব কি বিদেশী শাসকদের? নির্বাচন পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য রয়েছে সাংবিধানিক সংস্থাসমূহ। আজ নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে ফেমা নির্বাচনকে পর্যবেক্ষণ করেছে। পাশাপাশি তারা ভোট গণনা করতে চেয়েছে। এ ধরণের হস্তক্ষেপ কোন আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন জাতির, যাদের রয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের মত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মর্যাদার হানিকর। আজ এ ধরনের হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে এবং এটা ভবিষ্যতে আমাদের দেশের অনেক বিষয় সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার ইঙ্গিতই বহন করে। আর তাইতো বিদেশী প্রভূরা পাঠায় ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসী এন্ড ইকেট্রোরাল এসিস্টান্স এর গর্ভনিং বোর্ডের সদস্য স্যার ডেভিড স্টিল এম পি এবং সোলার্জের মত ব্যক্তিদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্ক প্রধান মিসেস মাহোনী পাঠিয়েছে আরও ২৫ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক।(১০) এ ধরনের হস্তক্ষেপ তারা ইতিপূর্বে করে এসেছে ফিলিপাইনে, পানামায় এবং পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহে। অতএব এ ধরণের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। আমরা জানি লক্ষ ডলারে বলীয়ান ফেমার বিরুদ্ধে প্রচার হবে খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। তবে এ ধরণের হস্তক্ষেপ

www.pathagar.com

প্রতিরোধের জন্য, জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার স্থাপনের জন্য গড়ে তোলা দরকার জাতীয় ঐক্য। এ ঐক্য সর্বস্তরের জনতার, তথা শিক্ষক, আইনজীবী, ছাত্র, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের জনতার। গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহ তারা যতই ছোট হোক না কেন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই এ হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। এ প্রচেষ্টাই একদিন সজাগ করে তুলবে অধিকার সম্পর্কে; তখন বণিক লুটেরা পুঁজিপতিদের পক্ষেও অস্বচ্ছ শাসনযন্ত্র বজায় রেখে, জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না; বিদেশী প্রভুরাও হারাবে তাদের সকল ভিত্তি তাই জনগণের এ জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সার্বভৌম স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (সচেতন ছাত্র পরিষদঃ ঢাঃ বিঃ)

টীকা ঃ

১ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এমন কয়েকটি বই হচ্ছে ঃ রবিনসন ও নর্সওয়ার্দি লিখিত ডেভিড এন্ড গোয়ালিয়থ ঃ দ্যা ইউ এস ওয়ার এগেইনস্ট নিকারাগুয়া; বার্নেট প্রমুখ সম্পাদিত স্পেশাল অপারেশনস্ ইন ইউ এস স্ট্রাটেজী; লর্ড ও বার্নেট সম্পাদিত পলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার এন্ড সাইকোলজিক্যাল অপারেশনস্; রিথিংকিং দ্যা ইউ এস এপ্রোচ; ক্লেয়ার ও কর্নব্লাহ সম্পাদিত লো ইনটেনসিটি ওয়ারফেয়ার ঃ কাউন্টার ইনসারজেন্সী, প্রোইনসারজেন্সী এন্ড এন্টিটেরোরিজম ইন দ্যা এইটিজ।

২। রবিনসন লিখিত এ ফস্টিয়ান বার্গেন, পৃঃ ১০-১১।

৩। রবিনসন লিখিত এ ফাস্টিয়ান বার্গেন, পৃঃ ১৪।

৪। হান্টার ও স্যামুয়েলস্ লিখিত এবং ১৯৮১ সালের ওয়াশিংটন কোয়ার্টার্লি গ্রীষ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ প্রোমোটিং ডেমোক্রেসী।

৫। রবিনসন্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

৬। এন ই ডি সংক্রান্ত দলিল, পৃঃ ১২-১৩।

৭। মাস্ক লিখিত এবং জেড বুকস্ প্রকাশিত ল্যাটিন আমেরিকা ঃ দ্যা ট্রানজিশন টু ডেমোক্রেসী।

৮। ফরেন এফেয়ার্স পত্রিকার ১৯৯২-৯৩ সালের শীতকালীন সংখ্যায় প্রকাশিত চার্লস্ পারসি লিখিত নিবন্ধ সাউথ এশিয়াজ টেক্-অফ।

৯। দৈনিক বাংলার ১৯৯১ সালের ১০ই মার্চ সংখ্যা।

১০। দৈনিক জনকণ্ঠ ১৯৯৬ সালের ২৯শে মে সংখ্যা।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

মুজাহিদুল ইসলাম

গত ১২ জুন '৯৬ অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ পাকেরে শুকরিয়া আদায় করি সেই সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী সর্বোপরি রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা ও কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। এ নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারেনি এ ব্যর্থতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, নির্বাচন কমিশনের এবং রাজনৈতিক দলসমূহের। অবাধ ও নিরপেক্ষ না হলেও '৯৬ এর নির্বাচন অতীতের যে কোন নির্বাচনের চেয়ে একটু বেশী হলেও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল হয়েছে। আমাদের জাতীয় মান, নৈতিকতা ও বিচারবোধের নিরিখে এ নির্বাচন তাই অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবু রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি উল্লেখ করতেই হয়, "আরো ভালো হতো যদি আরো ভালো হতো।" নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার অঙ্গীকার পূরণ করতে পেরেছেন বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন আত্মসুখ অনুভব করছেন, বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ বলছেন একবাক্যে। তুবও আমরা সত্য ভাষণের স্বার্থেই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।

প্রথমত নির্বাচনে প্রচুর জাল ভোট দেয়া হয়েছে। ইচ্ছে করেই জাল ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। জালভোটের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণ প্রথমত ভোটারদের আইডি কার্ড না থাকা। আইডি কার্ড থাকলে প্রদত্ত জাল ভোটের শতকরা প্রায় এক শত ভাগই রোধ করা সম্ভব হতো। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ নিরপেক্ষ নির্বাচনের রক্ষাকবচ এই আইডি কার্ডের ব্যাপারটি একদম চেপে গেলেন। একমাত্র বিএনপি এ ব্যাপারে প্রথম দিকে যথেষ্ট সোচ্চার থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারাও ছাড় দিলেন। এমনকি ভোটার রেজিস্ট্রেশন ফরমের শ্লিপটিও দেখানোর বাধ্যবাধকতা না রাখাটা জাল ভোট প্রদানকে খুব সহজ করে তোলে।জাল ভোটের দ্বিতীয় কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির সুযোগ দান। এর ফলে দুভাবে ভোটার তালিকা প্রভাবিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এক. বিশেষ করে শহরগুলোতে একই ব্যক্তি একাধিক নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হবার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে ঢাকার মিরপুরে যিনি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন তিনি এবার মোহাম্মদপুর এলাকায় ভোটার হয়েছেন। হ্যাঁ, যদি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নতুন আবদেনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের দাবির সত্যতা যাচাই করা হতো তাহলে জাল ভোটার হবার সুযোগ কমে যেতো। কিন্তু যতদূর জানি সে কাজটি করা হয়নি যার ফলে শহর এলাকায় প্রচুর ভোটার একাধিক নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হয়েছেন এবং একাধিক ভোট দিয়েছেন। অথচ বিচারপতি সাদেকের সময় প্রথম ভোটার তালিকা প্রস্তুতকালে ভোটারের ঠিকানার যথার্থতা নির্ণয় ও শারীরিক উপস্থিতির উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যায়ের লোকও ঐ সময়ে কাজ উপলক্ষে বিদেশে থাকায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যান।

দুই. নতুন করে ভোটার হবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সীমান্তের ওপার থেকে কয়েক লাখ লোক বাংলাদেশে বানের বেগে ছুটে আসে এবং ভোটার তালিকাভুক্ত হয়। এদের দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ দুদেশেই এরা ভোট দেয়। দেশের পত্র পত্রিকায় এই দেশপারের দ্বৈত ভোটারদের বিষয়ে প্রচুর রিপোর্ট বেরিয়েছে। এমন কি সিলেট এলাকায় হিন্দী ভাষাভাষী লোকেরাও বাংলাদেশে এসে বস্তিতে থেকে ভোটার হয়েছেন এমন খবর জাতীয় পত্রিকায় পড়েছি। বিবিসি এ বিষয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট করেছে। সীমান্ত জেলাসমূহ ঘুরে বিবিসি'র জনাব হাসিব স্থানীয় লোকদের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছেন এমন কি দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিও বিবিসি থেকে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন এ বিষয়গুলো আমল দেননি। বিচারপতি সাদেকের সময়ে যখন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয় তখন আমার জানামতে সীমান্তে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়েছিল ফলে দ্বৈত নাগরিক বাংগালীরা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ঢুকতে এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।বলা বাহুল্য এই দ্বৈত নাগরিকদের সকলেই আওয়ামী লীগের সেই বহুল আলোচিত ভোট ব্যাংকের সদস্য বিধায় আওয়ামী লীগ ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে বরাবরই সোচ্চার ছিল। সত্যি বলতে ভোটার তালিকা কখনোই চূড়ান্ত হয় না। কিছু লোক সব চেষ্টা সত্ত্বেও ভোটার তালিকার বাইরে থেকেই যায়। এত সুযোগ দানের পরও আমার প্রতিবেশী একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ভোটার তালিকাভুক্ত হননি বলে তার স্ত্রী জানালেন। আমার প্রশ্ন বিচারপতি সাদেকের সময়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কি কোন অনিয়ম, অপর্যাপ্ততা ও অপূর্ণতা ছিল? যদি থেকে থাকে তবে তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের কিংবা আদালতে মামলা হয়নি কেন? আর যদি সঠিকভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তবে পুনর্বার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির এই সুযোগ দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? উপরন্তু এই সস্তা সুযোগ দানের ফলে সীমান্ত পারের লাখ লাখ দ্বৈত নাগরিককে ভোট দানের সুযোগ দিয়ে এবং শহর

www.pathagar.com

এলাকায় দু'তিন স্থানে তালিকাভুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে কি অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়নি?

নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হবার দ্বিতীয় কারণ নির্বাচনে বহু সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে শক্তিশালী পক্ষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ নির্বাচন কর্মকর্তাদের অকার্যকর করে কেন্দ্রের দখল নিয়ে নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সহিংসতার মাত্রা এতই বেশী যে, কেউই রিপোর্ট করার সাহস ও সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনাকাঙ্খিতভাবে এবং ব্যাপক প্রতিবাদ ও সমালোচনা সত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল ঘটিয়ে এই কেন্দ্র দখলের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। সরকার অস্ত্র উদ্ধারের সাফল্যের দাবি করলেও ঢাকা শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা মাস্তানদের গ্রেফতার দূরে থাকুক তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতেও পারেননি। এই মাস্তানরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট না দিলে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের, চাকরি খতম করার, এমন কি জীবননাশের হুমকিও দিয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করতে সাহস পায়নি। কমপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার ডঃ ইউনুসের অঙ্গীকার এবং যে অঙ্গীকার পালনের বেদনাদায়ক ব্যর্থতা নিয়ে পত্রিকায় একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একথা অবশ্যই সত্য যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রচুর পরিমাণে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছেন কিন্তু সমভাবে সত্য এই যে, এ ক্ষেত্রে বিএনপিকে অধিক মূল্য দিতে হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে সকল দলকে সমানভাব টার্গেট করতে না পারাটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতা ও পক্ষপাতিত্বের শামিল।

তৃতীয় কারণঃ কালো টাকার ছড়াছড়ি। এ কথা সবাই জানে যে ছোট কিছু দল ছাড়া বড় দলগুলো কোথাও তিন লাখ টাকার নির্বাচনী ব্যয়সীমা রক্ষা করেনি। কালো টাকা দিয়ে মাস্তান কেনা হয়েছে, ভোটার কেনা হয়েছে। কোন বিশেষ দলের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পর্যন্ত ঢাকা শহরের বস্তিতে রাত বারোটার পর গিয়ে কালো টাকা বিলিয়েছেন বলে লোকদের বলাবলি করতে শুনেছি। নির্বাচন কমিশনের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করার আইন অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং এসব ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কখনোই সিরিয়াস ছিলেন না। এ নিয়ে জনাব মুহাম্মদ জাহাংগীর বিটিভিতে যে প্যানেল আলোচনা করেছেন তাতে সুধীজনেরা যথার্থই স্বীকার করেছেন যে, কালো টাকার প্রভাবমুক্ত করার সংশ্লিষ্ট আইনে যথেষ্ট ফাঁক রয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন এসব জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিতে পারেননি। 'আশা' নামের একটি এনজিও জোর দাবি করেছে যে, কোথাও তিন লাখ টাকার ব্যয়সীমা রক্ষিত হয়নি।

চতুর্থ কারণ হলোঃ নির্বাচন আচরণবিধি লংঘণ। নির্বাচন আচরণবিধিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলা হলেও তা প্রয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে শৈথিল্য ও অনীহা সবাইকে অবাক করেছে। আমার নির্বাচনী এলাকা রমনায় একজন প্রার্থী রঙিন পোস্টারে গোটা এলাকা ছেয়ে ফেললেন নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর বহু আগেই। পত্রপত্রিকায় এ

www.pathagar.com

নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু তাকে এগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ যখন দেয়া হলো তখন কার্যত পোস্টারগুলো রৌদ্রে বিবর্ণ হয়ে গেছে। এরপরও তিনি ঐ পোস্টার সরাননি। নির্বাচনের পরে টোকাইরা ছিড়ে না ফেললে এখনও দেখা যেতো সেসব পোস্টার।

এ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘন এবং সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের দায়সারা গোছের পদক্ষেপ আবারও প্রমাণ করেছে যে, আইন তৈরি হয় তাদের জন্য যারা 'আইন' মেনে চলে। যারা আইন মানে না আইন তাদের কিছুই করতে পারে না।

'সবিনয়ে জানতে চাই' ছিল এবারের নির্বাচনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও প্রশ্নকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি ও পক্ষপাতিত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সরকার ও নির্বাচন কমিশন গা করেন নি। 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে এসব রাজনীতিদুষ্ট প্রশ্ন কর্তাগণ যেভাবে পক্ষপাত দেখিয়েছেন তাতে দর্শক তো হতবাক হয়েছেনই, নিরপেক্ষ সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হয়েছে ব্যাপকভাবে। উপস্থাপক আনিসুল হক যেখানে মওদুদ আহমদকে স্যার বলেছেন সেখানে বি চৌধুরীর মত বর্ষীয়ান লোককে নাম ধরে ডেকেছেন। জামায়াত ও বিএনপির বেলায় প্রশ্ন কর্তারা প্রশ্নের চেয়ে মন্তব্য করেছেন বেশী। তারা উত্তেজিত হয়েছেন এবং ভীষণ আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী প্রদর্শন করেছেন যা সবিনয়ে জানতে চাই অনুষ্ঠানের নামকরণকে ম্লান করেছে।

আমরা এর আগেও বহুবার নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছি যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন কোনটাই নিরপেক্ষ নয়। কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য। কাজে কর্মে তারা নিরপেক্ষতার ভান করলেও বাস্তবে সচেতন জনগোষ্ঠীকে তারা আশ্বস্ত করতে পারেননি। যে দেশে হিন্দুরাও অনেককে সালাম দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না সেখানে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব যে দিন সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকা সত্ত্বেও তার ভাষণে বিসমিল্লাহ বলতে কুণ্ঠিত হলেন সেদিনই এই সরকারের চরিত্র সবার কাছে ফুঠে উঠেছিল। বিসমিল্লাহ অনুবাদ করার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করা । আর এ দেশের রাজনীতিতে কারা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা লালন করে তাতো স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও ভাবাদর্শ নিয়েও নানা কথা রয়েছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার মহড়া দিয়েছেন তবে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারেন নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী নিয়োগ, প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ঝড়ের গতিতে অনাবশ্যক ও ক্ষেত্রবিশেষে উদ্দেশ্যমূলক বদলির হিড়িক, রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সচিবকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে বসানো, টিভি থেকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার লোকদের অনুষ্ঠান বন্ধ করা, টিভিতে বিএনপির সভা সমাবেশ তুলনামুলকভাবে কম

www.pathagar.com

দেখানো অথবা ক্যামেরার লুকোচুরি, শেখ মুজিবের উপর অনুষ্ঠান প্রচারের ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর উপর পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান বাতিলের মত নেতিবাচক ভূমিকা, অস্ত্রোদ্ধারে বহু ক্ষেত্রে একপেশে নীতি, সর্বোপরি মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ফলাফল প্রভাবিত করার মত ঘটনার অবতারণা নিঃসন্দেহে এই সরকারের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। রেডিওর নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সাথে টিভির ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রে বারবার ওলট পালট গোটা জাতিকে এক গভীর সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রাজধানীর ফলাফল কেন এত দেরীতে প্রচার করা হলো এবং কেনই বা সুদূর বান্দরবনের ফলাফল প্রচারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন হলো সে পশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমদিকে কেন এতটা ঝড়ো গতিতে নির্বাচনী ফল প্রচার করতে গিয়ে বারবার ভুল করা হলো আবার কেনইবা মধ্যরাতের পর থেকে ফলাফল তৈরি ও ঘোষনায় এতটা শ্লথ গতির সঞ্চার হলো সে রহস্যও এখন পর্যন্ত উম্মোচিত হয়নি। ১৩ জানুয়ারী সকালে আমি নিজে টিভিতে বিএনপির ৯৯টি আসন দেখে বাজারে গেলাম। যাওয়ার পথে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি জানালেন তিনি রেডিওতে এইমাত্র শুনেছেন বিএনপি ১০২টি পেয়েছে। বাজারে একজন বললেন, তিনি শুনেছেন ১০৪ টি পেয়েছে বিএনপি। বাজার সেরে বাসায় ফিরে আমি আবার টিভিতে দেখলাম বিএনপির আসন সংখ্যা মাত্র ৯৭টি। আবার বিকাল ৩ টায় নির্বাচনী (টিভি) বুলেটিনে বিএনপি ১০৫ ও আওয়ামী লীগ ১৩২ দেখে আমি একটু ঘুমাতে গেলাম। ঘুম থেকে উঠে বিকাল ৫টার বুলেটিনে দেখি বিএনপি ১০৪ এবং আওয়ামী লীগ ১৩৩। এই অভিজ্ঞতা আমার মত অনেকেরই হয়েছে বলে আলাপ আলোচনায় জানতে পেরেছি। কিন্তু এমনটি হবার কারণ জানতে পারিনি এখন পর্যন্ত।

নির্বাচনী ফলাফলে অত্যাশ্চর্য তেমন কিছুই ঘটেনি। আওয়ামী লীগের ভালো ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল। আওয়ামী লীগের প্রথম ও প্রধান সুবিধা ছিল এই যে, তারা একটা আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপিকে কোণঠাসা করতে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা থেকে সরাতে পেরেছিল। তবে এই সাফল্যকে আওয়ামী লীগ আশানুরূপ কাজে লাগাতে পারেনি। এই না পারার নানা কারণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্ভবত এই যে, খালেদা জিয়া যে ক্ষমতা ছাড়ার পরপরই এতটা শক্তভাবে ফিরে দাঁড়াবে এটা আওয়ামী লীগ, এমনি কি বিএনপি'র লোকদেরও ধারণার অতীত ছিল। যাই হোক, কিছু মাত্রায় হলেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তার আন্দোলনের ফসল খানিকটা হলেও ঘরে তুলতে পেরেছে।

দুই দলের তুলনামূলক অবস্থা বিচার করলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমন কি বিএনপি'র লোকেরাও স্বীকার করবে যে, আওয়ামী লীগ '৯৬-র নির্বাচনে বিএনপির চেয়ে অনেক বেশী সিরিয়াস ছিল। তাদের কর্মীদের কমিটমেন্ট বিএনপির কর্মীদের তুলনায় অনেক শক্ত মনে হয়েছে। ঘুরে ফিরে বারবার ভোটারদের কাছে যাবার কাজটি

www.pathagar.com

আওয়ামীলীগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করেছে। সেই তুলনায় বিএনপি'র লোকদের ভোট প্রার্থনা খুব কমই চোখে পড়েছে।

এই প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া যায় বছর দুয়েক আগে যখন শেখ হাসিনা তার কর্মীদের বেশী করে মসজিদে যাবার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগ তার প্রচার প্রোপাগান্ডায় ইসলামকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। পোস্টারে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' এই শ্লোগান লিখে আওয়ামী লীগ স্পষ্টতই তার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ধারা থেকে সরে আসতে চেয়েছে। 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' বলে আওয়ামী লীগ মূলত ব্যাপক জনগণের হৃদয়ের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে।

ব্যক্তিগত ভাবে শেখ হাসিনা হজ্ব পালন করেছেন এবং হজ্ব থেকে ফিরে তিনি এমন পোশাক বেছে নিয়েছেন যা পুরোপুরি ইসলামসম্মত। বিরোধীরা একে যতই ভাঁড়ামি কিংবা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বলুক না কেন, এর ইতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মোনাজাত কখনো ছিল বলে জানা নেই। শেখ হাসিনা মোনাজাতের সংস্কৃতি চালু করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মসজিদে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের পর মুসুল্লীদের সাথে দেখা করেছেন। এসকল তৎপরতার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কমপক্ষে নেতিবাচক নয় এই আস্থা জনমনে সৃষ্টি করতে পরেছে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে একত্রে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ উদারতার পরিচয় দিয়েছে। এ উদারতা সাধারণ ভোটারদের কাছে ভালো লেগেছে। এমন কি জামায়াতের অনেক কর্মী-সমর্থকও বিএনপি'র প্রতি তীব্র ঘৃনা পোষণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, যার প্রভাব ভোটের ফলাফলের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে।

আওয়ামী লীগ তার অতীত ভুলত্রুটির জন্য প্রকাশ্যে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছে, বিশেষ করে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর কখনও একদল গঠন করবেন না এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের স্থায়ী রূপ দানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তারা জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন। শেখ হাসিনা বার বার বলেছেন, তারা শাসক নয় জনগণের সেবক হতে চান। এসব কথা অবশ্যই সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আগামীতে যদি আওয়ামী লীগ তাদের এসব অঙ্গীকারের কথা মনে রাখে, বিশেষ করে ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রকৃত উদ্বোধন ঘটাতে পারে, তাহলে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবার পথে কোন বাধা দেখি না।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ এবারই প্রথম তাদের ভারত তোষণের খানিকটা হলেও ঘুচাতে পেরেছে। এর জন্য শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তির নবায়ন তারা করবেন না। শুধু তাই নয়, তিনি '৭৫-পরবর্তী সরকারসমূহকে ভারতের প্রতি নতজানু বলার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সমমর্যাদা নিয়ে ভারতের সাথে অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, বিশেষ করে ফারাক্কা প্রশ্নে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

একটি বড় মাপের কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তিনি। এই লক্ষ্যে, এমনকি তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের শ্বেতপত্র প্রকাশ করবার অঙ্গীকার করেছেন।যদি তিনি এই অঙ্গীকার পালন করতে পারেন তবে তাঁর ও তাঁর দলের প্রতি জনগণের আস্থা অনেক বেশী বাড়বে। শেখ হাসিনা রেডিও-টেলিভিশনে তথা জাতীয় প্রচার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন না দেয়ায় বিএনপি'র সমালোচনা করার সাথে সাথে ক্ষমতায় গেলে রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সরকারী মালিকানায় কোন পত্রিকা রাখা হবে না। এসব নেহায়েত কথার কথা নয়। শেখ হাসিনার এসব প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকারের কথা নিশ্চয়ই জনগণের মনে থাকবে এবং এসব অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন আওয়ামী লীগের গণভিত্তি মজবুত করবে।

শেখ হাসিনা জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার নির্বাচন-পূর্ববর্তী বক্তব্যে। উন্নয়নের জন্য জাতীয় ঐকমত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি সত্যি সত্যিই করা যায় তবে সেটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি বড় সংযোজন বলে চিহ্নিত হবে। শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন পার্লামেন্টকে সচল, সজীব ও উদ্যমশীল রাখার উপায় হিসাবে শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি, পার্লামেন্টের মাধ্যমেই নীতি- নির্ধারণী বক্তব্য প্রদান এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্লামেন্টারী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর পরিবর্তে বিরোধী দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের সভাপতি করার যে উদার প্রস্তাব টেলিভিশন মারফত জাতির কাছে পেশ করেছিলেন তা বাস্তবায়নের সুযোগ তিনি সম্ভবত পেতে যাচ্ছেন। পার্লামেন্টকে সকল নীতিগত সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে পারলে আমরা গণতন্ত্রের পথে একটি মাইলফলক অতিক্রম করবো।

শেখ হাসিনা ভাগ্যাহত মানুষ, বিশেষ করে বস্তিবাসীদের জীবনমান বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতির প্রশংসা কুড়িয়েছেণ। এখন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি ও তার সহকর্মীরা এ সব ভাগ্যাহত মানুষের কথা ভুলে যাবেন না এটা আশা করা নিশ্চয়ই খুবই সংগত ও ন্যায্য।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা স্পষ্টত জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তার দলে কোন সন্ত্রাসী নেই। তার চেয়েও বড় কথা তিনি বলেছেন যে, তার দলে সন্ত্রাসীর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি যদি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন তবে জাতিকে একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ উপহার দেয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না। প্রকৃতপক্ষে হাসিনা ও খালেদা দু'জনই সন্ত্রাসের বিপক্ষে কথা বলেছেন। এক্ষণে সরকার ও ছায়া সরকার মিলে যদি সন্ত্রাস নির্মূল করতে না পারেন তবে জাতি তাদের উভয়কেই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে তা তাদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম, গণযোগাযোগ ও ধর্মীয় ভাবাবেগ পক্ষে আনার কৌশলের বিজয়। এতদিন পর্যন্ত একশ্রেণীর পক্ষাঘাতে পতিত বামতাত্ত্বিকরা নানা কৌশলে আওয়ামী লীগকে ধর্মের, বিশেষ করে ইসলামের বিপরীতে দাঁড় করার যে অনাকাঙ্খিত প্রয়াস পেয়েছে '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অতি কষ্টে সেই চক্র ভেদ করতে পেরেছে। এভাবেই তারা দীর্ঘ গণবিচ্ছিন্নতার পর জনগণকে তার কাছে টানতে পেরেছে। মাটি ও মানুষের সাথে নিঃসম্পর্ক বামতাত্ত্বিকেরা-যদি আর কখনো আওয়ামী লীগকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে না পারে তবে তাদের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হবে। অন্যদিকে আবারও তারা বামতাত্ত্বিকদের অক্টোপাশে আবদ্ধ হন তবে ইতিহাস বড় নির্মমতা প্রদর্শন করবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'বিএনপি'র জন্য এ নির্বাচনের যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। দলের মধ্যে সুযোগ সন্ধানীদের ভীড় বাড়লে এভাবেই জনগণ তাতে 'রিএ্যাক্ট' করে যে সব দুর্নীতিবাজ ও গণবিচ্ছিন্ন মন্ত্রীদের বিএনপি দলীয় সিদ্ধান্তে বাদ দেয়ার সাহস করেনি- জনগণের প্রত্যক্ষ রায়েই তারা বাদ পড়লেন- জনগণের প্রত্যক্ষ রায়েই তারা বাদ পড়লেন এই গণরায় ক্ষমতাগামী সকল দলের জন শিক্ষাস্বরূপ।

নির্বাচনে বিএনপি হেরেছে। তবে এটা সম্মানের হার। কেউ কেউ বলছেন বিএনপি হেরেছে জেতার জন্য। তাদের কাজ হবে গণরায়কে মাথা পেতে নিয়ে দায়িত্বশীল রাজনীতি চর্চা করা। দলের অভ্যন্তরে দলাদলি ও গ্রুপিং যে কিভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় তা এ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে।

আমি বলবো বিএনপি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করেছে এ নির্বাচনে। ১০ জন উল্লেখযোগ্য মন্ত্রী হেরে যাবার পরও যদি বিএনপি ১১৫টির মত আসন পেয়ে যায় তবে সেটা বিএনপি'র প্রতি জনগণের গভীর আস্থারই প্রতিফলন। এই আস্থাকে সম্বল করে বিএনপি নেতৃত্বকে এগিয়ে যেতে হবে।

এ নির্বাচনে বিএনপি'র যা কিছু অর্জন তা তাদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফসল যতটা তার চেয়ে বেশী হচ্ছে তাদের নীরব ভোটারদের ভালোবাসার ফসল। অনেক প্রার্থী সম্পর্কে অনুযোগ ও আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নীরব ভোটারগণ নিছক দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভোট দিয়েছেন। ভোট দানের পর ধানের শীষের ভোটার প্রার্থীকে গালাগাল করে

www.pathagar.com

বলেছে, 'তোকে নয়, খালেদা জিয়াকেই ভোট দিলাম। খালেদা জিয়ার প্রতি গণমানুষের এই গভীর আস্থার মুল্যায়ন বিএনপি ও তার নেত্রীকে করতেই হবে।

সরকার গঠন না করলেও খালেদা জিয়া নিশ্চয়ই তার অঙ্গীকার ভুলে যেতে পারবেন না। গত ৫ বছরে তিনি দায়িত্বশীল বিরোধী দলের কথা বলেছেন। এবার তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। সফল হলে জনগণ আবার তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেবে। অর্থনীতির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন এখন ছায়া সরকারে থেকে সে কাজ তদারক করতে হবে তাকেই। নতুন পে কমিশনের যে স্বপ্ন তিনি চাকরিজীবীদের দেখিয়েছেন সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দানের দায়িত্ব তাঁর, তিনি সরকারে থাকুন আর বিরোধী দলের আসনে থাকুন। বৃদ্ধ কর্মজীবিদের বার্ধক্য ভাতার অঙ্গীকারও তাকে বিরোধী বেঞ্চে বসেই আদায় করতে হবে। এভাবে সরকার ও ছায়া সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হলে দেশে সত্যি সত্যিই উন্নয়নের জোয়ার বইবে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

এন জি ও ঃ দারিদ্র্য ব্যবসা ও বণিকের রাজদন্ড

মীযানুল করীম

এক সময়ে এনজিও বলতে বোঝাতো এমন (NON-GOVERNMENT ORGANISATION) বা বেসরকারী সংস্থা যাদের কাজ নিছক সাহায্য প্রদান। এসব নিরীহ সংগঠন ত্রাণ ও পুর্নবাসনসহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকতো। কিন্তও অতীতে যেমন, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে," তেমনি এনজিওরা ক্রমশঃ নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে রাজনীতির মতো বিরোধপূর্ণ বিষয়ে।

এটা তাদের অনুসরনীয় শর্তের লংঘন তো বটেই; তবে সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এনজিও-র আবির্ভাবে এদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ও ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। এবারের নির্বাচনে কতিপয় বিতর্কিত এনজিও-র নগ্ন ভূমিকা এবং বিশেষ মহলের পক্ষে অবস্থান দেশপ্রেমিক মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে লক্ষ্য অর্জন করেছে ফলাফল অনুকূলে এনে অন্যদিকে এনজিও'র এমন অভাবনীয় তৎপরতা সম্পর্কে প্রতিপক্ষ ছিল না।

এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, তথা ক্রমবর্ধমান ইসলামী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য একশ্রেণীর এনজিও সারাদেশে ব্যাপক, ব্যয়বহুল এবং পরিকল্পিত তৎপরতা চালিয়েছে। ইতিপূর্বে কোন নির্বাচনে এরা এভাবে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তার করেনি। সারা বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণে শংকিত সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের নির্দেশে এবং দেশীবিদেশী ইসলামবিদ্বেষী মহলের মদদে একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু এনজিও মিলে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আর সেই লক্ষ্যটি হলো, পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের ইসলামী পরিচিতি, মূল্যবোধ,ঐতিহ্য সংস্কৃতি, তথা এ জাতির সার্বিক স্বকীয়তা মুছে ফেলে এই দেশকে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্ট চক্রের তাবেদারে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যে এনজিওরা বাংলাদেশে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের পথও সুগম করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের প্রভাবাধীন বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিকতম সুপারিশে সরকারের আয়তন সংকুচিত করে এনজিওদের ভূমিকা ও কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশকে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনেও কিছু এনজিও প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তৎপর ছিল। কিন্তু তার মাত্রা ও আয়োজন এবারের মতো এত ব্যাপক ছিল না। '৯১ সালে নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভের ঘটনা এনজিও মহলে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারা এ দেশে ইসলামী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে শংকিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ঐ নির্বাচনের পর নাস্তিক-মুরতাদ বিরোধী জোরদার আন্দোলনের সময় জনগণ একই সাথে ইসলামবৈরী এনজিওগুলোর উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যদিও এসব সংস্থার পেছনে বাম ও সেক্যুলার মহলের প্রত্যক্ষ এবং তদানীন্তন সরকারের পরোক্ষ মদদ ছিল তবুও ইসলামী জাগরনের মুখে নিজেদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় চিহ্নিত এনজিওদের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। এদিকে কিছু ইসলামী সংগঠন গ্রামাঞ্চলে সুদমুক্ত ঋণদানসহ বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক প্রোগ্রাম শুরু করায় অদূর ভবিষ্যতে বিতর্কিত এনজিওদের সুদভিত্তিক কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে তারা মনে করতে থাকে। একই সময়ে 'মৌলবাদ' প্রতিরোধের নামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী পুনর্জাগরণকে ঠেকানোর নীল নকশা নিয়ে খৃষ্ট-ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ মেতে উঠে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশেও তৎপরতা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয় বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বশীল ও সর্ববৃহৎ সংগঠন জামায়াতে ইসলামীকে। বিদেশী অর্থ ও মদদপুষ্ট বেশ কিছু এনজিও এ কজে জড়িয়ে পড়ে এবং সদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে সমন্বিতভাবে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট ও প্রোগ্রামের আড়ালে ইসলাম বিরোধী মোটিভেশনের করতে থাকে।

এসব এনজিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকলেও সুযোগ পেলেই তারা অভিন্ন টার্গেটে কাজ করেছে। তা হলো 'মৌলবাদ, ফতোয়াবাজ' ধর্মান্ধতা. গোড়ামী, মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা" প্রভৃতির বিরোধীতার নামে ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে হেয় করে অজ্ঞ, দরিদ্র, ও সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করা। এনজিওগুলো নারী অধিকার ও মাতৃমঙ্গল, মানবাধিকার গণযোগাযোগ, সাক্ষরতা, উন্নয়ন, আইনগত সহায়তা, পরিবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে তৎপর। নিজ নিজ ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত করে তারা অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামের, বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অপপ্রচার চালিয়ে আসছে।

অত্যন্ত সুসংহত ও সম্ভাবনাময় এবং বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অংশ হওয়ার কারণে জামায়াতে ইসলামীর মতো বিপ্লবী সংগঠনকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথা নির্বাচনে কোণঠাসা করার জন্য এনজিও চক্র সম্ভাব্য সব কলাকৌশল প্রয়োগ এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

এবারের নির্বাচনে জামায়াত কোনমতেই যাতে সুবিধা করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে চিহ্নিত এনজিওরা সুনির্দিষ্টভাবে কাজ শুরু করে '৯৪ সালের প্রথমদিকে। তারা সংসদের এমন অর্ধশতাধিক আসনকে বেছে নেয় যেগুলোতে জামায়াতের প্রার্থীর জয়লাভ ছিল প্রায় নিশ্চিত। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের জন্য নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবক'টি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর আওতায় প্রথমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণ সাহায্য-সাক্ষরতা- চিকিৎসা আইনগত সহায়তা- ত্রাণসামগ্রী প্রদানের সুযোগে মোটিভেট করা ছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এমনকি যেখানেই

www.pathagar.com

সম্ভব, প্রশাসনে প্রভাব ফেলে ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছিল। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় কথিত মৌলবাদ বিরোধী এনজিও গুলোর বক্তব্য ও আচরণ, লক্ষ্য ও কার্যক্রমে ঘাদানিক এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদের সাথে বিরাট মিল দেখা যায়। এসব রহস্যজনক সংগঠন যে সমন্বিত উপায়ে ও অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা এই সাদৃশ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সদ্য বিদায়ী কেয়ারটেকার সরকার বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের সরকারের মতো পরিচ্ছন্ন ইমেজ নিয়ে মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে এই নির্দলীয় সরকারের নিরপেক্ষতা ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল অভিযোগ করেছেন। কেয়ারটেকার সরকারের ভূমিকা এভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ার পেছনে এনজিওদের প্রভাবও অন্যতম কারণ বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

এই সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতে এনজিওগুলোর প্রতিনিধি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান ছাড়াও ছিলেন এমন এক মহিলা যিনি বেইজিং-এ গত বছর অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে বাংলাদেশের বহু এনজিওর সম্মিলিত ফোরামের নেতৃত্ব করেন। সেখানে এমন কিছু প্রস্তাব ও সুপারিশ গৃহীত হয় যা ইসলামের বিধিবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের এই এনজিও ফোরাম সেসব সুপারিশও সমর্থন করেছে। আর গ্রামীণ ব্যাংক এবার নির্বাচনে বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে একটি বড় দলের সমর্থনে প্রচার চালিয়েছে। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রচারণা ও ছিল একই রকম। তারা ' নারীমুক্তি'র পথ সুগম করার জন্য তাদের নিজস্ব পছন্দসই প্রার্থীকে ভোট দিতে বলে।

এনজিওদের ঘনিষ্ট একসূত্রে জানা যায়, ব্র্যাকের প্রধান কেয়াটেকার সরকারের উপদেষ্টা হবার অনেক চেষ্টা করেন। অন্যদিকে বিতর্কিত এডাব-এর চেয়ারপার্সন এবং প্রশিকা'র প্রধান ডঃ কাজী ফারুক আহমদকে উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারের অত্যন্ত উচুঁ পর্যায়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। সম্ভবতঃ উপদেষ্টা পরিষদে এনজিও'র প্রতিনিধি বেশী হলে তা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হবে- এ কথা ভেবে এদেরকে আর উপদেষ্টা করা হয়নি। উল্লেখ্য, ফারুক একটি দলের সমর্থনে তৎপরতা দেখাতে গিয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন এর আগেই।

নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দলের পক্ষে-বিপক্ষে উদ্বুদ্ধ করে স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে গত পয়লা জানুয়ারী তৃণমূল সংগঠন'র ব্যানারে দেশের এনজিওগুলোর বৃহত্তম সমাবেশ রাজধানীর মানিকমিয়া এভিন্যুতে আয়োজন করা হয়। গত বছর মার্চ মাসে এই 'মহাসমাবেশ' হওয়ার কথা থাকলেও সরকার তখন অনুমতি দেয়নি। কিন্তু ভেতর-বাইরের চাপে সরকার শেষাবধি নতিস্বীকার করে।

এই সমাবেশে এনজিওরা নিজেদের বৈধ কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে নির্বাচন বা রাজনীতি প্রসঙ্গও টেনে আনে। বক্তৃতায় ও প্রকাশনার মাধ্যমে আহবান জানানো হয়

www.pathagar.com

'মৌলবাদ, ফতোয়াবাজ,সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধদের নির্বাচনে প্রতিহত করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের বিজয়ী করতে। একই সাথে দুর্নীতিবাজ, টাউট, ঋণখেলাপী ও কালোটাকাওয়ালাদের ভোট না দিতে বলা হলেও বাস্তবে এনজিওরা টার্গেট করেছিল ইসলাম পন্থীদেরকেই।

এই মহাসমাবেশের পর থেকে তাদের নির্বাচনমূখী কার্যক্রম জোরদার হয়ে ওঠে। এডাব'-এর সর্বিশেষ প্রয়াসে প্রথমে দেশের বিভিন্ন স্থানে এনজিওগুলোর কর্মীদের ট্রেনিং দেয়া হয়। নির্বাচনে ভোট দেয়ার বিষয়ে জনগণকে, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদেরকে প্রভাবিত করাই ছিল এর লক্ষ্য। এই পর্ব শেষ হবার পর প্রশাসনের পরোক্ষ সহায়তায় ভোটারদের সচেতনতা সৃষ্টি'র মোড়কে আসল কাজে হাত দেয়া হয়। সারাদেশে এই বিশাল কার্যক্রমে ব্যয় হয় বিরাট অংকের অর্থ।

জানা গেছে, একটানা কয়েক মাসের 'ইনটেনসিভ ওয়ার্ক'-এর ফলে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এনজিওরা এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, এডাব-এর প্রধান কাজী ফারুক ১২ই জুনের প্রাক্কালে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘষ্ঠিজনদের বলেছিলেন, 'জামায়াত এবার ৫১টির বদলে মাত্র ৬টি আসন পেতে পারে।"ইতিপূর্বে এনজিওর উদ্যোগে বড় দলগুলোর সম্ভাব্য ফলাফলের উপর জরিপ চালানো হয়। ১৯শে জুন ২৭টি আসনে যে পুনঃনির্বাচন হয়েছে, সেউপলক্ষেও নৌকার পক্ষে ভোটারদের বুঝানোর জন্য এসব এনজিও কর্মীদের প্রেরণ করে। ওদের এমনভাবে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন ঘনিষ্ট দলটির কোন ইমেজ ক্ষুন্ন না হয়।

'৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক প্রচারণায় বেশী তৎপরতা দেখিয়েছে আশা, প্রশিকা, ব্র্যাক, আরবান, নিজেরা করি, গণসাহায্য সংস্থা, শেড, মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, এএলআরডি, আঞ্চলিক পর্যায়ের কয়েকটি সংগঠন এবং সর্বোপরি এনজিওদের জাতীয় পর্যায়ের ফোরাম ' এডাব' নিজেই। ব্র্যাক ছাড়া অন্যরা শুধু নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করেছে। ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো কোন কোন এলাকায় ধানের শীষের পক্ষেও প্রচারণা চালায়। অবশ্য ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা কেবল ভোটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। তবে ব্র্যাকের কোন কর্মী স্বেচ্ছায় কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রচারণা চালানোর স্পষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। দেশের অন্যতম প্রধান এনজিও ব্র্যাক, আশা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জামায়াত এই মর্মে অভিযোগ করেছে যে, এসব সংস্থা নিজেদের পরিচালিত সমিতির সদস্যদের প্রচুর অর্থ বিলি করেছে নির্বাচন উপলক্ষে। জামায়াত প্রার্থীকে যে কোনভাবে হারানোর জন্য অপপ্রচারের পাশাপাশি এরা হুমকি দিয়েছিল, জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী হলে ঋণ বন্ধ করে দেয়া হবে। এসব এনজিও পাবনায় জামায়াত নেতা মওলানা মতিউর রহমান

www.pathagar.com

নিজামীর এলাকাসহ (বেড়া সাঁথিয়া) দেশের অধিকাংশ স্থানে অপতৎপরতা চালিয়েছে একই সাথে করেছে নৌকার প্রচার।

চাঁপাই নবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিকা, ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে মহিলা ভোটারদের মধ্যে হাঁস-মুরগি বিতরণ করেছে বলে জানা গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়ার জন্য এই মহিলাদের শপথ করানো হয়। বলা হয় ভোট দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর কথা না শুনতে। ঐসব প্রার্থীর লোকেরা গ্রামে গ্রামে শাড়ী-লুংগিও বন্টন করে নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে। ১২ই জুন কোনকোন স্থানে আওয়ামী কর্মীরা ভোটকেন্দ্র দখলের পাশাপাশি প্রশিকা ও ফেমা কর্মীরা ব্যাজ লাগিয়ে নৌকা প্রতীকে সীল মেরেছে বলে বিএনপি অভিযোগ করেছে।

নির্বাচনে যশোর-৩ আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কমিটিতে কয়েকটি এনজিও'র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন এবং পক্ষপাতিত্ব করছেন- এ মর্মে নির্বাচনের দিন যশোরের ডিসি ও রিটার্নিং অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল।

কুমতলবের দোষে দুষ্ট এনজিওগুলো শুধু যে নানাভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করেছে এবং পর্যবেক্ষণের নামে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে তা নয়। অনেকক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্র পরিচালনার পুরো দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকেই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যশোর ২ আসনের (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) ঝাঁকড়া ইউনিয়নের মূল কেন্দ্রটির মতো অনেক কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন এনজিওর চাকুরে। এ যেন শিয়ালকি মুরগী পাহারা দেয়ার দায়িত্বে রাখা। বাস্তবে দেখা গেছে এসব কর্মকর্তা ইসলামী শক্তির বিপরীতে বিশেষ একটি দলকে জেতানোর জন্য সাধ্যমতো সাহয্য করেছেন। ভোট কেন্দ্রে বাহ্যিকভাবে কড়াকড়ির লেবাস পরিয়ে তাদের অপছন্দনীয় দলটির নেতা-কর্মীদের প্রতি একপেশে কঠোরতা অবলম্বন করে মানসিক চাপ প্রয়োগ এবং কোণঠাসা করতে চেয়েছেন। ঐদলের সমর্থকসহ সাধারণ ভোটারদের সাথে এসব এনজিও কর্মীরা ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ করতেও পিছপা হয়নি।

শুধু পুরুষ নয় এনজিও'র মহিলা কর্মীদের এবারের নির্বাচনী কাজে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। ঝিকরগাছা থানার কয়েকটি কেন্দ্র এর নমুনামাত্র। দেখা গেছে, এসব কেন্দ্রের বাইরে পাহারা দিচ্ছে দু'টি বড় দলের মাস্তানরা। আর ভেতরে মহিলাদের বুথগুলো দখল করে রেখেছে এসব দলের কর্মীদের সাথে এনজিও'র মহিলা কর্মীরা। গ্রামের সহজ-সরল মহিলারা ভোট দিতে এসে এদের খপ্পরে পড়ে যায়। এনজিও'র এজেন্টরা তাদের বুঝায় যে আঙ্গুলে কালি লাগানোর পর তাদের আর কষ্ট করার দরকার নেই। বাকী কাজ করে দেয়ার মাধ্যমে সেবা করার জন্য তো আমরাই নিয়োজিত। এভাবে রকমারী কায়দা-কৌশলে ভোটারদের বিদায় করে ওরা নিজেদের প্রিয় দলটিকে সীল মেরে ব্যালটে বাক্স ভরিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

এধরণের ঘটনা কেবল যশোরে নয়, দেশের প্রায় সর্বত্র এনজিওরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এসব করেছে। বিশেষ করে যেসব আসনে দেশের সবয়েচে শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা ছিলেন মূল দু' তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্যতম যেসব এলাকায় এনজিওরা ছিল অতিমাত্রায় তৎপর। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। কয়েকটি স্থানে ধানের শীষের অনুকুলে নামলেও মুল লক্ষ্য সর্বত্র ছিল অভিন্ন। তা হচ্ছে জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করা।

জানা গেছে, 'ফেমা' নামের একটি বহুলবিতর্কিত ও আনরেজিস্টার্ড সংগঠন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে ইসলাম ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত ছিল। এর পুরো নাম 'ফেয়ার ইলেকশান মনিটরিং এ্যালায়েন্স। বাস্তবে এর কার্যকলাপ এতই 'আনফেয়ার' বা অসৎ ছিল যে এক পর্যায়ে সরকারও এর ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের ' মৌলবাদ' বিরোধী কতিপয় রাষ্ট্র ফেমার মাধ্যমে তাদের নীলনকশা বাস্তাবায়ন করছে। এর উদ্দেশ্য ছিল,নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের বিজয়কে যে কোনমূল্যে নস্যাৎ করে দেয়া। জামায়াতে ইসলামী ফেমার অসদুদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরে গত বছর এর রহস্যময় কর্মকান্ডের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু বিদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ আমলার প্রশ্রয়ে তারা অবাঞ্চিত তৎপরতা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ফেমা জামায়াতের উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্র এনডিআই, অর্থাৎ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের সাথে ফেমার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফেমার সাথে দু' চারটি নয় ৮৪টি এনজিও সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে অনেক সংগঠনই বেশ বিতর্কিত। কারো বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী এবং কারো বিরুদ্ধে আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টির পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। জানা যা, ১০টি দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে আড়াই কোটির বেশী টাকার তহবিলের নিশ্চয়তা পেয়ে ফেমা বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। দু' বছর আগে থেকেই এ কাজ চলছিল। কয়েকটি দূতাবাস, দাতা সংস্থা ও এনজিওকে নিয়ে ফেমা প্রথমে উদ্যোগ নিয়েছিল সমান্তরাল ভোট গণনার। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অধিকারে এভাবে হস্তক্ষেপ করাকে সরকার অনুমতি দেয়নি।

ফেমার চেয়ারপার্সন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দীন আহমদ স্বীকার করেছেন যে, এই সংগঠনের নামে নির্বাচনে বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু ফেমার সেক্রেটারী জেনারেল ফিরোজ এম হাসান বলেছেন, কিছু এনজিও তাদের স্বার্থে ভোটারদের বিশেষ দলকে ভোট দিতে বলেছে। এনজিও ব্যুরোতে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যা বর্তমানে এক হাজারের কিছু কম। গত মার্চ মাসে ছিল ৯১৭টি। সমাজকল্যাণ অধিদফতরে রেজিস্ট্রার্ড এনজিও রয়েছে সাড়ে ১১হাজার। কিছু এনজিও কোন রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এনজিওসমূহকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তে দেশে কাজ করার অনুমতি দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে এবং দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ওঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কাজ করে ইতিমধ্যেই অনেক এনজিও এসব শর্ত সুস্পষ্টভাবে লংঘন করেছে। তারপরও এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় এসব সংগঠনের অপতৎপরতা অবাধে অব্যাহত রয়েছে।

এনজিওগুলোর পলিটিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সর্বাধিক সুসংগঠিত ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। নির্বাচন-পূর্ব বিভিন্ন জরিপে আভাস দেয়া হয়েছিল জামায়াত এবার কমপক্ষে ২০টি থেকে ৩০টি আসনে জয়লাভ করবে। এমনকি নির্বাচনের মাত্র ৩.৪ দিন পূর্বে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপ রিপোর্টে বলা হয় জামায়াত ৬৩ টি আসনে বিজয়ী হবার সম্ভাবনা। জামায়াত নিজে টার্গেট নিয়েছিল অর্ধশত আসন। আর এনজিও চক্র নীরবে নানান কায়দা এবং সমন্বিতভাবে যে অভূতপূর্ব প্রচারকার্য চালিয়ে যায় তার ভিত্তিতেই এডাব প্রধান বলেছিলেন "জামায়াত বড়জোর ৬টি আসন পাবে।" বাস্তবে পেয়েছে তারও অর্ধেক মাত্র।

সেই জামায়াতের তিনজন এমপি-র ক্ষুদে গ্রুপের নেতা নিযুক্ত হয়েছেন, সুপরিচিত বক্তা মওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী। তিনি বলেছেন, এনজিও-দের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, তারা রাজনীতিতে জড়াবে না। কেবল সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে যাবে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তারা এগুলো লংঘন করে অনধিকার চর্চা করেছে। দেশব্যাপী মৌলবাদবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার নামে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অথচ ইসলামে মৌলবাদ বলতে কিছুই নেই।

তিনি বলেন, এনজিওরা তাদের বেনিফিশিয়ারীদের বিশেষ করে মহিলাদের বুঝিয়েছে যে জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মহিলাদের ঘরের ভেতর আটক রাখবে। বোকার ছাড়া বের হতে দেবে না। চাকুরী করতে দেবে না। এসমস্ত ভয় দেখিয়ে বিশেষ বিশেষ দলকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে প্রকাশ্যে।এমন অপপ্রচার যে হবে জামায়াত তা চিন্তা করতে পারেনি। এদশে ইসলামী আদর্শ যেন বিজয়ী না হয় সে জন্য আন্তর্জাতিকভাবে যে চক্রান্ত চলছে তা এভাবে সফল হয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা সরকারকে উৎখাত করে এবার নির্বাচনে এনজিও-র সহযোগিতায় ফলাফল নির্ধারণ করে নিয়েছে। লাভবান হয়েছে বিশেষ প্রতীকের বিজয়ী দল। অথচ '৯১ সালে এনজিওদের একাংশ ছিল নিশ্চুপ। অন্যাংশ ধানের শীষের জোয়ার উঠাতে সক্রিয় ছিল কিন্তু যে কারনেই হোক বিএনপি তাদের আশা পূরণ করতে পারেনি। খালেদা সরকারের পতনের প্রাক্কালে এনজিও জোটে যে বিভাজন দেখা দেয়, তা ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তির রাজনৈতিক কৌশল।এভাবে ক্ষেত্র তৈরীর পর নির্বাচনে জড়িত এনজিও-রা মনোপূত পক্ষকে প্রায় 'সেন্ট পার্সেন্ট জয়ী করে আনতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

www.pathagar.com

বিএনপি-র আমলে এনজিও-রা জবাবদিহি করতে হয়নি সরকারে কাছে। বরং খালেদা সরকার অনেক ক্ষেত্রে তাদের জামাই আদরে পুষেছে। কিন্তু এই সরকারের দুধকলা খেয়েও তারা যথাসময়ে সাপের মতো ছোবল দিতে ভুলেনি। কোন কোন সংবাদপত্রের অভিমত, নিজের অজান্তে বিএনপি এই কালনাগের লেজ নাড়িয়েছিল। কারণ, ১৯৯১-৯৫ সালে শিক্ষা উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প মেয়েদের স্কুলে বেতন মওকুফ, প্রভৃতি বাস্তববাদী প্রোগ্রাম এবং এগুলোর সফল বাস্তবায়ন সারাদেশে এনজিও-র দারিদ্র্য ব্যবসার ভবিষ্যৎকে করে দিচ্ছিল ম্লান।

একজন বিশ্লেষকের বক্তব্য হলো, বাংলাদেশের এনজিও-রা বছরে ৯ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য এনে কাজে লাগায় মাত্র ৩৫ শতাংশ। বাকী ৬৫ভাগ যায় তাদের একাধারে মদদগার ও পোষ্য যে সব বুদ্ধিজীবী, তারা। এসব আঁতেলের মধ্যে আছেন ভার্সিটির বহু শিক্ষক, গবেষণা ব্যবসায়ী, এবং কিছু আমলা।

জানাগেছে, এবারে সংসদ নির্বাচনে চিহ্নিত এনজিও-গুলোর বৃহদাংশ দু'টি দূতাবাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। তারা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে সংসদ নির্বাচনে। এনজিও-গুলোর বিশাল নেটওয়ার্ক তৃণমূল পর্যায়ে প্রোপাগাণ্ডা মিশন চালিয়ে গেছে শাখাকে শাখা।দেশের বেশিরভাগ মানুষ-ই নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক। আর এনজিও-দের তৎপরতাও বেশী দরিদ্র ও ছিন্নমূলদের মধ্যেই। ফলে তাদের ইলেকশান ক্যাম্পেইন প্রায় একশ'ভাগ সফল হয়েছে। নির্বাচন কমিশন শর্ত বেঁধে দিয়েছিল, বিদেশী তহবিলে পরিচালিত কোন গোষ্ঠি নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এনজিও-দের এই সাফল্যই প্রমাণ করে শর্তটি কত ব্যাপকভাবে লংঘিত হয়েছে।

এনজিও এখন অন্যের বিরাট পুঁজির সাহায্যে করা প্রচুর মুনাফার ব্যবসায়"। একই সাথে উচ্চ শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত মানুষের ভালো চাকুরির জায়গা। প্রতিটি বড় এনজিও উৎপাদক ও রফতানীকারক। একই সাথে তারা তাদের ঢং-এর গণতন্ত্র কায়েমে ব্যস্ত। এমন সব লোক এনজিও-র কর্মকর্তা অথবা চুক্তিভিত্তিক কনসালট্যান্ট, যারা সমকালীন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এমন উচ্চশিক্ষিত লোক অনেক, যারা এনজিও-গুলোতে বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে বাড়ী -গাড়ীর মালিক। বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ও লেখক মাঝে মাঝে ১৫/২০ হাজার টাকা করে এনজিও থেকে পান। এটা নাকি কনসালট্যান্সীর বিনিময়। এদের শতকরা ৯৭ ভাগই এবারের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের হয়ে ময়দানে নেমেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই বাংলাদেশের এসব অঘোষিত বিবেক ও জ্ঞানভান্ডার থেকে বুদ্ধি যোগাড় করতে হয় এবং এর মূল্যবাবদ গুনতে হয় প্রচুর অর্থ।

www.pathagar.com

রাজনীতির একজন মেধাবী পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন, এদেশে এনজিও-র হস্তক্ষেপের শুরু ১৯৮১ সালে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বনাম ডঃ কামাল হোসেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। কিন্তু ১৯৯৬-তে এসে তা যে ব্যাপক ও নগ্নরূপ পরিগ্রহ করেছে, এর নজির অতীতে নেই। এনজিও-দের কাজকর্মকে আলেম সমাজ তুলনা করেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালদের ভূমিকার সাথে। কিন্তু "আধুনিক বলে পরিচিত ব্যক্তিরা ' মোল্লাদের এ কথা শুনলেও বিশ্বাস করেননি। এবারের সংসদ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরে বন্দরে অন্ততঃ ৬০ ভাগ শিক্ষিত জন এনজিও-দের নিঃস্বার্থ সেবা এবং উন্নয়নে অংশীদারিত্বের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। অন্যদিকে দলগুলো পরিণত হচ্ছে এনজিও, বুরোক্রেসী ও মিডিয়া নামের প্রভূত্বের বাহনে।

এনজিও-রা নিকট অতীতে নেপথ্য মন্ত্রনাদানের পর ১২ই জুনের বহু প্রত্যাশিত সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রকাশ্য প্রচারণায় অবতীর্ণ হবার পালাও সাঙ্গ করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমলাতন্ত্র ও গণমাধ্যমের সাথে তারাও এখন কিংমেকার'। কারো কারো ভাষায় এরা হলো সমস্যার ত্রিমূর্তি'। এবারে এনজিও-র সরাসরি ক্ষমতার মিথ্যা দখলের পর্ব। তাদের জাতীয় ফোরাম এডাব-এর মুখপাত্রে আরডি আর এফ -এর জনৈক ডক্টরেট কর্তাব্যক্তি এমন এক থিওরী তুলে ধরে বলেছেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জিওর(সরকার) সাথে এনজিও-কে শাসনকার্যে অংশীদার বানাতে হবে। ঐ কর্মকর্তার সহযোগী তাত্বিক হলেন ঢাকা ভার্সিটির একজন মিনি আঁতেলেকচুয়াল। এনজিও-র আইনগত দিক থেকে যেমন, তেমনি বাস্তব ন্যায়নীতির নিরীখেও রাজনীতি- নিরপেক্ষ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু এবারে সর্বজনসম্মত কেয়ারটেকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেই তারা এই আইন , বিধি ও ইনসাফ লংঘনের সুযোগ পেয়েছে সর্বাধিক। নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকে বিজয়ী করার অপারেশন সাকসেসফুল হবার পর ক্ষমতাসীন দলের ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী, মোহাম্মদ নাসিমের সম্বর্ধনা সভায় এডাবের একধিক নেতা বক্তৃতা দেন। সেখানে এডাব চেয়ারপার্সন কাজী ফারুক আহমদ এবং প্রাক্তন চেয়াপার্সন খুশী কবির রাখঢাক না করে বলেছেন, আমরা অতীতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছি; ভবিষ্যতেও দেব।

এনজিও কর্মকর্তারা স্বাভাবিকভাবেই এখন তাঁদের নির্বাচনী অবদানে প্রতিদান চাইবেন। দাবী করবেন, ধর্মান্ধ, ফতোয়াবাজ, মৌলবাদী, গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়া সরকার পূর্বসূরীর চেয়ে অনেকবেশী কঠোর হোক। ফি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকার বিদেশী অর্থনির্ভর মহাবাজের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য চাই অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। আওয়ামী সরকার এই সুযোগ দিতে হলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য'এর অন্য যেসব কর্মসূচী বিশেষ করে নারীর শিক্ষাগত ও আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটাচ্ছে, সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। বিজিত প্রতিপক্ষ বিএনপি-র সুচিত বলে এসব প্রোগ্রাম বাতিল করে কি বর্তমান সরকার এনজিও-দের সরকার' প্রতিষ্ঠার দুয়ার খুলে দেবেন?

www.pathagar.com

নির্বাচনে প্রার্থীরা কোটি টাকা ব্যয় করলেন কেন?

নির্বাচনে টাকার খেলা এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রার্থী নমিনেশনে কয়েকটি দল প্রার্থীর অর্থনৈতিক প্রাচুর্যতাকে প্রাধন্য দিয়েছে। রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট না থেকেও টাকার বিনিময়ে নমিনেশন ক্রয় করেছেন বহুপ্রার্থী। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য এসব প্রাথী জনসমর্থনের চেয়ে ভোট ক্রয়ে বেশী তৎপর ছিলেন, ভোটারদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে ভোট চেয়েছেন তারা। কেন প্রার্থীরা টাকা দিয়ে ভোট ক্রয় করার মত অনৈতিক পন্থা বেছে নিলেন? এক এক জন প্রার্থী কত টাকা খরচ করে নির্বাচনে জিতেছেন কিংবা হেরেছেন? এভাবে টাকা বিলির কারণে বাজারে দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধিও ঘটেছে সর্বত্র। তারপরেও নির্বাচনী আচরণ বিধির সফল প্রয়োগের দাবী করছেন নির্বাচন কমিশন। আমরা এখানে প্রার্থীদের খরচের একটি খতিয়ান বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে তুলে ধরলাম।

নির্বাচনী ব্যয়ের চাপে বাজারে ১০% মূল্যস্ফীতি

নাজীমউদ্দিন মোস্তান॥ প্রার্থী প্রতি ৩ লক্ষ টাকা করে ১২ জুনের নির্বাচনে আড়াই হাজার প্রার্থীর ৭৬৭ কোটি টাকা খরচ করার কথা। কিন্তু প্রতিভোটের জন্য অন্ততঃ ১০০০ টাকা খরচ করে লক্ষাধিক ভোটলাভকারী প্রকল্প ব্যবসায়ীরা কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছেন। এধরনের এলাকায় ডামি প্রার্থী ও মূল প্রতিদ্বন্দ্বী সহ ৫/৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে।

একটি সংবাদপত্র লিখেছে, এ নির্বাচনে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। পত্রিকাটির বিবরণ হচ্ছে এ রকমঃ যদি ধরে নেই সকল প্রার্থীই ৩ লাখ টাকা খরচ করেছেন, তবে শুধু প্রার্থীদের ব্যয় ৭৬৭ কোটি টাকা। এমন নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে অন্ততঃ এমন ৫শ প্রার্থী ছিলেন, যাদের খরচ হয়েছে অন্ততঃ ১০ লাখ টাকা। এই হিসেবে এদের খরচ দাঁড়ায় ৫০ কোটি টাকা। ৩শ এমন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যাদের গড়ে খরচ হয়েছে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা করে। এ হিসেবে এদের খরচের পরিমান ছিল ৬০ কোটি টাকা। এমন অন্ততঃ একশ প্রার্থী ছিলেন যাদের নির্বাচনী ব্যয় হয়েছে জনপ্রতি ৫০ লাখ টাকা করে। যাতে খরচ দাঁড়ায় ৫০ কোটি টাকা করে।

www.pathagar.com

এছাড়াও ১০ জন প্রার্থী গড়ে ১ কোটি টাকা করে অন্ততঃ ১০ কোটি টাকা খরচ করেছে নির্বাচনে। প্রার্থীর এতসব ক্যাটাগরি মিলিয়ে এবং নির্বাচন কমিশনের ৩৯ কোটি নির্বাচনী ব্যয় ধরে মোট খরচের পরিমান দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশর ১২ ই জুনের নির্বাচনে প্রচারকান্ড ও প্রস্তুতি চলছে প্রায় দেড় মাস ধরে। এ সময়ে মুদ্রণ শিল্প, হোটেল শিল্প,ডেকোরেটর, রেন্ট-এ-কার, বেকার তরুণ, রাজনৈতিক আড্ডার অংশীদার, সংবাদ মাধ্যম, ফ্যাক্স-টেলিফোন, পরিবহন এবং ভোজন দ্রব্যাদির উৎপাদক ও বিপণনকারীরা আয়- রোজগার ও ব্যয় করেছে প্রভূতভাবে। প্রভাবশালী লোকদের বশীভূত করার জন্য অর্থের ভান্ডার ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ টাকায়। প্রার্থীদের অর্থ ছাড়াও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১০০ কোটি হতে ৫/৭ শ কোটি টাকা ব্যয় করার কথাবার্তা প্রকাশিত হচ্ছে এখন। এবার যে দল সবচাইতে খারাপ করেছে তাদের আন্তর্জাতিক তহবিল ছিল তত কম। নির্বাচনের এ অর্থনীতির ফলাফল দেখে বোঝা যায় কাদের হাতে বেশী টাকা পড়েছে, এ সময়ে।

নির্বাচনের পর শনিবার পর্যন্ত রাজধানীর বাজারে মাছের দর বেড়ে গেছে ৪০%। গ্রসারী বা মুদি আইটেমের দর পাইকারী বাজারেই ১০% বেড়ে গেছে। ঔষধের দাম বেড়েছে ১০%। ৯১ হতে ৯৩ পর্যন্ত বছরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল ২%। ৯৫-৯৬-তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার আন্দোলন ও অসহযোগে ৮%-এ উন্নীত হয়। নির্বাচনের একমাসে নির্বাচনী ব্যয়ের তোড়ে খাদ্য সামগ্রীর দর ১০% বেড়ে যাওয়ার হারটি নির্বাচনী ব্যয়ের মাত্রা নির্ণয়ের ব্যাপারে একটা ধারণা দিতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় ও ব্যবস্থাপনায় সরে যাবার আগে ব্যাপক জনমনে যে আশাবাদ বা আতঙ্ক কাজ করে, তারও প্রতিফলন এ মূল্যস্ফীতির মধ্যে ধরা পড়ছে।

নির্বাচনী ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি আর উন্নয়ন ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে তফাৎ আছে। এ নির্বাচনে প্রায় এক যমুনা সেতুর নির্মাণের সমান অর্থ ব্যয় করেছে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিরা। যমুনা সেতুর মত প্রকল্প ৪/৫ বৎসরে বাস্তবায়িত হয় একারণে, যেন উন্নয়ন ব্যয়ের অর্থ ছড়িয়ে পড়ে তা মুদ্রাস্ফীতির কারণ না ঘটায়। তেমন পরিমান অর্থ ২/১ মাসে ব্যয় করার ফলে বাজারে ভোগ্য সামগ্রীর উপর ক্রেতাদের প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এবং এ মূল্যস্ফীতি রাজনৈতিক কারণে একটা স্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। এদিকে জুন মাসের শেষ ভাগেই নতুন সরকারকে যে বাজেট দিতে হবে [বাজেট ঘোষণা হয়েছে ২৮ জুন] তার চাপেও দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাবে। আর বিগত প্রায় অর্থবৎসরের সরকারী খাতের পাওনা পরিশোধ করা হলে আরও বিপুল অর্থ বাজারে আসবে। চারমাস ধরে অর্থনীতিতে মন্দা চলছিল। খুব জরুরী সামগ্রী ছাড়া বাকী সব জিনিসের বেচাকেনা নেমে এসেছিল সামান্যস্তরে। নির্বাচন- বাজেট অর্থবছরের শেষ দিকের বিলপত্র প্রাপ্তির অর্থের চাপে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ১৫%-এ উপনীত হলেই রিকশা চালক সহ মেহনতীদের মজুরী বৃদ্ধি ঘটবে রাস্তায়। এবং নতুন সরকারকে নতুন

www.pathagar.com

বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের মাইনেপত্র (যা প্রতিমাসে ১ হাজার কোটি টাকা) আরও ১০% বাড়াতে হবে [জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সমস্যা বিবেচনা করে ইতোমধ্যে বেতন কমিশন গঠনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শীঘ্রই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা]। বাংলাদেশে রাজস্ব ও মুদ্রাখাতের দ্বারা বাজারে মূল্যস্ফীতি রোধের পথ খুব সামান্য। দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে এসব বর্ধিত অর্থের চাপ সহ্য করে অর্থনীতি।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আওয়ামীলীগের ঐতিহ্য মুদ্রাস্ফীতিকর (Inflationary), জাতীয় পার্টির ঐতিহ্য মন্দার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির কারণে Stag flationary আর বিএনপির ঐতিহ্য স্বল্পহারের মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে মুদ্রাকে দামী করে সঞ্চয় হার বাড়িয়ে সমঝে চলার সাথে মুদ্রা সংকোচনে Deflationary ধারা। অনিচ্ছা সত্বেও আওয়ামী লীগ নির্বাচন, জুনমাস ও বাজেট মাসের কারণে প্রবল ইনফ্লেশনারী ধারা নিয়ে হাজির হয়েছে। মুল্যস্ফীতির ফলাফল তিনটি- (এক) এটা জনসমাজের উপর অদৃশ পিটুনি করের মত। তাতে কষ্টকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যারা উপার্জন করে তাদের পাতে আহারের পরিমান কমে যায়। (দুই) এ অবস্থায় সঞ্চয় কমে যায় ও অতীতের সঞ্চয় ভেঙ্গে খরচ চালাতে হয়। ফলে বিনিয়োগ কমে গিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান বিবর্ণ হয়। কর্মসংস্থান সীমিত হয়ে আসে। (তিন) জনগণের আয় রোজগার বাড়িয়ে দেবার জন্য সরকারী খাতে বেতনে, মজুরীতে ও উন্নয়নে অর্থব্যয় করা হলেও এসব পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য আরও বেড়ে যায়।

পণ্যোৎপাদন করে একদিকে বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রতিটি উন্নয়ন মুদ্রা আশু ফলদায়ক উৎপাদন খাতের দিকে সরিয়ে দিতে না-পারলেও এ অবস্থায় জাতীয় আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আমদানী, রপ্তানীর ভারসাম্য বা ম্যাক্রোইকনমিক ব্যালেন্স ভেঙ্গে পড়ে। এরশাদের আমলে ৮৬-র নির্বাচনের পর রাজনৈতিক ও প্রকল্পব্যবসায়ীদের লুটপাটে এবং দীর্ঘ Gestation period-এর প্রকল্পের কারণে ম্যাক্রোইকনমিক ব্যালেন্স হারিয়ে গিয়েছিল। ৯১-র নির্বাচনের পর সাইফুর রহমান কিছু নাটকীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে দৃশ্যপট বদল করেছিলেন। মুহিত, সাঈদুজ্জামান ও তাজউদ্দিনরা তা পারেননি।

একারণেই গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নির্বাচনী ব্যয় সীমিত করার বিধান কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশে এটা প্রায় তামাশায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির আগুণ ল্যাজে করে নিয়ে এসে নিজের ক্ষমতার স্বর্ণলঙ্কা পোড়াতে শুরু করেন অর্থনীতি সম্পর্কে অপরিপক্ক রাজনীতিজ্ঞরা।এখন যত দ্রুত সম্ভব Deflationary বা মুদ্রা সংকোচনের পথ গ্রহণ করা হয়, ততই মঙ্গল। [রাষ্ট্র, ২০.৬.৯৬]

www.pathagar.com

নির্বাচনের পিছে প্রার্থীরা ব্যয় করেছেন ৫০০ কোটি টাকা

মিলান ফারাবী ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা অন্যূন অর্ধসহস্র কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। এটা প্রাথমিক হিসেব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০টি নির্বাচনী এলাকার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সেখানে কোটি কোটি টাকার খেলা চলেছে। টাকা উড়েছে আকশে বাতাসে। এছাড়া অন্যান্য আসনে বড় দলের অধিকাংশ প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয় ২০/২৫ লাখ টাকার অংকেও বেঁধে রাখতে পারেননি। বড় দলের রাজনীতিক ও মধ্যবিত্ত প্রার্থীরা টাকার রেসে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে নদী, কাদা বেষ্টিত প্রত্যন্ত নির্বাচনী এলাকা থেকে ঝড়ো গতিতে ছুটে এসেছেন ঢাকায়। দলের নেতা নেত্রীদের কাছে কাঁদো কাঁদে কণ্ঠে খুলে বলেছেন এলাকার অবস্থা। টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীদের দোরে দোরে ধরণা দিয়েছেন। ইলেকশন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ধার কর্জ করেছেন দেদার। এদের মধ্যে যারা জয় পেয়েছেন তাদের অবস্থা প্রসব যন্ত্রণার পর সন্তান প্রাপ্তির মতো। অন্যদিকে পরাজিত রাজনীতিকরা ভেঙে পড়েছেন। তাদের কাঁধের ওপর চেপে বসেছে ধার কর্জ শোধের চিন্তা।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি আসনে দু'জন ধনাঢ্য প্রার্থী থলি উপুড় করে টাকা ঢেলেছেন। এলাকার ভোটাররা অনেকে দু'জনার অর্থ-আর্শীবাদ পেয়েছে। একজন প্রার্থী এলাকায় যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সন্ত্রাসীদের পেছনেই প্রায় দু'কোটি টাকা খরচ করেছেন। নির্বাচনের আগে ৮/১০ সপ্তাহে এখানে মাস্তানদের কামাই ছিল রেকর্ড পরিমাণ। এলাকাবাসীর অভিমত, প্রতিযোগিতা করে টাকা ঢালতে গিয়ে এক একজনের খরচ ৪/৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের অধিকাংশ আসনেই রাজনৈতিক প্রচার প্রপাগাণ্ডার পাশাপাশি টাকার ব্যবহার ছিল প্রকট। বেশকিছু আসনে ব্যবসায়ী ও অমিত চিত্তের অধিকারী প্রার্থী হওয়ায় তারা নিজ উদ্যোগেই টাকা ঢেলেছেন। পাশাপাশি বড় দলের অর্থবলে দুর্বল প্রার্থীরাও পেয়েছেন ধনবানদের অব্যাহত অর্থ সহায়তা। কেউ চাপে পড়ে, কেউ ব্যবসায় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজেরাই এগিয়ে গেছেন টাকা নিয়ে।

নরসিংদীর একটি আসনে দু'টি বড় দলের প্রার্থীর মধ্যে জমে উঠেছিল টাকার খেলা। এদের একজন হলেন সাবেক মন্ত্রী এবং দলের পদস্থ নেতা। অনেক স্ক্যাণ্ডালের ভিড়ের মধ্যেও তিনি মোটামুটি সৎ ইমেজ গড়ে তুলেছিলেন। পাশাপাশি গ্রহণযোগ্যতাও ছিল সর্বমহলে। তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাথী নির্বাচনে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে শুরু করায় এক পর্যায়ে তিনিও নেমে পড়েন টাকা হাতে। নির্বাচন পর্যন্ত তার খরচ প্রায় এক কোটি টাকায় পৌছে। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ করে ফেলেন।

www.pathagar.com

বরিশাল-পিরোজপুরের একটি যুক্ত আসনের একজন প্রার্থী ক্ষমতাসীন অবস্থায় নানা দুর্নীতি করে অঢেল টাকা কামিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের একটি সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে তিনি দেউলিয়া করে ছাড়েন। কিন্তু নির্বাচনী জ্বর তাকেই প্রায় বেহাল করে ছেড়েছে। কামাইয়ের টাকা তিনি ইলেকশনের ২/৩ বছর আগে থেকেই ভোটের জন্যে পরিকল্পিতভাবে ঢালতে শুরু করেন। এলাকায় কথিত আছে প্রায় প্রতিটি ভোটারের বাড়িতেই তিনি নানা ছুতোয় লুঙ্গি, শাড়ি পৌছে দিয়েছেন। নাম কামাতে চেয়েছেন দাতা হিসেবে। নির্বাচনের আগের দলের বড় তরফের কাছ থেকে আবারো টাকা পয়সা চেয়ে চিন্তে এলাকায় যান। কিন্তু তারপরও ভোটাররা তাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি নিজেকে দেউলিয়া দাবি করে নানা স্থানে ধরণা দিচ্ছেন এখন।

শোণা যায়, অসহযোগ আন্দোলনকালে সাবেক একটি সরকারের একজন বড়মন্ত্রী এবং একজন প্রভাবশালী নেতা যানবাহন চালুর একটি তত্ত্ব খাড়া করে এ খাতে প্রায় ৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ করাতে সক্ষম হন। তেল ও ক্ষতিপূরণ খাতে তাদের খরচ হয়েছে যৎসামান্য। এ টাকাও তারা বিলি করেছেন নিজ চ্যালাচামুণ্ডাদের মালিকানাধীন গাড়িগুলোকে। বাকি টাকা কয়েকজন নেতা মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। জানা গেছে, এই অঢেল আয় থেকে ওই নেতারা বৃহত্তর ঢাকা জেলার কয়েকটি আসনে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মূল দু'জন প্রার্থী জয় পাননি।

সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী তার তহবিল থেকে এমপি প্রতি ২৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। লক্ষীপুর, নোয়াখালীসহ দেশের কয়েকটি স্থান থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, দূরদর্শী এমপিরা এই টাকা তখন 'ফ্রিজ' করে রেখেছিলেন। নির্বাচনের ঠিক ২/৩ দিন আগে তারা সে টাকা বিলাতে শুরু করেন। এছাড়া একটি বড় দল সারাদেশেই দুর্বল প্রার্থীদের কেন্দ্রীয়ভাবে শেষ মুহূর্তে ভালো অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে। সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন আসনে ভোটের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে টাকা দিয়ে ভোট কেনার জোর চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

ফেনী জেলার একটি আসনে একজন শিল্পপতি প্রার্থী তিন কোটি টাকা ব্যয় করেছেন নির্বাচনে। ভোটারদের হাতে সাহায্য পৌছে দেয়াসহ সন্ত্রাসী ভাড়ার কাজে তার অঢেল অর্থ ব্যয় হয়। তিনি পাশের একটি আসনে এক বড় নেতার কর্মীদের পেছনেও অর্থ সরবরাহ করেন।৯১-এর মতো এবারও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বাছাইয়ের সময় প্রার্থীর অর্থবিত্তের পরিমাণও যাচাই করে দেখেছে। ইন্টারভিউতে কখনো কখনো জানতে চাওয়া হয়েছে কি পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারবেন।

রাজধানীর চিত্রও ছিল অভিন্ন। প্রধান তিনটি দলের অনেক প্রার্থী এখানে টাকার বণ্যা বইয়েছেন। ভোটের আগে অনেক প্রার্থীর লোকজন বস্তিতে টাকার থলি হাতে গিয়েছেন। টাকার বিনিময়ে গরীব ভোটারদের কেনার চেষ্টা চলেছে সমানে।

এর পাশাপাশি নাগরিক ভোটারদের আধুনিক ছোঁয়া দিতে গিয়ে একাধিক প্রার্থী কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন। এদের কারো কারো খরচের অংক ৪/৫ কোটি টাকা

www.pathagar.com

ছাড়িয়ে গেছে। জানা গেছে, শুধু ভোটার স্লিপ তৈরি, তা ঘরে ঘরে পৌছানোর কাজেই অনেক প্রার্থী প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। অনেকে ভোটের বেশ কয়েক মাস আগে থেকে ভোটারদের বাড়িতে ঈদ কার্ড, ফুল পৌছে দিয়েছেন। কেউ ভিডিও সার্কিটে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভোট দেয়ার আহবান। [বাংলাবাজার ২০.৬.৯৬]

কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেন প্রার্থীরা?

মিজু রহমান ঃ ১২ জুনের নির্বাচন সম্পর্কে এখন সার্টিফিকেট দেয়া নেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ রাজনীতিকরা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ-এই তিন শব্দের মোহে একেবারেই বেহুঁশ। আর এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে চড়া দাম উঠেছে বিদেশীদের দেয়া সার্টিফিকেটের। এই ব্যাপারটি এবার ১৯৯১ সালকেও হার মানিয়েছে। বিদেশীদের দেয়া সার্টিফিকেট এবং নিজের দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে এদেশের রাজনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন।যখন কিছু তাদের পক্ষে যায় তখন তারা গদগদ হয়ে ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুঁজে পেতে সচেষ্ট হন। আর এর বিপরীতে তাদের আচরণ ঠিক উল্টো। বিএনপির নির্বাচিত সরকার উৎখাত এবং কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কমনওয়েলথের ভূমিকায় আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ ছিল। ১২ জুনের পরে সেই কমনওয়েলথের দেয়া সার্টিফিকেটে আওয়ামী লীগের মেজাজ-মর্জি খোশ। অনুরূপভাবে বিএনপিও তার পরাজয়কে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। বিদেশী সার্টিফিকেটগুলো তার চক্ষুশূল।

কিন্তু কথা হচ্ছে, রাজনীতিকদের এই গ্রহণ-বর্জনের আড়ালে নির্বাচন কতোটা ফেয়ার হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য আত্মসমালোচনার সুরে বলেছেন, ১২ জুনের নির্বাচন একটি মহৎ অর্জন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সুবাদে হুজুগপ্রিয় বাঙালি জাতি হুজুগের আরেকটি গহবরে নিজেকে ঠেলে দিয়ে এখন খাবি খাচ্ছে। তার চোখে প্রকৃত অপ্রিয় সত্যও ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হচ্ছে। ভায়োলেন্স এবং ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ফ্রি নির্বাচনই যে ফেয়ার নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি নয়-তা অনেকেই ঠাহর করতে পারছেন না। অথবা চোখ বন্ধ করে রেখেছেন! অথবা অন্য কথায়, এ হচ্ছে সে ধরনের কনে দেখা, যেখানে কনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে বরপক্ষেরই কোন গরজ নেই। ভূষণ দেখেই ধণ্য। ১২ জুনের নির্বাচনে একজন প্রার্থীর ব্যয়সীমা বেঁধে দেয়া ছিল তিন লাখ টাকা। কিন্তু নির্বাচনে ৫০ লাখ টাকা বা তারও বেশি ব্যয়কারী প্রার্থীর সংখ্যা নেহাৎ হাতে গোনা নয়। নির্বাচন আইনে এমন বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, একজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্যয়ের উৎস সম্বলিত একটি বিবরণী জমা দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে অনেকে প্রবীন নেতাসহ বেশকিছু প্রার্থী এই বিবরণী জমা দেননি বলে জানা যায়। এসব বিধি-বিধান লংঘন করলে দু' থেকে সাত বছরের কারাদন্ড ভোগ করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা বা করতে সক্ষম হবে- এ ধরনের ভাবনায়

www.pathagar.com

নেকেই সংশয় প্রকাশ করছেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনেও অনুরূপ বিধান ছিল। কিন্তু া লংঘনের দায়ে কোন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন একটি তদন্তও ারিচালনা করেনি। এবারেও হয়তো হবে না। তাহলে কিভাবে বলা সম্ভব হবে ১২ নের নির্বাচন 'ফেয়ার' হয়েছে? জাতীয় সংসদকে অনেকেই ইতিমধ্যে বলেছেন মিলিয়নিয়ারদের ক্লাব।' কোটি কোটি টাকা খরচ করে যেসব ধনকুবের সংসদে এসেছেন তারা জাতিকে কি দেবেন? বলা হয়ে থাকে, শত বৈরিতা সত্ত্বেও পঞ্চম জাতীয় সংসদে কয়েকটি বিষয়ে রাজনীতিকরা মতৈক্যে পৌছান। এরমধ্যে ছিল- এমপিদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, গম বণ্টন, ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট বহন এবং ট্যাক্স-ফ্রি গাড়ি আমদানি। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বছর কয়েক হলো গ্রামে একটা প্রবাদ চালু হয়েছে। তা হলো চেয়ারম্যান-মেম্বার সাহেবরা ইলেকশন খরচটা গম বেচেই পুষিয়ে নেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আসা এমপি সাহেবরা এবার কিভাবে পুষিয়ে নেবেন- সেটাই দেখার বিষয়। অপরদিকে নির্বাচন কমিশনের বেধে দেয়া সর্বোচ্চ ব্যয় তিন লাখ টাকার হিসেব-নিকেশ সম্পর্কে সচেতন মহলের মতামত হচ্ছে এতকিছু দেখা এবং শোনার পর নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের কাছে তিন লাখ টাকা ব্যয়ের হিসেব চেয়ে নিশ্চয় আর হাসাবেন না। [রোববার / ২৩-৬-৯৬]

www.pathagar.com

নির্বাচন ও এনজিও'র ভূমিকা

এবারের নির্বাচনেই শুধু নয়, বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে বিতব অনেক পুরনো। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বহু আগে।দিনে দিনে তা আরো শক্তভাবে শেকড় গেড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শেষ দিনগুলোতে এনজিওদের বাড়াবাড়ি যেন চরমে পৌছায়। ১২ জুনের নির্বাচনকে ঘিরেও তাদের তৎপরতার ছিল সর্বাত্মক। এসব দেখে-শুনে পর্যবেক্ষকরা গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেনঃ দাতা সংস্থাগুলোর বিদেশী প্রতিনিধিদের চোখের সামনে এনজিওরা যেভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন তার আসল রহস্য কোথায়।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পরে এনজিওদের মুল সংগঠন এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ-এর সভাপতি ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত জনতার মঞ্চে অংশ নিয়ে সকলের নজর কাড়েন। এ ঘটনা নিয়ে অবশ্য খোদ এডাব কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। একটি সভায় ডঃ ফারুক তুমুলভাবে সমালোচিত হন। এমনকি এডাব দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে বলেও সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ৪ মার্চ ১৯৯৬ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অভিন্ন সুরে এডাব গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিলের দাবি তোলা হয়। অথচ বিরোধীদলের এই দাবি ছিল নেহাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । ১২ জুনের নির্বাচনের পর এটা এখন পরিস্কার যে, ১৫ ফেব্রুয়ারি'র নির্বাচন বাতিলের কোন আইনগত পথ নতুন সরকারের কাছে খোলা থাকবে না।

১২ জুনের নির্বাচন 'পর্যবেক্ষণ' এনজিওগুলোর উৎসাহ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আতিশয্যকেও ম্লান করে দিয়েছে। তাদের হাজার হাজার কর্মী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। এর মধ্যে ফেমা-র মত নির্বাচনকেন্দ্রিক কয়েকটি এনজিও'র বিশষ তৎপরতাতো ছিলই। উল্লেখ্য যে, বিভন্ন মহলের আপত্তি ও প্রতিবাদের মুখে ফেমা'র রেজিস্ট্রেশন বিএনপি সরকার প্রদান করেনি। কিন্তু তাই বলে তারা থেমে থাকেনি। অঢেল ডলার তাদের তহবিলে। ভোটাধিকার প্রয়োগে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নামে তারা ওই অর্থের সদ্ব্যবহার করেছে ১২ জুনের নির্বাচনে।

এ নির্বাচন বাংলাদেশ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পাল্টে দিয়েছে। সরকার গঠন করতে যাচ্ছে [গঠন করেছে] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ এতদিন তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে এনজিওদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে এসেছে বলা

www.pathagar.com

য়। এনজিওদের বিরুদ্ধে গত দু'দশকে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, দেশের র্থে তার সাঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া ও দিক নির্দেশনার আজ সময় এসেছে। ভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের নাক গলানোটা ভবিষ্যতে কোন মাত্রায় গ্রহণ করা বে-তা দেখার বিষয়। রাজনীতিতে স্থানীয় এনজিও নেতাদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কার কূটনৈতিক মিশনগুলোও এতদিনে বিস্তর আলোচনা করেছে। পশ্চিমা ও উরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে এ প্রশ্নে মতানৈক্য রয়েছে।নরওয়ে বা নেদারল্যাণ্ডের মত ছাট দেশগুলো স্থানীয় এনজিও নেতাদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। এডাব নেতা ডঃ ফারুককে মৌখিকভাবে শোকজও করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য চাওয়া হলে একজন কূটনীতিক ক্তি দেন যে, বাংলাদেশের মতো সমাজ ব্যবস্থায় এনজিওদের অব্যাহত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে স্থানীয় রাজনীতিকে পৃথক রেখে এগোনো যায় না। এই কূটনীতিক অবশ্য ীকার করেন যে, এনজিওগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদানের আগে কার্যত মুচলেকা আদায় করে নেয়া হয় যে, তারা স্থানীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন।

পর্যবেক্ষকরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে এনজিও তৎপরতার আড়ালে এদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের বিশেষ ভূমিকা পালনের তথ্য তো আজ গোপন কোন ব্যাপর নয়। এদেশে আর্ত মানবতার সেবা করতে এসে, এদেশের আলো-বাতাসে বেঁচে থেকে রোজালিন কস্টাররা যখন বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী মন্তব্য রাখেন বিদেশী টিভি নেটওয়ার্কে তখন তো সন্দেহ ঘোচার নয়। উপজাতীদের উস্কে দিয়ে নাগাল্যাণ্ড এবং গারোল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এনজিও করতে আসা বিদেশীদের যোগসাজশের তথ্য প্রমাণতো উদঘাটিত হয়েছে অনেক আগেই।

সুতরাং এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ সামনের দিনগুলোতে তারা কি রাজনীতি নিয়ন্ত্রণেও সক্রিয় হবেন প্রকশ্যে। আর সে লক্ষ্যে এনজিওতে কর্মরত স্থানীয়দেরকে দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে?

গত ২৫ বছর 'সেবা' করা অর্থাৎ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পর জনগণের জীবনমানে উন্নতি কতটা হয়েছে তা আর যাই হোক প্রশ্নাতীত নয়। ঋণের টাকায় ঘি খাওয়ার কালচারের বিকাশে এনজিওরা নাকি লাগসই ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, এদেশের ধনীরা যদি বছরে তাদের যাকাতটা যথাযথভাবে প্রদান করতেন এবং সরকার তার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারতেন তবে এনজিওদের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকার বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটতো।

এ প্রশ্নটি কেউ তলিয়ে দেখবে-না কি এনজিওদের মাধ্যমে বিদেশী খবরদারি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে? [রোববার, ১৬.৬.৯৬]

www.pathagar.com

নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয়ে নির্মূল কমিটির ভূমিকা এবং বিবিধ প্রসঙ্গ

সোহেল মাহমুদ

১.

এবারের নির্বাচনে অনেক চমক সৃষ্টি হয়েছে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলে জামায়াতে ইসলামীর বিপর্যয়। এ নিয়ে সকল মহলেই ব্যাপক আলোচনা- সমালোচনা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর এরূপ নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ কি? এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এক একজন এক এক দৃষ্টিতে দেখছেন। ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টিতে জাহানারা ইমামের 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র তৎপরতার ফলে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-কে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। জাতীয় পার্টির নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, জামায়াতের পরাজয়ে তিনি খুশী হয়েছেন এবং জনগণ তাদেরকে চিনতে পেরেছে। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা বলেন, জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী সকল শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীর মতে জামায়াত আওয়ামী লীগের সাথে একত্রে আন্দোলন করতে যেয়ে সব খুইয়েছে।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তৎপরতার ফলে জনগণ জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এ যুক্তি পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। কারণ তাহলে ঐ কমিটির কাজে যারা অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবার কথা। ডঃ কামাল হোসেন, রাশেদ খান মেনন, হাসানূল হক ইনু এঁরা কেন পরাজিত হলেন? হ্যা, আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক সাহেব নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো তাঁর এলাকায় আগে থেকেই জনপ্রিয়। ঘাদানিক-এর সাথে জড়িত হবার কারণে নতুন করে তার জনপ্রিয়তা রেড়েছে এটা মনে করার কোন যুক্তি নেই। মিজানুর রহমান চৌধূরীর বক্তব্যও ধোপে টিকে না। কারণ জনগণ জামায়াতকে নতুন করে আবিষ্কার করেনি। এ দলটি তো অত্যন্ত পুরাতন। গত পাঁচ বছরে তারা আওয়ামী লীগ ও জাপা-র মত 'গণতান্ত্রিক' দলের সাথে একই দাবীতে আন্দোলন করেছে। জামায়াত নতুন কোন ইস্যূ নিয়ে মাঠে যায়নি, যার কারনে জনগণ তাদেরকে নতুন করে মূল্যায়ন করবে। বরং জামায়াতের বক্তব্যে গতানুগতিক বিষয়ই ছিল- নতুন গতিশীল কোন কথা তারা বলতে পারেনি।

জনগণ 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি' জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একথাও কি ধোপে টিকে?'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি'র বিপরীত হলো 'প্রগতিশীল শক্তি'। আর আমাদের দেশে প্রগতিশীল শক্তি বলতে সাধারণত বুঝানো হয় বামপন্থী দলগুলোকে।

www.pathagar.com

ামপন্থীদের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী দলগুলোও প্রগতিশীল শক্তি নয়। আওয়ামী লীগ, াএনপি ও জাপা পুঁজিবাদী দল হিসেবে তারাও প্রগতিশীল দল নয়। আবার নির্বাচনে থাকথিত প্রগতিশীল দলগুরোর ভরাডুবি ইসলামপন্থীদের চাইতেও করুণ। ভোট াপ্তিতে বলতে গেলে তারা কোথাও শতকের কোটা অতিক্রম করতে পারেনি। সুতরাং লা যেতে পারে জনগণ তথাকথিত প্রগতিশীল শক্তিকেই দারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, জনগণ ইসলামী ও বামপন্থী উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে পুঁজিবাদী দলগুলোকেই বেশী পছন্দ করেছে।

উপরের মূল্যায়নগুলোর পেক্ষাপটে আরো কিছু বিষয়কে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সাধারণত ভোটের আগে ভোটাররা যে সব বিষয়কে বিবেচনায় এনে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রার্থীর সততা, যোগ্যতা, উন্নয়ন, কর্মকাণ্ডের নজীর, দলের াদর্শ ও নীতি, এলাকার জনগণের মধ্যে পরিচিতি, গণসংযোগ ইত্যাদি। এসব পাদানের যদিও দৃশ্যত ভোটারদের বিবেচনায় প্রাধান্য পাবার কথা কিন্তু সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়, এসব কারণ সর্বত্র একই মাত্রায় কাজ করেনি। সততার কথা বিবেচনা করলে এটা অনেকেই স্বীকার করবে যে, জামায়াত প্রার্থীদের সততা নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন নেই। কারণ সততা প্রধানত যাচাই হয় ক্ষমতায় গেলে। জামায়াত যেহেতু ক্ষমতায় অতীতে ছিল না, সুতরাং তাদের সততার প্রশ্ন জনগণের কাছে বিবেচ্য ইল না। 'যোগ্যতার প্রশ্ন তো সব দলেই রয়েছে। এমন কি প্রধান দুটো দলের শীর্ষ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কেও তো কত কথা বলা হয়। দেশের বহু স্থানে দেখা গেছে, যোগ্যতম প্রার্থী সাধারণ প্রার্থীর কাছে হেরে গেছেন। সুতরাং যোগ্যতাকেও মাপকাঠি হিসেবে ভাটাররা বিবেচনা করে না। এর পরে আসে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে। এরূপ একটা ধারণা করা হয়ে থাকে যে, যে প্রার্থী বিশেষত সাবেক মন্ত্রী বা এমপি বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়ন কাজকর্ম তেমন করেনি, তাদেরকে জনগণ পছন্দ করেনি। এটাও সঠিকভাবে সত্য হতে পারে না। দেখা গেছে বিএনপির প্রায় সব মন্ত্রী এবং অনেক এমপি বিগত পাঁচ বছরে এলাকায় প্রচুর কাজ করেছেন, কিন্তু তাদের অনেকেই নির্বাচিত হতে পারেননি।আবার এলাকায় তেমন কোন কাজই করতে পারেননি, তা সত্ত্বেও ৯১ সালের চাইতেও বেশী ভোটে জিতেছেন। আবার বিএনপি'র সাইফুর রহমান তাঁর এলাকায় ব্যাপক কাজ করার সুবাদে ১৯৯১ সালে পরাজিত হয়েও এবারে দু'টো আসনে জিতেছেন। অলি আহমদও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে জিতে গেছেন। জামায়াতের সব এমপি এলাকায় কাজ করতে না পারলেও মতিউর রহমান নিজামীর এলাকায় যতদূর জানা যায প্রচুর কাজ হয়েছে, তা সত্ত্বেও জনগণ তাঁকে পছন্দ করেনি। সুতরাং একথা বলা যায় যে কেবল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দ্বারাই জনগণের হৃদয় জয় করা যায় না। এলাকার জনগণের পরিচিতি ও গণসংযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জামায়াতের যে বিশাল কর্মীবাহিনী রয়েছে তাতে তাদের গণসংযোগে কোন ঘাটতি ছিল না। বিশেষ করে অন্যসব দল যখন প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল তখন জামায়াত প্রার্থীরা

www.pathagar.com

এলাকায় গণসংযোগে ৮ষে বেড়িয়েছেন। এদের নেতা-কর্মীরা অন্য যে কোন দলের চাইতে আচরণে অনেক বিনয়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণ এর কোন মূল্য দেয়নি। বর বিপরীতে দেখা গেছে, কোন কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবনাচার নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নবোধব থাকা সত্ত্বেও তারা বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া এলাকার সাথে অতীতে যোগাযোগ ছিল না, এরূপ অপরিচিত সাবেক আমলা ও ব্যবসায়ীও জিতে গেছেন। এরপরে আসা যাক দলের ইশতেহার বা ঘোষণাপত্র সম্পর্কে। একটা দলের ইশতেহারে রাষ্ট্র পরিচালনার যে সব নীতিমালার ইংগিত থাকে তা সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমাদের দেশের জনগণের খুব সামান্য সংখ্যকেরই আছে। যদি চমক সৃষ্টিকারী কিছু কর্মসূচীর কথাও বলা হয়, তাহলে দেখা যায়, বিএনপি ও জাপা অনেক সুন্দর কর্মসূচীর কথা বলেছে। বিশেষ করে বিএনপি বৃদ্ধদের জন্য পেনশন ও মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘোষণা ছিল। কিন্তু জনগণ তার প্রতি তেমন মনোযোগ দিয়েছে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে তেমন আহামরি কিছু ছিল না তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ভোটার তাদেরকে পছন্দ করেছে। সুতরাং ইশতেহার জয়লাভের জন্য কোন কারণ হিসাবে বিবেচিত হবার কথা নয়।

গণমাধ্যমে দলের ইমেজ গড়ে তোলার বিষয়টি একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসবে কাজ করেছে বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে এবারে বিটিভিতে 'সবিনয় জানতে চাই' অনুষ্ঠানে জামায়াত ও বিএনপির পারফরমেন্স নির্বাচনে তাদেরকে অনেক ক্ষতি করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। তবে এটাকেও সর্বাংশে দায়ি বলে ধরে নেয়া যায় না। যেমন মওদুদ অহমেদ সাহেব ঐ অনুষ্ঠানে ভাল করলেও তাঁর ভোটাররা সেজন্য তাঁকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি। আবার ঐ অনুষ্ঠান গ্রামদেশের সাধারণ মানুষ তেমন একটা দেখেনি। রাত ১০-৩০ মিনিটের পরের ঐ অনুষ্ঠান গ্রামের ক'জন দেখতে পেরেছে? অবশ্য আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানটি রাত ৯.০০টায় হওয়ায় অনেকেই দেখার সুযোগ পেয়েছে। তবে সমাজের সচেতন অংশের মধ্যে এর কিছু প্রভাব পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রেডিও-টিভিতে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা একটা প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয়। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে দেয়া বেগম জিয়ার ভাষণ তাঁকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল এবং পক্ষান্তরে, শেখ হাসিনার বক্তৃতা তাঁর পরাজয়ের বড় কারণ ছিল। কিন্তু এবারে বিগম জিয়া ১৯৯১ সালের চেয়েও অত্যন্ত সুলিখিত ও আকর্ষণীয়ভাবে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও তার প্রভাব ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারেনি। অপরদিকে শেখ হাসিনা এবারে আগের চাইতে ভাল বক্তৃতা করেছেন। এবং তাঁর আবেগময়ী নিবেদন ভোটারদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। জামায়াত এ ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণের মত কিছু করতে পারেনি। জাপা'র জেনারেল এরশাদ ভাষণ দিতে পারলে হয়তো তার ব্যাপক প্রভাব পড়তো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভোটারদের প্রভাবিত বা মন জয়ের জন্য যে সকল উপাদান সাধারণত বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তাতে বিশেষ কোন

www.pathagar.com

কারণে জামায়াত প্রার্থীরা বিপর্যস্ত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে কৌশলগত ও অন্যান্য যে কোন কারণ জামায়াতের ভোট হ্রাসের জন্য দায়ী হতে পারে তা হলোঃ

কৌশলগত ত্রুটিঃ জামায়াত নেতৃবৃন্দ এবারে আক্রমণের লক্ষস্থল করেছিল বিএনপি-কে। উদ্দেশ্য ছিল, বিএনপি'র ভোটগুলো তারা পাবে। কারণ আওয়ামী লীগের ভোট রিজার্ভ। সেগুলো জামায়াতের পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও বিএনপির ভোটার অভিন্ন- তারা আওয়ামী বিরোধী ভোটের অংশীদার। সেখানে লোকেরা জামায়াতের সমালোচনার কারণে বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়েছে তারা বিকল্প হিসেবে জাপা-কে বেছে নিয়েছে। এজন্য দেখা যায়, জাপার ভোট এবারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জামায়াতের ভোট কমেছে। প্রচারণার শেষ পর্যায়ে যখন অধ্যাপক গোলাম আযম নৌকা ঠেকাতে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিতে বলেছেন, তখন সম্ভবত হিতে বিপরীত হয়েছে। লোকেরা নৌকা ঠেকাতে ধানের শীষকেই শক্তিশালী বিকল্প মনে করেছে এবং কোন ক্ষেত্রে জাপা-কে।

ভোটারদের সাধারণ মানসিকতা ঃ আমাদের দেশের ভোটাররা প্রায়শই একটা জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়। ১৯৭০, ১৯৭৯, ১৯৯১-তে এরূপ দেখা গেছে। জনগণ হয় সরকারের পক্ষে, নচেৎ বিকল্প শক্তিশালী দলকে পছন্দ করে। তবে প্রধানত সরকার বিরোধী প্রবনতার ধারাকেই তারা বেশী পছন্দ করে। এবারে নৌকার প্রতি মোটামুটি একটা জোয়ার সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ সক্ষম হয়েছে। এর বিপরীতে আওয়ামী বিরোধী ধারাটিও চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং তারা বিএনপি ও জাপা-কে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে বেগম জিয়া ও এরশাদের ভাবমূর্তি কাজে লাগে। জামায়াতের অধ্যাপক গোলাম আযম এরূপ চ্যালেঞ্জিং ইমেজ সৃষ্টি করতে পারেননি।দলীয় ও ব্যক্তি ইমেজ যে এলাকায় যার বেশী হয়েছে সে এলাকায় ঐ দল তত বেশী ভোট পেয়েছে।

এনজিওদের তৎপরতাঃ এনজিও-রা এবারে একটা নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে মনে হয়। ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের বিপুল হারে উপস্থিতির প্রধান কৃতিত্ব এনজিওগুলোর। এর সংগে তারা আরেকটি কাজ করেছে। তারা ইসলামী দলগুলো বিশেষত জামায়াত প্রার্থীদের ভোট দানে নিরুৎসাহিত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এটা ভোটারদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। মহিলা ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি এবং অন্য দু'টি বড় দলে ভোট দানের পরে জামায়াতের ভোট প্রাপ্তির ব্যবধান বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কালো টাকাঃ অন্যান্য বড় দলের প্রার্থীদের তুলনায় জামায়াত প্রার্থীরা আর্থিকভাবে দূর্বল। এবারে নির্বাচনী আচরণ- বিধি মত তিন লাখের বেশী টাকা খরচ না করার নিয়ম আদৌ পালিত হয়নি। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জামায়াত প্রার্থীরা উচ্চবিত্ত প্রার্থীদের কাছে মার খেয়ে গেছে বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

প্রশাসনের নিরপেক্ষতাঃ এবারে বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনে জামায়াতের লোক হাতে গোনা। ফলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও জামায়াত কোন সুফল পায়নি। এরূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বিএনপির বেলায়ও ঘটেছে।

জালভোট ও সন্ত্রাসঃ জালভোট ও সন্ত্রাস নির্বাচনী ফলকে প্রভাবিত করেছে বলে বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির নেতারা অভিযোগ করছেন। কিন্তু সুনির্দিষ্ট অভিযোগও উত্থাপিত করেছেন। কিন্তু বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, এরূপ সামান্য কিছু ঘটে থাকলেও তা সার্বিক নির্বাচনী ফলাফলে তেমন প্রভাব ফেলেনি। তাদের অভিমতের পরে এ ধরণের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

ভোটারদের আস্থা অর্জনে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দল পুরোপুরি বর্থ হয়েছে। জনগণ যখন কোন দলের নেতৃত্ব, তাদের বক্তব্য দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় তখনই তাদের ভোট লাভ করা যায়। ইসলামী আইন জনগণের জন্য কেন কল্যাণকর একথা বুঝাতে নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়েছেন। জনগণ এবারের নির্বাচনে ধর্মকে কোন বিবেচ্য বিষয় হিসেবে মনে করি। আওয়ামী লীগ ধর্মের ব্যাপারে দৃশ্যত কিছু প্রদর্শনী করায় জনগণ ঐ দলকে অন্তত ধর্ম বিরোধী মনে করেনি। দেশের লোকেরা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বুঝে না। এটাকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ভাবতেই তারা বেশী অভ্যস্ত। তাবলীগ জামাত ও পীরদের কাছ থেকে তারা সেটাই শিক্ষা পায়। এছাড়া মহিলাদের মধ্যে ইসলামের পরিচয়ও তেমনভাবে তুলে ধরা হয় না। ইসলামী দলগুলোর অনৈক্য এবং একাধিক ইসলামী দলের প্রার্থী মনোনয়ন ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এবারে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দলের বিপর্যয়ের অবস্থার কারণে তাদের কর্মী-সমর্থক ও শুভাকাংখীদের ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাদেরকে এখন নব নব কর্মকান্ডের পর্যালোচনা করতে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নেতৃত্বের পরিবর্তন আনতে হবে।

২.

জামায়াতে ইসলামীর কি সত্যিকার অর্থেই বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটেছে? এ প্রশ্ন আলোড়িত করেছে দলের সমাগ্র জনশক্তির তথা সমর্থক কর্মী শুভাকাংখীদের। এমনকি বিরোধীরাও স্তম্ভিত হয়েছে জামায়াতের নির্বাচনী ব্যর্থতায়। ইসলামী আন্দোলন বিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো বাংলাদেশে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর দুর্বল অবস্থান দেখে হয়তো বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় সকল দল ও সংস্থা এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত নিয়ে কম-বেশী উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে।

প্রকৃত পক্ষে ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে এদেশে জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামী আন্দোলনের বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটেছে, এমনটি মনে

www.pathagar.com

করার কোন কারণ নেই। জামায়াতের জন্য নির্বাচনী ফলাফলের উল্লেখযোগ্য দিক হলোঃ

(ক) ১৯৯১-এর নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের মাত্র ১টি রক্ষা করতে পেরেছে; অবশিষ্ট ১৭টি আসনই হারিয়েছে।

(খ) ১৯৯১-এর নির্বাচনে প্রাপ্ত শতকরা ১২ ভাগ ভোটের মূলে এবারে তা কমে গিয়ে ৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে।অর্থাৎ পূর্বে প্রাপ্ত ৪২ লাখ ভোট কমে এবারে প্রায় ৩৭ লাখে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতসংখ্যা আরো কমেছে। কারণ ১৯৯১ সালে তাদের প্রার্থী ছিল ২২০, এবারে ৩০০।

(গ) ১৯৯১ সালে যেখানে ৪৮টি আসনে জামায়াত প্রার্থীরা দ্বিতীয় স্থানে ছিল, সেখানে এবারে মাত্র ১০/১১টি আসনে তারা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসেছিল এবং তাও ভোটের ব্যবধান ছিল বেশী।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামায়াতের ভোট প্রাপ্তির পরিমান যে হারে কমেছে, আসন প্রাপ্তির হার কমেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। তবে ৬লাখ ভোট কমলেও ৩৬লাখ ভোট প্রাপ্তি রাজনৈতিক বিচারে উপেক্ষা করার মত নয়। অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোট যোগ করলে ইসলামী শক্তির পক্ষের ভোট ৪৫ লাখের মত হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেশে ইসলামী হুকুমত পন্থী ভোটারের সংখ্যা কম-বেশী অর্ধ কোটির মত। এছাড়া ইসলামপন্থী অনেক ভোটার নানা কারণে বিএনপি-ও জাতীয় পার্টিকেও ভোট দিয়েছে। যে মতাদর্শের পক্ষে দেশের প্রায় অর্ধ-কোটি লোকের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন রয়েছে তাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। যারা জামায়াত বা ইসলামী শক্তিগুলোর বিরাট বিপর্যয় ঘটেছে মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। পক্ষান্তরে, একথা মনে করার যথেষ্ঠ যুক্তি রয়েছে যে, বামপন্থীরা জনগণের কাছে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এদের অস্তিত্বই প্রায় বিলীন হবার পথে। এরা অতীতের কোন নির্বাচনকেই নিজস্ব বৈশিষ্টে উল্লেখ করার মত আসন পায়নি। ১৯৯১ সালে 'নৌকার' ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কয়েকটি আসন পেয়েছিল। এবারের নির্বাচনে সেরূপ সম্ভব হয়নি বলে বামপন্থীদের প্রকৃত বিপর্যয় ঘটেছে। তারা শতকরা এক ভাগও পায়নি। ২/১জন প্রার্থী বাদে সকল বামপন্থী (গণফোরামসহ) প্রার্থীরা জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যদি ধরে নেয়া হয় দেশে কমপক্ষে অর্ধ-কোটি ইসলামপন্থী ভোটার রয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী ভোটারের সংখ্যাও এক কোটির বেশী। এদের আবার অধিকাংশই প্রকারান্তরে মুসলিম জাতীয়তাবাদী তথা ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারত-বিরোধী। বলা বাহুল্য, এসব ভোটাররা আওয়ামী লীগ বিরোধী। এরা দল হিসেবে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোকে ভোট দিয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী ভোটাররা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এরা নানা কারণে নির্বাচনের সময় বিশেষ কোন দলের প্রতি

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়ে। নির্বাচনের ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবারে বিএপি-র মোট আসন সংখ্যা কমলেও প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা প্রায় ৪%ভাগ বেড়েছে। আবার আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা বাড়লেও পাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

জামায়াতের প্রাপ্ত ভোট ৪% কমে যাওয়া এবং বিএনপি-র ভোট ৪% বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এটা মনে করার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে যে, জামায়াতের এ ভোট গুলো বিএনপি-র বাক্সে পড়েছে। জামায়াতের ভোটাররা বিএনপি-র প্রতি ঝুঁকে পড়লো কেন? এর প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) ইসলামপন্থী ও সেকুলারিজম বিরোধী ভোটাররা মনে-প্রাণে আওয়ামী লীগ ঠেকাতে আগ্রহী এবং এজন্যে বিএনপিকে তারা কার্যকর ও সম্ভাবনাময় দল মনে করে। এসব ভোটাররা ইসলাম ও জামায়াতকে পছন্দ করলেও আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে জামায়াতকে বিকল্প শক্তি মনে করতে পারেনি। এরা জামায়াতের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বিএনপি-র বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখাকে পছন্দ করেনি। অবশেষে জামায়াত নেতৃবৃন্দ যখন 'নৌকা ঠেকাও' শ্লোগান শুরু করলেন তার প্রতিক্রিয়া তাদের নিজেদের জন্য হলো বুমেরাং। ভোটাররা 'নৌকা ঠেকাতে' দাড়িপাল্লার চাইতে ধানের শীষে ভোট দেয়াকেই জরুরী মনে করলো। জামায়াতের ভোট কমে যাওয়ার প্রধান কারণ এটি বলেই মনে হয়।

জামায়াত ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে একটি বড় ধরণের ভুল করেছে। দলটির সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সারা দেশে থাকলেও নির্বাচনী কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য যে সকল কার্যকর সহায়ক উপাদান বিদ্যমান থাকা দরকার- যেমন, উপযুক্ত প্রার্থী, অর্থ, দলীয় নেতৃত্বের ইমেজ ইত্যাদিতে জামায়াতের মারাত্মক সীমাবদ্ধতা ছিল। আমাদের সমাজ কাঠামোতে যে ধরনের প্রার্থীদের ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত সক্ষমতা রাখেন জামায়াত সে ধরনের প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারেনি। তাদের ছিল মারাত্মক অর্থ সংকট। জামায়াত দলীয় ভাবে অর্থ সংকটে ছিল তো বটেই, তাদের প্রার্থীরাও প্রায় সকলে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । অথচ টাকার বিষয়টি ছিল নির্বাচনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান।

জামায়াত যদি বিএনপি-র সাথে একটা নির্বাচনী সমঝোতায় উপনীত হতো তাহলে হয়তো দেশের সার্বিক নির্বাচনী ফলই ভিন্নরকম হতো বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া ইসলামী দলগুলোর সাথে সমঝোতায় না আসার ফলেও জামায়াতকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। জনগন ইসলামী দলগুলোকে একাধিক মার্কায় দেখতে পছন্দ করে না। ভবিষ্যতেও এ বিষয়টি নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের জনগন সার্বিকভাবে ধর্মপ্রাণ। এবারের নির্বাচনে এটা আবার প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেত্রীর ধর্মীয় বিষয়ে আন্তরিকতা প্রদর্শন এবারে

www.pathagar.com

জনগণকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছে। ধর্ম-বিদ্বেষী-পন্থীদের জনগন প্রত্যাখ্যান করেছে। দুই বৃহত্তর দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ই আল্লাহ-র নাম বার বার নিয়ে জনগণের কাছে ভোট চেয়েছে। আওয়ামী লীগ দৃশ্যতঃ উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করেছে। পক্ষান্তরে জনগণ ইসলাম ধর্মপ্রাণ হলেও ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণা সম্পর্কে পরিস্কার নয়। এদেশে তাবলীগ ইজতেমায় ২০/২৫ লাখ মুসল্লী এবং জুম্মার জামায়াতে লাখ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটলেও তারা ভোট প্রদানের সময় ইসলামী দলগুলোকে ভোট দেয় না। এর কারণ এটাই যে, জনগণ ইসলামী সরকারের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্দি করতে পারেনি। বলাই বাহুল্য, এজন্য জনগণ নয়; জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর ব্যর্থতাই দায়ী। তারা জনগণকে ইসলামী সরকারের প্রয়োজনীয়তা জনগণকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে।

দেশের ভোটারদের অর্ধেক হচ্ছে মহিলা। জামায়াত প্রার্থীরা মহিলা ভোটারদের ভোট কম পেয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয়। জামায়াতের সামগ্রিক সর্মসূচী ও কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নেই বললেই চলে। দেশে ইসলাম প্রচারের যতগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে মহিলাদের ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত। জামায়াতের কর্মসূচী ও বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা আরো কম। আবার পর্দার ব্যাপারে জামায়াতের কড়াকড়ির নীতির কারণে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে একটা 'জামায়াত ভীতি' রয়েছে। এটা দূর করার জন্য জামায়াতের কার্যকর কোন কর্মসূচী ছিল না। পক্ষান্তরে, মহিলাদের 'সেকুলার' ও 'আধুনিক' ধ্যান-ধারনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের সরকারী, বেসরকারী, উদ্যোগের অভাব নেই। সম্প্রতি এনজিও-রা এ ব্যাপারে নীল নক্শা বাস্তাবায়ন করে যাচ্ছে। মহিলা ভোটারদের উল্লেখযোগ্য পরিমান ভোট জামায়াত ও ইসলামী শক্তিগুলো না পেলে এদেশে তাদের ক্ষমতায় যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

কতিপয় এনজিও-র তৎপরতা সাম্প্রতিককালে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এদের তৎপরতা সরাসরিভাবে ইসলামী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে গেছে বলে জামায়াত নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। কয়েকটি বিশেষ ধরনের এনজিও-র নীতিও কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে একথা মনে করার যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে যে, তারা ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে সূক্ষভাবে কাজ করেছে। এমনকি সূত্র বিশেষে তাদের সদস্যদের চাপের মুখেও রেখেছিল। গেল কয়েক বছরে এনজিও-দের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের সক্রিয় তৎপরতার কারণে তারা নির্বাচনে এদের বিরুদ্ধে যেতে আরো বেশী আগ্রহী হয়। এর সাথে ছিল আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে তথাকথিত মৌলবাদের উত্থান প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র নানাভাবে কার্যকর করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের তৎপরতা ও এনজিও-দের কার্যক্রম তার মধ্যে অন্যতম।

www.pathagar.com

আরেকটি বিষয় এদেশের ইসলামপন্থীদের মারাত্মক দূর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেটা হলো নির্বাচনী কৌশল। একটা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ; যেমন, ভোটার তালিকা তৈরী, ভোটারদের আকৃষ্ট করার মত বক্তব্য, কর্ম পরিকল্পনা, মনিটরিং, ভোট কেন্দ্রে , সন্ত্রাস জাল ভোট, কারচুপি প্রতিরোধ, প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, ভোটারদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এসব ক্ষেত্রে জামায়াত কর্মীরা দক্ষ নয়। অথচ আমাদের দেশের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকা জরুরী। এসব বিষয়ে কিছু অনৈতিক ও মিলিটান্ট পদক্ষেপ প্রয়োজনে নিতে হয়, যা জামায়াত কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের অতীতের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্যারিজম সম্পন্ন নেতৃত্ব যখন যে দলে আবির্ভূত হয়েছে তখন তারা নির্বাচনে জয়লাভে তা বিরাট ভুমিকা রেখেছে। নেতৃত্বের ক্যারিজমা কম-বেশী হতে পারে। যেমন- বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, জেনারেল এরশাদ সকলেই একাধিক আসনে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু জামায়াতে বা কোন ইসলামী দলে ক্যারিজমা সম্পন্ন কোন নেতা ছিল না। জনগণকে আবেগ-উদ্বেলিত করার ক্ষমতা কোন ইসলামী নেতার নেই। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এক্ষেত্রে সফলকাম বলে মনে হয়।

কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার রূপকার জামায়াতে ইসলামী হওয়া সত্বেও আন্দোলনের মাধ্যমে তারা নিজস্ব ইমেজ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাদের সক্রিয় আন্দোলনী তৎপরতার সুফল আওয়ামী লীগের ঘরে গেছে। এটা জামায়াত নেতৃত্বের ব্যর্থতার পরিচায়রক। কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের সময় যে সকল ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং যা জনগণ কর্তৃক প্রশংশিত হয়নি, তাতে জামায়াতের অংশগ্রহণ ইসলামী জনতা ভাল চোখে দেখেনি।

পরিশেষে বলা যায়, জামায়াতের মত ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনের রক্ষণশীলতা এত বেশী যে দলটি গণসংগঠনে পরিণত হতে পারে নি। জনগন থেকে কিছুটা দূরত্বে অবস্থানকারী জামায়াত নেতা কর্মীরা যেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। এরা নিজ দলের ক্যাডার ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহন করতে পারে না। একটু যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের ধারণ করার ক্ষমতা দলটির নেই। বিশেষ একটি শ্রেণী চরিত্র এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এরা ইসলামের জন্য কাজ করলেও জনগণের সমস্যা নিয়ে, মজলুম মানুষের অধিকার নিয়ে এবং দরিদ্রদের মুক্তির জন্য হৃদয় উজাড় করে কাজ করতে পারে না।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ মহাজনী শোষণের অভিনব হাতিয়ার

মীর ইলিয়াস হোসেন

গ্রামীণ ব্যাংকঃ মহাজন অতিশয়

"বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দরিদ্রতম মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক শুধু হাজার হাজার পরিবারের অবস্থারই রাতারাতি উন্নতি ঘটায়নি জনসাধারণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার এক মহান অনুভূতিও সৃষ্টি করেছে। আর তাই গ্রামীণ ব্যাংক তৃতীয় বিশ্বের জন্য মডেল।" এই উক্তি আর কারও নয়। বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়ল বিল ক্লিনটনের স্ত্রী, শান্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রবক্তা আমেরিকান ফার্ষ্ট লেডি হিলারী ক্লিনটনের। সম্প্রতি কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণদানকালে মিসেস ক্লিনটন উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এ দিকে বিশ্ব থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করার গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের আত্মহারা হয়ে ধন্যবাদ দিতে এদেশের জিয়াউল আহসান সাহেবরা 'জনকণ্ঠে' পাতা ভরে চলেছেন। (জনকণ্ঠ ১৬ ডিসেম্বর'৯৪ সংখ্যা দেখুন)

বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা এবং বিশ্বব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রবার্ট ম্যাকনামারার জবানীতে শুনুনঃ "আজ আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে বিশ্বখাদ্য পুরস্কারে ভূষিত করছি, যিনি 'অর্থই ক্ষমতা' এই পুরানো (পুঁজিবাদী- লেখক) নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। অল্প পরিমাণ অর্থের সংগে অল্প পরিমাণ ক্ষমতাও মানুষের হাতে আসে। (কিন্তু তিনি বৃহৎ পরিমাণ অর্থশালীদের দাপটে এ স্বল্প ক্ষমতার যে কোন কার্যকরীতা নেই, সে কথা বলছেন না-লেখক) অল্প পরিমাণ অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের একজন গরীব মানুষ শস্য রোপন করতে পারে। (ভূমিহীনদের জমি কোথায়, যেখানে শস্য রোপন করতে পারে? পারে কি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে?-লেখক) সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় বড় ধরণের ঋণ ধনী লোকদের যে ক্ষমতা দেয় ডঃ ইউনুসের ব্যাংক থেকে দেওয়া স্বল্প পরিমাণের ঋণ অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের সে ধরণের ক্ষমতা দান করে। (তুলনাহীন তুলনা বটে- লেখক) এ ক্ষমতা হচ্ছে টাকা উপার্জনের ক্ষমতা। যে সব লোক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে, তাদের গড়পড়তা আয় ৩ বছরে ৫০% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুষ্টিমান, ক্যালোরী গ্রহণ, শারিরীক আয়তন এবং এমনকি উচ্চতাও বেড়েছে(?)" ম্যাকনামারা মহাশয়ের প্রশস্তি অভিনব নয় কি?

www.pathagar.com

এবার আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্বখাদ্য ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা জিমি কার্টারের অমৃতবাণীঃ "ডঃ ইউনূস উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশাল অবদান রেখেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশের লাখ লাখ মানুষকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করেছেন তিনি। দারিদ্র্য-পীড়িত এই মানুষদের এখন আর অনাহারে থাকতে হয় না। (লক্ষ্য করুণ-অনাহারে থাকতে হয় না- লেখক) ইউনূস তার জাতির দরিদ্র মানুষের আয়ের ও কর্মসংস্থানের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন" (জনকণ্ঠ ১০ ১১- ৯৪ ইং)।

বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার ফাউন্ডেশনের মহামহিম সভাপতি জন রুয়ান উপদেষ্টাদ্বয়ের সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের অবগত করছেন, আশ্বস্থ করছেনঃ "বাংলাদেশের যে ব্যক্তি বা পরিবার গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় এসেছে তারা গ্রামের অন্য পরিবারগুলির চাইতে উন্নতমানের খাবার খাচ্ছে। তাদের উচ্চতা ও ওজন অন্যদের চাইতে বেশী। (এ জন্যই কি বাংলাদেশে এইডস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি রুয়ান সাহেব?) মিঃ জন রুয়ান ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেনঃ "ডঃ ইউনূস পেরেছেন লাখ লাখ অভূক্ত মানুষের থালায় খাবার তুলে দিতে (না খাবার থালা কেড়ে নিতে?) এবং এ ভাবেই তার কাজ দিয়ে তিনি (পুঁজিবাদী) বিশ্বকে দিয়েছেন বিশাল সেবা" (দৈনিক জনকণ্ঠ ০৮-১১-৯৪)। আর তাই টেক্সাসের ভূতপূর্ব লেফট্যান্যান্ট গভর্ণর বিল হবি যথার্থই বলেছেনঃ "গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রপ্তানী।"

গ্রামীণ ব্যাংকের অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে দেশ-বিদেশে আলোচনার ঝড় উঠেছে। বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে শুরু করে এ দেশের সরকার, গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছে। যার ফলস্বরূপ "বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার '৯৪" এ ভূষিত করা হয়েছে ডঃ ইউনূসকে।

ইতিপূর্বে তিনি কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। দল ভিত্তিক ঋণদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি লিডারশীপের জন্য ১৯৯৪-এ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, দরিদ্রদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা চালুর জন্য ১৯৮৯ এ আগা খান পুরস্কার এবং দরিদ্র নরনারীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯৯৩ এ মার্কিন এনজিও 'ফেয়ার' এর 'হিউম্যানিটেরিয়ান' পুরস্কার পেয়েছেন।

ডঃ ইউনূস যা বলেনঃ

"ঋণ মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার এবং এই মৌলিক মানবাধিকার সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব" (গ্রামীণ ব্যাংকঃ প্রথম দশক ১৯৭৬ -১৯৮৬, প্রফেসর মোঃ ইউনূস পৃষ্ঠাঃ ১০/১১)। ভূমিহীনদের ভূমি ও উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ নয় তাদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা। ডঃ ইউনূস বুঝেছেন "কর্মসংস্থান মাত্রই দারিদ্রের অবসান নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করে দেবার ব্যবস্থা মাত্র। "কাজেই

www.pathagar.com

বিত্তহীনদের ভূমিদান নয়, নয় কোন কর্মসংস্থান, তাদের দাও স্বল্প মাত্রার ঋণ। তাহলে বৃহদায়তনের মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের বিপুল বিনিয়োগের ঝুঁকি না নিয়ে "অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিনিয়োগের মাধ্যমে" দূর করা যেতে পারে দারিদ্র্য। তাই তিনি সুপারিশ করেছেন, যেহেতু "বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের নামান্তর"; সেহেতু আমাদের বড় বড় উদ্যোগ না গ্রহণ করে "একই পরিমাণ অর্থ অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেওয়া" উচিৎ। আর এই পথেই তিনি প্রতিটি শ্রমজীবীকে পুঁজির বাজারে প্রবেশাধিকার দিয়ে বিরাট আকারের কারখানার শ্রমিক নয়, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প-শ্রমিক, বর্গা কৃষক ও কৃষি মজুরদের নিয়ে কাংখিত বিশ্ব গড়ে তুলতে চান।

বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার গ্রহণকালে ১৩ অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডঃ ইউনূস বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের জন্য একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিশ্ব থেকে অভাব, ক্ষুধা দূর করা সম্ভব। ঋণ ফেরতের চমৎকার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে আমরা যদি সবার জন্য (ভূমিহীনদের) ঋণের ব্যবস্থা করতে পারি, তবে দারিদ্র্য যে আর বেশী দিন থাকবে না তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।" ডঃ ইউনূস লক্ষ্য করেছেন "সমাজের নিপীড়নের যত কৌশল আছে তার সব ক'টি গরীব মহিলাদের উপর নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়। এতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের আশংকা থাকে না" (গ্রামীণ ব্যাংকঃ প্রথম দশক, ১৯৭৬-১৯৮৬; পৃঃ ১২-১৩)। স্বাভাবিকভাবেই ডঃ ইউনূস সবার জন্য ঋণ পাইয়ে দেবার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টায় মহিলাদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত ও নিরাপদ মনে করেছেন। বর্তমানে যে প্রায় ১৯ লাখ সদস্য গ্রামীণ ব্যাংকের আছে তার ৯৪% মহিলা।

বিশ্বের মানুষের উপর মোড়লি ও লুণ্ঠন করে যে সব দেশ, তাদের সামনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য এখন চ্যালেঞ্জ। ক্ষুধায় কাতর মানুষের কষ্ট লাঘবের কর্তব্যে নয়, তাদের আজ অতিকায় লুটেরা কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ। এই তাগিদে বিশ্ব থেকে দারিদ্র বিমোচনের মত ভাওতাবাজী শ্লোগান বিশ্বকে ভরিয়ে তুলছে। এই শখের দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও তাদের হাতিয়ার। আর সব এনজিও'র সেবা ও আদর্শ হল গ্রামীণ ব্যাংক। এই ব্যাংকটির পদ্ধতি অতি চমৎকার। যা গ্রামের ভূমিহীন বিশেষ করে মহিলাদের সংঘবদ্ধ করে ঋণের জালে এনে ফেলতে পারছে। আর তাই বিশ্বের গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে এত মাতামাতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খোলা হচ্ছে এর শাখা। ডঃ ইউনূস এখন পুঁজিবাদী সংকট মোচনের ভরসা স্থল।

গ্রামীণ ব্যাংক পরিচিতিঃ

১৯৭৬ সালের জুন মাসে এই ব্যাংক একটি প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৮৯ সালে প্রকল্পটির সাফল্য দেখে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এই

www.pathagar.com

প্রকল্পকে নিজস্ব প্রকল্প হিসবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল, "ইফাদ" ঋণ দিতে শুরু করে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে সরকারের এক অধ্যাদেশ বলে একটি বিশেষ ব্যাংক হিসাবে কাজ শুরু করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. গরীব মহিলা ও পুরুষদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান; খ. গ্রামীণ মহাজনের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা; গ. বিশাল বেকার জনশক্তির স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ঘ. সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যাতে তারা বুঝতে এবং পরিচালনা করতে পারে ইত্যাদি।

মূলধনঃ গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৩০-০৩-৯৪-এ ২৫ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১৫ কোটি টাকা।

মালিকানাঃ গ্রামীণ ব্যাংকের ৮৮% ভাগের মালিক ব্যাংকের সদস্যগণ, ১২% ভাগের মালিক সরকার।

ব্যবস্থাপনাঃ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলী সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী। ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো ২জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতিঃ ৩০-০৩-৯৪ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে শাখা সংখ্যা ১০৪১টি। এই সময় পর্যন্ত ১৮,৮১,১৬৫ জন ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৯৬৩.৯৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ গ্রহণকারীদের ৯৪% ভাগ মহিলা। এ পর্যন্ত ৩৩,৯৮০ টি গ্রামে ব্যাংকের কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং '৯৪ -এর মার্চ পর্যন্ত পরিশোধকৃত ঋণের পরিমাণ ২২৫৮.৫০ কোটি টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৭০৫.৪৮ কোটি টাকা। এই সময় পর্যন্ত গ্রুপ ফান্ডে সঞ্চয় ২৩৪.২৬ কোটি টাকা এবং আপদকালীন তহবিলে সঞ্চয় ২১.৭৩ কোটি টাকা। (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী; ১৯৯৩/৯৪)

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যাংক হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য প্রশ্নাতীত। বিশেষ করে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সাফল্য ব্যাংকিং জগতের ইতিহাসে নজীরবিহীন। বিতরণকৃত ঋণের আদায় সাফল্য ৯৯.২৮ ভাগ। আরো তাৎপর্যপূর্ণ হল দেশের দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ৮০% মানুষ যাদের ৯০% মহিলা, তাদের ব্যাংক ঋণের আওতায় এনে ফেলার সাফল্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্বল্প ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান কি সৃষ্টি করা গেছে? দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের যে কার্যক্রম তা কি কোন সুফল বয়ে এনেছে?

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা কি বলে?

রামচন্দ্রপুর, ঝিনাইদহ থানার হলিধানী ইউনিয়নের অধীন একটি গ্রাম। গ্রামীণ ব্যাংকের হলিধানী শাখার আওতায় এই রামচন্দ্রপুরে ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সমিতিভূক্ত ৩৫ জন মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম সমিতিভূক্ত হবার পর আপনাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কি ভাল হয়েছে? ৩৪ জন জবাব দিয়েছেন- না বরং অবস্থা আরো খারাপ। একজন মহিলা বলেছিলেন, ভালো। কিন্তু তাঁর গ্রুপ চেয়ারম্যান জানালেন অভাবের কথা বলতে লজ্জা লাগায় সে মিথ্যা বলেছে। কেননা গত কিস্তির টাকা নিরুপায় হয়ে হাড়ি বিক্রি করে পরিশোধ করেছে। ঋণগ্রহীতা মহিলাদের পরিবারে প্রায় অধিকাংশের জন মজুরী-ই আয়ের উৎস। স্বল্প সংখ্যক ক্ষুদে ব্যবসায়ে জড়িত। এদের অনেকের কোন জমি নেই, বা কয়েক শতক জমি আছে।

পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৪.৫০ জন। পাঁচ জন সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ। ৮টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে গ্রুপভূক্ত করার সময় ৭.০০ টাকা এবং প্রতি সপ্তাহে প্রথম বৎসর এক টাকা করে সঞ্চয় গ্রুপ ফাণ্ডে জমা দিতে হয়। ২য় বৎসর হতে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা নেওয়া হয় ৩.০০টাকা করে। ঋণ প্রদানের সময় জামানত নেওয়া হয়না ঠিকই কিন্তু প্রত্যেক সদস্যদের জন্য প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগতভাবে ঋণের জন্য দায়ী থাকে। যদি কোন সদস্য কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে ঋণ গ্রহীতার সম্পদাদি বিক্রি করে অথবা নিজেরা দিয়ে দায়মুক্ত হতে হয়। এখানে জানা গেল অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতাই ১০ হতে ১৫ সপ্তাহ যেতে না যেতেই ঋণের সমুদয় টাকা খরচ করে ফেলে। তখন জন মজুরী করে বা হাড়ি-পাতিল, হাঁস-মুরগী বিক্রি করে কিস্তি চালায়। কিস্তির দিন ঋণগ্রহীতা নিকট মহাদুর্যোগের দিন হিসাবে হাজির হয়। এই দিনে তারা আর পরিবারের কেউ থাকে না, হয়ে পড়ে ব্যাংকের সম্পত্তি।

খোদেজা ঋণ নিয়ে একটি গাভী কিনেছিল। কিস্তি দিতে না পারায় বাধ্য হয়ে গাভী বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করেছিল। গত ৬ ডিসেম্বর '৯৪ মুরগী বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করেছে। কিস্তি দিতে না পারায় রমেছা বেগমের নতুন কাঁথা (যা তখনও সেলাই সম্পন্ন হয়নি) গ্রুপ চেয়ারম্যান বিক্রি করে কিস্তি আদায় করেছে।রূপসী ঋণের টাকা দিয়ে টিন কিনে ঘর বানিয়েছিল। সে সেই চালের টিন বিক্রি করে কিস্তি চালিয়ে এসেছে। ১৩ই ডিসেম্বর'৯৪ সে কিস্তির টাকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকের লোক ও গ্রুপ সদস্য তার ঘরে তল্লাসী করে বিক্রি করার মত এক ভাড় ধান পায়। সেই ধান বিক্রি করে কিস্তির অর্থ আদায় করেছে। সুফিয়া খাতুন নলকূপ বসিয়েছিল ঋণ নিয়ে। কিস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নলকূপের হেড বন্ধক রেখে কিস্তির অর্থ আদায় করা হয়। ঘটনাটা ১৯৯৪ -এর নভেম্বর মাসের। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধ পানির জন্য সে নলকুপ

www.pathagar.com

বসিয়েছিল। সমিতির সদস্য লালভানু, কিস্তির দিন তার জামাই এসেছিল, জামাইকে অভূক্ত রেখে চাউল বিক্রি করে কিস্তি মিটিয়েছিল।

মৌসুমী ঋণ, ঘর ঋণ, গরু মোটা-তাজাকরণ ঋণ, নলকুপ ঋণ ইত্যাদি প্রকল্পের নামে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ ইস্যু করে। বাস্তবে ৩৫ জনের অনেকেরই সিংহভাগ ঋণ সাংসারিক ব্যয়ভার মেটাতে খরচ হয়ে গেছে। পূর্বে উল্লেখ করেছি ১৪/১৫ সপ্তাহ না যেতেই মূলধন ফুরিয়ে যায়। তখন কোনো মহাজনের কাছ থেকে অথবা গ্রামীণ ব্যাংকের অন্য প্রকল্পের নামে ঋণ নিয়ে কিস্তি চালাতে থাকে। অর্থাৎ ঋণ-কিস্তি, নূতন ঋণ, পুরাতন+নূতন কিস্তি পরিশোধ, আবার ঋণ এইভাবে চক্রাকারে ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। যেমন ফেরদৌস আরা, ১৯৯০ এ সমিতির সদস্য হয়। তখন অভাবের হাত থেকে বাঁচার আকাংখায় ঋণ নিয়েছিল ২০০০/-টাকা। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে তার দায় ৯০০০/-টাকা। রহিমা বেগম ১৯৯০-এ ৩০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে, এখন তার কয়েকটি খাতে সর্বমোট ঋণ ৩৩,০০০/-টাকা। ৮০০০/- টাকা দিয়ে কিনেছিল গাভী। সেটি বাচ্চা দিতে গিয়ে মারা গেছে। কলাচাষ করেছিল লোকসান গিয়েছে। লোকসান বা খোয়া যাওয়ার দায়িত্ব ব্যাংকের নয়। আর কোন টাকা তার হাতে নেই। কিন্তু ঠিকই সাপ্তাহিক সঞ্চয়সহ ৬৬৩/টাকার কিস্তি তাকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে। মনোয়ারা বেগম ব্র্যাক থেকে ঋণ নেয়, ব্র্যাকের ঋণের কিস্তি চালানোর জন্য সে গ্রামীণ ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হয়। গ্রহণ করে ৫০০০/-টাকা ঋণ। ১৮টি কিস্তি পার হয়েছিল ডিসেম্বরে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু এ ঋণ আয় বাড়াতে পারেনি এক কণাও। বিপরীতে, ঋণের দুষ্ট চক্রে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ফেলেছে তাদের। দিন মজুরী, হাঁস-মুরগী ও ডিম বিক্রি করে যারা কায়ক্লেশে দিনযাপন করত, তারা নূতন জীবনের হাতছানিতে বিপাকে পড়েছে। দিন মজুরীর আয়ে এখন আর চাল, ডাল বা তেল কেনা নয়, ঋণের কিস্তি মেটাও। এ ঋণের বিপরীতে স্থায়ী কোন সম্পদ বাড়েনি তিল বিন্দু কিন্তু ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

কেন্দ্র রামচন্দ্রপুর

ক্রমিক নং	ঋণীর নাম	সমিতির বয়স	১ম ঋণ	বর্তমান ঋণ
১	ফিরোজা বেগম	৪	২০০০/-	৩৩০০০/-
২	শুকিয়া খাতুন	৩	২০০০/-	১১০০০/-
৩	আনোয়ারা	৩	২০০০/-	১০০০০/-
৪	নেছতারন নেছা	২	৩০০০/-	৭০০০/-
৫	রহিমা খাতুন	৪	৩০০০/-	২০০০০/-
৬	রাবেয়া খাতুন	৩	৩০০০/-	৯৫০০/-
৭	লালভানু	৩	৩০০০/-	৮০০০/-
৮	তহুরা বেগম	৩	৩০০০/-	১৩০০০/-
৯	শাহিদা বেগম	৩	২০০০/-	১১০০০/-
১০	রহিমা বেগম	৩	৩০০০/-	৪৩০০০/-

www.pathagar.com

রামচন্দ্রপুরের অভিজ্ঞতা বলে, চার বছরে স্বল্প ঋণ, স্বল্প আয়- এভাবে দরিদ্র মানুষ স্বনির্ভর হতে পারেনি।পারেনি তাদের আয় বাড়াতে। বিপরীতে, ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। রহিমা বেগমের স্বামী মসজিদে ইমামতি করেন। তার মন্তব্য, একবার ব্যাংকের ঋণে জড়ালে এর থেকে বেরুনো কষ্ট। রোকেয়া খাতুনের সাফ কথা, তার নেওয়া ১১০০০/- টাকা পরিশোধ করার কোন উপায় নেই। মোট কথা, ৩৫ জনের প্রায় সকলেরই ঋণ গলায় ফাঁসে পরিণত হযেছে। এ চক্র থেকে পালাবার পথ কি? এটা ঋণ গ্রহীতাদের জিজ্ঞাসা।

মিঃ জিমি কার্টার, ম্যাকনামারা বা জন রুয়ান সাহেবের নিকট আমাদের প্রশ্ন গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের পুষ্টিমান, ওজন এবং উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে এই তথ্য আপনারা কোথায় পেয়েছেন? ডঃ ইউনুস গরীব মানুষের খাবারের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন এ তথ্যই বা আপনারা কিভাবে সংগ্রহ করলেন? আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাদের ও ডঃ ইউনূস সাহেবের নিকট এই চ্যালেঞ্জ রইল, ৫৮,৩৮৪টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র একটি কেন্দ্রের সদস্যদের স্বনির্ভর করেছেন প্রমাণ করুন। বাংলাদেশে এমন একটি কেন্দ্রও কি আছে যে কেন্দ্রের সদস্যরা স্বনির্ভর হয়ে ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে? শাখা ও কেন্দ্রের সংখ্যা এবং ঋণ বিতরণের অবিশ্বাস্য বৃদ্ধি দিয়ে মানুষের সীমাহীন অভাবের প্রমাণ মেলে। কোনভাবেই স্বনির্ভর হচ্ছে বলে ভুল করার কারণ নেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের ৮৮% ভাগের মালিক তার সদস্য/সদস্যাগণ। স্বাভাবিকভাবে লাভ লোকসানের অংশীদার তারাই। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সদস্যই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়নি। ব্যাংক কমকর্তাদের দাবী-লাভ হচ্ছে না বিধায় সদস্যগণ লাভের অংশও পাচ্ছে না। ৩০ জুন, ১৯৯৩ সালে লাভ দেখানো হয়েছে মাত্র ৮৯ লাখ টাকা। এসময় ঋণ বিতরণ করা হয় ৮০১৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। ৩৪% হারে সুদ আদায় করলে লাভ দাঁড়ায় ৩০৪.৭৫ কোটি টাকা। এর সাথে যোগ হবে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের অলিখিত ২ টাকা। বছর শেষে যার অংক দাঁড়াবে ১৫ কোটি টাকা। ৩১৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা আয় হবে এ দুটি খাত হতে। গ্রামীণ ব্যাংকের দেয়া তথ্যে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৭৮.৩৩ কোটি টাকা। তাহলে ৩১৯.৭৫ কোটি টাকায় নীট লাভ ১৪১.৪২ কোটি টাকা। ৮৮% ভাগের পরিমাণ ১২৪.৪৪ কোটি টাকা। সদস্য পিছু আয় ৬৯১.৩৯ টাকা হবার কথা। কিন্তু ব্যাংক নীট আয় (১৭৯.২২-১৭৮.৩৩) ৮৯ লাখ টাকা মাত্র দেখাচ্ছে। তবুও বছর শেষে সদস্যদের গ্রুপ ফাণ্ডে যত সামান্যই হোক লাভ বা লোকসান লিপিবদ্ধ হতেই হবে। এ তথ্য প্রমাণ করে সদস্যরা মালিক- এ ঘোষণা একটা ডাহা মিথ্যা। এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাবে যথেষ্ট কারচুপি রয়েছে। কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ আয় ও ব্যয় হচ্ছে তা পৃথক করে দেখানো হয়নি। কারচুপির অসৎ উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানার ৮৮% ভাগ ব্যাংকের সদস্যদের-এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করা কি সম্ভব? রামচন্দ্রপুরের চার বছরের সমিতি জীবনে ব্যাংকের লভ্যাংশ পেয়েছে এ কথা একজনও বলেনি। বিপরীতে সাপ্তাহিক সঞ্চয় নিয়ে ঘাপলা থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক সদস্যকে ১ম বছর সাপ্তাহিক সঞ্চয় ১/- টাকা করে দিতে হয়। ২য় বছর থেকে ৩/-টাকা হারে এই সঞ্চয় দিতে হয়। অথচ গ্রুপ ফান্ডের সঞ্চয়ের হিসাবে মাত্র এক টাকা জমা করা হয়েছে, বাকী ২/- টাকার কোন হদিস নেই। ৫ জনের একটি গ্রুপের টাকা জমা রাখার পাশ বই থাকে একটি। হলিধানী শাখার একটি কেন্দ্র রামচন্দ্রপুর, গ্রুপ নং ঃ ৫৩। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান মোমেনা; হিসাব নংঃ গ/ ১৭৬ টাকা জমা রাখার পাশ বইয়ে প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক সঞ্চয় কলামে ৫/- টাকা করে জমা করা আছে। ঐ একই শাখার কেন্দ্র ৩৪/ম, গ্রুপ নং ঃ ০৭, গ্রুপ চেয়ারম্যান রেবেকা ঃ হিসাব নং ৩৮৩-এর জমা বইয়েও ৫/- টাকা করে জমা করা আছে। ৫ জনের নিকট হতে ১৫/- টাকা নিয়ে ৫/- টাকা কেন জমা করা হলো, আর ১০/- টাকা কোথায় তা জানার উপায় নেই। এই কেন্দ্রের ৪০ জনের প্রতি সপ্তাহের ৮০/-টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছে। এ হলো দারিদ্র বিমোচনে গরীবদের সঞ্চয়ী করে তোলার আসল রহস্য। বিষয়খালী (ঝিনাইদহ জেলা) শাখার মোট সদস্য ২১০০। এখানে প্রতি সপ্তাহে লোপাট হচ্ছে ৪২০০/- টাকা এবং প্রতি বছরে ২,১০,০০০/- টাকা। সারা দেশের ১৮,৮১,১৬৫ জনের মধ্যে এক বৎসরে উর্ধে সদস্য সংখ্যা যদি ১৫ লাখ ধরা হয়, তাহলে গরীবের কষ্টার্জিত অর্থ লোপাটের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি সপ্তাহে ৩০ লাখ টাকা।

"আমরা ২০% সুদ নেই। যদি এটাকে কেউ বেশী বলে তবে বেশী। তাতে আমি বিব্রতবোধ করি না। আমরাতো কাউকে জোর করে ঋণ দিই না" (ডঃ ইউনূস এর সাক্ষাতকার, খবরের কাগজ, ২৩ শে আগষ্ট '৯৩)। গ্রামীণ মহাজনের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা যে ব্যাংকের উদ্দেশ্য, সেই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বখাদ্য পুরস্কারে ভূষিত মনীষীর এই জবাব গ্রাম্য মহাজনদের কি লজ্জা দেবে না? কিন্তু ডঃ ইউনূস সাহেবের লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। কেননা, ঋণ পাইয়ে দেবার মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়নের "মহৎ" কাজ তিনি করছেন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় সুদের হার সত্যই কি ২০%?

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদান, সুদাসল ও গ্রুপ ট্যাক্স আদায়ের চক্রটি বেশ জটিল। ব্যাংক যখন ঋণ প্রদান করে তখন প্রতি হাজারে গ্রুপ ট্যাক্স কর্তন করা হয় ৫০/- টাকা। কিন্তু পাশ বইয়ে ১০০০/- টাকাই জমা দেখানো হয়। প্রতি হাজারে ২০/- টাকা সাপ্তাহিক কিস্তি ৫০ সপ্তাহে আদায় হয় ১০০০/-টাকা। টাকা পরিশোধের পর সুদ চার্জ আদায় করা হয় হাজারে ১০৫/-টাকা। সরাসরি সুদচার্জ ১০৫/- টাকা দেখানো হলেও গ্রুপ ট্যাক্সের অবয়বে কর্তনকৃত টাকাও সুদ হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে প্রতি হাজার টাকায় সুদ হয় ১৫৫/- টাকা। সুদের হার ২০% ভাগ বলে চালিয়ে দেবার জন্য

www.pathagar.com

গ্রুপ ট্যাক্স এই নাম ব্যবহার করা হয়। সেই সঙ্গে গ্রুপ ট্যাক্সের টাকা থেকে সদস্যদের বিনা সুদে ধার দেবার ব্যবস্থা মানুষকে ধোকা দেওয়ার পায়তারা মাত্র। কেননা গ্রুপ ট্যাক্স হিসেবে কর্তনকৃত টাকা গ্রুপ ফান্ডে জমা করা হলেও এই টাকা সদস্যগণ কখনো ফেরত পাবে না।

শুভংকরের ফাঁকিটা এখানেই। প্রতি সপ্তাহে স্বল্প পরিমাণ টাকা দেবার আপাতঃ সহজ ও নিরীহ গোছের এই কিস্তি পদ্ধতির মধ্যেই ব্যাংকটির ব্যাংকিং কারবারের সাফল্য নিহিত। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ চক্র ও গতি প্রকৃতি নির্ধাণ ও প্রকৃত সুদের হার কত তা নিরূপনের চেষ্টা করব। এজন্য প্রথম পুঁজি এক লাখ টাকা ধরে ৫০ কিস্তিতে কিভাবে এই টাকা আবির্তিত হয় এবং ফেঁপে ওঠে তা বুঝার চেষ্টা করবঃ-

পুঁজি সঞ্চালন পদ্ধতি

বিতরণ ও কিস্তি বিতরণ ১০০০০০/-		গ্রুপ ট্যাক্স ৫০০০/-	পুনঃ বিতরণ	পুনঃগ্রুপ ট্যাক্স কর্তন
১ম	২০০০.০০		৭০০০.০০	৩৫০.০০
২য়	২১৪০.০০		২৩৫০.০০	১১৭.৩০
৩য়	২১৮৭.০০		২২৫৭.৫০	১১২.৮৮
২৫তম	৩৪৫৭.১৭		৩৫৫৭.২৩	১৭৭.৮৬
২৬তম	৩৫২৬.৮১		৩৬৩২.০৬	১৮১.৬০
৪৬তম	৫২৩৭.৩৬		৫৫০৭.০৪	২৭৫.৩৫
৪৭তম	৫৪৫৯.৯৬		৫৬২২.৮৫	২৮১.৬০
৪৮তম	৫৫৭৪.৭৮		৫৭৪১.১০	২৮৭.০৬
৪৯তম	৫৬৯২.০২		৫৮৬১.৮০	২৯৩.০৯
৫০তম	৫৮১১.৭২		৫৯৮৫.১১	২৯৯.২৬
সর্বমোট	১,৮২,৩৯৯.৬৪	৫,০০০/-		টাকা ৯,৮৪৭.৪৫

উপরোক্ত ছকে দেখা যাচ্ছে, এক লাখ টাকা মূলধন বিতরণের সময়ই ৫% হারে গ্রুপ ট্যাক্স কর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই কর্তনকৃত ৫০০০/- টাকাও আদায়কৃত সাপ্তাহিক কিস্তির সাথে পুণঃ বিতরিত হচ্ছে। পুণঃবিতরিত ঋণ হতেও যথারীতি ৫% হারে গ্রুপ ট্যাক্স কর্তন করা হচ্ছে। ফলে এক লাখ টাকার মূলধন দ্রুত সঞ্চালনের বদৌলতে এক বৎসরে ১,৮২,৩৯৯.৬৪ টাকা হিসাবে বিনিয়োগ হচ্ছে। পাশ বইয়ে সুদ চার্জ আদায় দেখানো হয়েছে প্রতি হাজারে ১০৫ টাকা। সুতরাং ১,৮২,৩৯৯.৬৪/- টাকার সুদ হয় ১৯১৫১/-টাকা। অন্য দিকে গ্রুপ ট্যাক্সের নামে আদায়কৃত সুদ (গ্রুপ ট্যাক্স ৫০০০/- টাকা+পুনঃ গ্রুপ ট্যাক্স ৯৮৪৭.৪৫)= ১৪,৮৪৭.৪৫ টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক একলাখ টাকার মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ঋণ চক্রের জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে সুদ চার্জ আদায় করছে মোট (১৯,১৫১.০০+১৪,৮৪৭.৪৫)= ৩৩৯৯৮.৪৫ টাকা।

www.pathagar.com

তাহলে শতকরা সুদের হার আর ডঃ ইউনূসের দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের বাৎসরিক শতকরা হার হচ্ছে ৩৪.০০ টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করা হয়। এ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ৮৮% ভাগের মালিক (?) দরিদ্র সদস্যগণ বলে প্রচার করা হয়। সেই অলাভজনক ব্যাংক যার মালিক ঐ গরীবেরা সেই দরিদ্র সদস্যদের নিকট হতে ৩৪% টাকা হারে সুদ আদায় কি নিষ্ঠুর তামাশা নয়? গ্রামীণ ব্যাংক প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সুদচার্জ ছাড়াও আপদকালীন তহবিলে গড়ে ১০/- টাকা হারে আদায় করে। এই ব্যাংকের ১৮,৮১,১৬৫ জন সদস্যদের নিকট থেকে বৎসরে একবার আপদ আদায় করলে টাকার অংক দাঁড়ায় ১,৮৮,১১,৬৫০/-টাকা। সাপ্তাহিক ১/- টাকা হিসেবে আদায়কৃত ১৮,৮১,১৬৫/-টাকা বৎসরে হয় ৯,৪০,৫৮,২৫০/- টাকা। মোট কথা, সদস্যদের সঞ্চয়, সদস্য চাঁদা, আপদকালীন তহবিল ইত্যাদি উৎস হতে প্রাপ্ত টাকাই সদস্যদের নিকট ৩৪% হারে ঋণ বিতরণ করছে।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়াই গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি। কিন্তু ঋণ প্রদানের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে কিস্তি আদায় কি উপরোক্ত ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যে কোন ধরনের প্রকল্পই হোক, যতক্ষণ উৎপাদনে না যাচ্ছে, ততক্ষণ ঋণ ফেরৎ নেওয়া চলে না। আর নিলে সে প্রকল্প মার খেতে বাধ্য। যেমন ধরুন ধান রোপন প্রকল্প। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান পাকতে সময় নেয় ৯০ দিন। ঋণ নেবার পর জমি প্রস্তুত ও চারা রোপন করতে এক সপ্তাহ পার হয়ে যায়। ধান রোপনের ১৫/২০ দিন পর রাসায়নিক সার ও পরিচর্যা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রতিদিনই প্রায় জল সেচ আবশ্যক। এমতাবস্থায় ঋণ দিয়ে পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থার পরিণতি ভাল হতে পারে না। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প উৎপাদনে যাওয়া পর্যন্ত কখনই অপেক্ষা করবে না। কেননা, তাদের নিয়ম পরের সপ্তাহে কিস্তি। এই প্রক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ হল, কখনোই উৎপাদনে যেতে, স্বাবলম্বী হতে ও আয় বাড়াতে না দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের উপর নির্ভরশীল করে ফেলা। ঋণ নাও, খরচ কর, কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ভূয়া প্রকল্পের নামে আবার ঋণ নাও, পুরানো কিস্তি ও নতুন কিস্তি চালাও। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা হল এই ঋণের এক বিরতিহীন প্রবাহ।

ফিরোজা বেগম ২০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। সেই ২০০০/-টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে ভূয়া প্রকল্পের ঋণ নিয়েছিল। এভাবে চার বৎসর শেষে বিভিন্ন প্রকল্পে নেওয়া তার ঋণের অংক ঠেকেছে ৩৩০০০/- টাকা। ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারীরা শতকরা ৯৯.২৮ ভাগ ঋণ আদায় দেখাতে গিয়ে এবং ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে অধিকতর মুনাফা নিশ্চিত করতে জেনে শুনে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে, বিভিন্ন প্রকল্প দেখিয়ে ঋণ বিতরণ করে। দেখা গেছে, কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে নতুন ঋণ নিয়ে কিস্তি অব্যাহত রাখতে কর্মকর্তাগণ সদস্যদের উৎসাহিত করে।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে "বিশ্ব থেকে অভাব ক্ষুধা দূর করা সম্ভব"- ডঃ ইউনূস সাহেবের এই দম্ভোক্তি মিথ্যা। বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন মাত্র। এবং ইউনূসকে নিয়ে মাতামাতি করছে যাঁরা তাদের উদ্দেশ্যেও মহৎ নয়। অথবা সরেজমিন তদন্ত না করে ইউনূস সাহেবের বক্তব্য পড়ে কথা বলেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকে জনদরদী, দারিদ্র্য বিমোচনের সার্থক রূপকার ইত্যাদি অভিধাতে ভূষিত করা আর আত্মপ্রবঞ্চণা একই কথা। তাঁকে আসলে একজন সার্থক সুদখোর বলা চলে। যে লোক গ্রামের সর্বহারা জনগোষ্ঠি বিশেষ করে মহিলাদের মহাজনী পুঁজির নাগালে এনেছেন, নির্মমভাবে শোষণের ভদ্র একটি ছদ্মাবরণ ও জনদরদীর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পেরেছেন। এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক মহাজনদের সামনে পুঁজি লগ্নির বিশাল একটা বাজার উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের লগ্নি যে বিন্দু হতে সিন্ধুর মত মুনাফা অর্জনে সক্ষম, সে অভিজ্ঞতা আজ তাই রপ্তানীযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকঃ দরিদ্র কৃষক জনতার দারিদ্র কৃষক জনতার
দারিদ্র্য দূরীকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি

দৈনিক সংবাদের খবরঃ গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে গত ১৯ জুন টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার পানান গ্রামের গরীব কৃষক ছইনুদ্দিন ও তার স্ত্রী বিষপান করে। এতে স্বামীর মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। গ্রামীণ ব্যাংকের কিস্তি দেবার জন্য দেহ বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছে ঝিনাইদহ জেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের বানিয়াকান্দর গ্রামের জনৈকা গৃহবধূ। এ দু'টি ঘটনা গ্রামীণ ব্যাংকে তিরস্কার করার জন্য কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু এমনই অসংখ্য ঘটনা গ্রাম বাংলায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্মী আর গ্রুপ সদস্যদের খবরদারি সাধারণ সৌজন্যকে ছাড়িয়ে যায়। হাড়ি-পাতিল, লেপ-কাঁথা, এমন কি ঋণ গ্রহীতাদের জন্য ভয়ংকর বিপদ হিসাবে হাজির হয়। একজন কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে গ্রুপের আর কেউ ঋণ পাবে না- এ ভীতি প্রত্যেক গ্রুপ সদস্যাকে শংকিত করে তোলে। একজন নিঃস্ব মানুষের মনে ঋণ না পাবার আতংক সৃষ্টি করতে পারার সাফল্যই গ্রামীণ ব্যাংকের বড় জামানত। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে যে অমানুষিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়, ছইনুদ্দিনেরা বিষপান করে এ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জনৈকা গৃহবধূ প্রমাণ করে দিয়েছে জীবনের উপর কোন সত্য নেই, ন্যায় নেই, কোন ধর্ম নেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম জরিপ করতে গিয়ে সর্বত্রই আমি দেখেছি তীব্র অভাব। অভাবের তীব্র যন্ত্রণা থেকে পরিবারকে বাঁচাতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও মরিয়া। জঠরের জ্বালা নিবারণের জন্য মেয়েরাও কাজ চায়, কিছু একটা করতে চায়। গ্রামীণ ব্যাংক যখন ঋণের প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে গেছে তখন তারা সহসায় সাড়া দিয়েছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রুপভুক্ত হয়েছে। জমা করছে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের এক

www.pathagar.com

টাকা। এভাবে একদিন ঋণ নামক সোনার হরিণও ধরা দিয়েছে। হাজার ২০ টাকা হিসেবে প্রতি সপ্তাহে ২০/৪০ টাকা সঞ্চয় করে কিস্তি দেয়া এ কোন কঠিন কাজ হলো? ভেবেছে সকলেই। কিন্তু নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় এসব দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের হাজারও প্রয়োজন যখন গুমরে মরে তখন তাদের পক্ষে ২০/৪০ টাকা সঞ্চয় করা কি এতই সহজ? অনেকেরই তাই সঞ্চয় করা হয়ে ওঠে না। ফলে যতদিন ঋণের নগদ টাকা হাতে থাকে ততদিন এ টাকা দিয়েই কিস্তি চালাতে থাকে, আর যখন ফুরিয়ে যায় তখন টান পড়ে দৈনিক রোজগারে এ রোজগারে এখন আর চাল, তেল, নুন, ডাল, কেনা নয়, সর্বাগ্রে কিস্তি মেটাও। হাত পড়ে গৃহস্থালীর অতি দরকারী জিনিসপত্রের উপর। এরপরও যখন কিস্তি চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন ধর্ণা দেয় মহাজনের দ্বারে। নতুবা অন্য কোন সমিতিতে। অথবা গ্রামীণ ব্যাংকেরই অন্য খাতে নতুন ঋণ। এভাবে ঋণ নেওয়া-কিস্তি দেওয়ার এক ঋণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে গ্রামীণ ব্যাংকের বদৌলতে।

আমি যত গ্রামে গিয়েছি তার কোথাও গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের স্থায়ী সম্পদ বাড়তে দেখিনি। এমনটি দাবী করতেও শুনিনি। ঝিনাইদহ থানা সদরের রামচন্দ্রপুর গ্রামের গ্রামীণ ব্যাংকের একটি কেন্দ্রের উপর পরিচালিত এ জরিপের ফলাফল ইতিমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ জরিপে দেখা গেছে ৩/৪ বছর ধরে ব্যাংকের ঋণ ব্যবহার করেও কেউ লাভবান হতে পারেনি। ঋণ পাবার পূর্ব থেকে বর্তমানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। পূর্বেও অনটনের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। কিন্তু ঋণের ভার বহনে দুঃসহ যন্ত্রণা ছিল না। ব্যাংক কর্মী আর গ্রুপ সদস্যদের অসদাচারণের মত পরিস্থিতির সম্মুখীন তাদের হতে হত না। প্রতি সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধের মানষিক চাপ সহ্য করতে হত না। তারপরও যে কথা সত্য তা হলো, ঋণের অংকের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কিভাবে যে এ ঋণের বোঝা মেটাবে তারও কোন পথ তাদের জানা নেই। এ যেন সেই চোরাবালিতে পড়ার মত, যতই বাঁচতে চেষ্টা করা, ততই অন্তহীন বালির সমুদ্রে ডুবে যাওয়া।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস বলতে ভালবাসতেন গ্রামীণ ব্যাংক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এখন অবশ্য তিনি এটাকে ব্যবসা বলতে পছন্দ করেন। তবে এ ব্যবসা নাকি একজন মুনাফালোভীর মুনাফার জন্য ব্যবসার মত নয়। তাঁর এ ব্যবসায়ে রয়েছে দারিদ্র বিমোচন ও স্ব-কর্মসংস্থানে "সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি"। তিনি আরো বলছেন, "প্রশ্ন করতে পারেন এ ব্যবসার মালিক কে? এটার মালিক হল ঋণ গ্রহীতা। ২০ টাকা মুনাফা। কার জন্য করছি? এটা টিকিয়ে রাখার জন্য। আরো পরিবারকে এই ঋণের আওতায় আনার জন্য।"

ইউনূস সাহেব তার গ্রামীণ ব্যাংকে ব্যবসা বলে মেনে নিচ্ছেন। তবে এ ব্যবসা তিনি "এক অর্থলোভী ব্যক্তির অর্থ লোভ"- এর তাগিদ থেকে করছেন না। নিজের

www.pathagar.com

স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যে ২০% ভাগ সুদ নিচ্ছেন, সেটাও শুধুমাত্র আরো গরীবদের জন্য(?)

ডঃ ইউনূসের উপরোক্ত বক্তব্য বিচার করা যাক। বাংলাদেশ যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে তাদের সুদের হার বর্তমানে সর্বোচ্চ ১৪%। এ সব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুনাফার জন্যই ঋণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু দরিদ্র মানুষের হিতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে সুদের হার করেছেন সর্বোচ্চ ২০%। এ কেমন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি? গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার কি সত্যিই ২০%? পিএইচডিধারী অর্থনীতিবিদটি এখানে অংক নিয়ে খেলা করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের চড়া সুদের ব্যবসাকে পরহিতের ব্যবসা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত সুদের হার লুকানো কেন? এমন যার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সে কেন অশিক্ষিত, নিরীহ এবং গরীব মানুষের সঙ্গে এমনটি করবেন? গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকৃত সুদের হার ৩৪.০০%। গ্রামীণ ব্যাংক যখন এক লাখ টাকা ৫০ সপ্তাহে সঞ্চালন করে তখন কিস্তির সুবাদে ১,৮২,৩৯৯.৪৫ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ ১,০০,০০০ টাকা ১,৮২,৩৯৯.৪৫ টাকা হিসাবে বিনিয়োগ হয়। প্রতি এক হাজার টাকায় সুদচার্জ কাটা হয় ১০৫ টাকা। সুতরাং ১,৮২,৩৯৯ টাকায় ৫০ সপ্তাহে সুদ হয় ১৯,১৫১ টাকা। গ্রুপট্যাক্স ৫,০০০ এবং পুঃ গ্রুপট্যাক্স ৯,৮৪৭.৪৫ টাকা মোট ১৪,৮৪৭.৪৫ টাকা সুদ হিসাবে পরিগণিত হবে। কেননা, গ্রুপ ট্যাক্সের টাকা ঋণ গ্রহীতাদের ফেরৎ দেওয়া হয় না। সরাসরি সুদ ১৯,১৫১ টাকা ও গ্রুপ ট্যাক্সরূপী সুদ ১৪,৮৪৭.৪৫ টাকা মোট ৩৩,৯৯৮.৪৫ টাকা সুদ আসে এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করে। ফলে সুদের হার দাঁড়াচ্ছে ৩৩.৯৯৮% ভাগ, অর্থাৎ ৩৪%। সুদের এ হার টেনে আরো লম্বা করা সম্ভব। রোগ-শোক বলে সপ্তাহে ২.০০ টাকা, আপদ বলে প্রতি হাজারে ১০.০০ টাকা আদায় করা হয়। এটাকে আমি সুদ না বলে সরাসরি লুট বা আত্মসাৎ বলে ধরে নিচ্ছি। প্রকৃত সুদের হার কমিয়ে দেখানো কেন? ব্যাংকের মালিক তো সদস্যরা, তবে তারা কেন জানবে না প্রকৃত সুদের হার?

"গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারা নিজেদের ৩৪% চড়াসুদে নিংড়ে নিচ্ছে" বা "নিজেদের সঞ্চয়ের ২ এবং আপদের ১০ টাকা চুরি করছে"- এরকম খবর যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে তা কেমন শোনায়?

"গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক সদস্যরা"- এ দাবী ডাহা মিথ্যা! গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ বা লভ্যাংশের অংশীদার হবার কোন সুযোগ এখানে নেই। 'সরকারের সম্পত্তি মানে জনগণের সম্পত্তি'- এমনি ধরনের ভাওতা এই মালিকানার গল্পটি। ব্যাংক হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ শুরু করেছে ১৯৮৩ সালে অক্টোবর থেকে। ইতিমধ্যে ১২ বছর পার হয়ে গেল। রামচন্দ্রপুরের ফিরোজার ঋণ জমেছে ৩৩ হাজার টাকা। এই ৩৩ হাজার টাকার ৩৪% ভাগ হারে সুদ কষছে সমানেই। কিন্তু এই সুদ বা লাভ ফিরোজার সঞ্চয়

www.pathagar.com

খাতায় কি জমা হয়েছে? হয়নি। তাহলে কি ১২ বছরে গ্রামীণ ব্যাংক লাভের মুখ দেখেনি? ফিরোজা, তহুরা, লালভানুরা হিসাব মিলাবে কিভাবে?

আমার শেষ লক্ষ্য দরিদ্রমুক্ত বাংলাদেশঃ

গ্রামীণ ব্যাংকের ২০ লাখ পরিবারকে ৫ বছরের মধ্যে দারিদ্র সীমার উপরে আনবেন- ডঃ ইউনূস সাহেবের এ ধনুর্ভঙ্গপণ। তিনি আরো দাবী করেন, জনগণের নীচের অর্ধাংশের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু কিভাবে? ফিরোজা, তহুরা, লালভানুদের ৩/৪ বছরের সমিতি জীবনে যে ঋণের পাহাড় জমেছে, তা এ জন্মে শুধবার নয়। তবে তারা আর ৫ বছরের দারিদ্র্য ঘোচাবে কি করে? গ্রামীণ ব্যাংক রামচন্দ্রপুর, বিষয়খালিতে যা পারেনি, সারা বাংলাদেশে তা কি করে সম্ভব করে তুলবে? এ কি খালেদা সরকারের 'ডাল-ভাত তত্ত্বের' মত ব্যাপার নয়?

"পুঁজিবাদী অর্থনীতিক সমাজে ক্রমাগত শোষণের কারণে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা কোন না কোন মাত্রাই থাকবেই"- (মুহাম্মদ ইউনূসের পর্যবেক্ষণ ও অর্থনীতির তত্ত্ব- ডঃ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত; দৈনিক সংবাদ, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪০১।) স্বভাবতঃই দারিদ্র ও ক্ষুধা হতে মুক্তি পেতে হলে পুঁজিবাদী সামন্তবাদী রাষ্ট্রীয় শোষণের অবসান প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে এ সব শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তো হচ্ছেই না, বিপরীতে শতকরা ৩৪/- টাকা এই চড়া সুদে নিঃস্বদের ঋণ প্রদান করে তিনি দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চাইছেন। দারিদ্র বিমোচনের জন্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার আহবান না দিয়ে ঋণ পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। তাও কিনা নজীরবিহীন উচ্চহারে সুদযুক্ত ঋণ, যে ঋণ পুরো মৌসুম বা পুরো বৎসর ঋণ গ্রহীতার নিকট থাকছে না। ঋণ দেবার পরের সপ্তাহ থেকে ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথাতো বলেনই না, বিপরীতে তিনি " অর্থই ক্ষমতা" এই পুরানো পুঁজিবাদী নীতিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে শুধু নয়, বিশ্ব থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সংগ্রামে ডঃ ইউনূস এখন ব্রত হয়েছেন। এ বৈশ্বিক সংগামের তাঁর সহযোদ্ধা হল বিল ক্লিনটন, হিলারী ক্লিনটন। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) তার প্রধান অর্থদাতা ও পৃষ্ঠপোষক।

সাম্রাজ্যবাদী দাতাগোষ্ঠীর কর্মকর্তাগণ যা পরিকল্পনা করেন, আমাদের দেশের এনজিও মার্কা বুদ্ধিজীবী, ধান্ধাবাজরা তা স্বপ্ন দেখেন। দাতাগোষ্ঠীর ইচ্ছাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বা সাধনা বা স্বপ্ন বলে নিজেদের করে তুলতে চেষ্টা করেন মহীয়ান, গরীয়ান। বিশ্ব ব্যাংকের এককালের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা ডঃ ইউনূস সাহেবকে খুব পছন্দ করেন। কেননা, ম্যাকনামারাই প্রথম ব্যক্তি যিনি গ্রাম ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে "টার্গেট গ্রুপ" ধরে এনজিওদের সন্নিবেশিত করতে দাতোগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেন। "দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের" নামে বিভ্রান্তিকর সেবাকর্মে অঢেল অর্থ প্রদান

www.pathagar.com

করতে থাকেন। বাংলাদেশের এনজিও'র দেদার বিস্তার দাতাগোষ্ঠীর উৎসাহের কারণেই ঘটেছে। দরিদ্রদের টার্গেট ধরে তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন এবং দরিদ্রদের বিভ্রান্তির মধ্যে রাখা- দুটি কাজই সম্পাদন হচ্ছে। এমন একটি কাজের জন্যই ডঃ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক দাতাগোষ্ঠী ও তাদের প্রভুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। আরো কিছু কাজ ডঃ ইউনুস বহুজাতিক কোম্পানীর জন্য করতে পারেন। আর তা হল তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, বাংলাদেশের মত গরীব দেশের শিল্পায়নের বিরুদ্ধে মতামত সৃষ্টি। এসব দেশে শিল্পায়ন ও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার- এ দুটি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ বিরুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীরা মহামন্দার শিকার হয়েছে, যে জন্য ইতিমধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে হচ্ছে। গরীব দেশগুলির শিল্পায়নকে রুখে দিতে ও ধ্বংস করতে, কৃষি ব্যবস্থাকে অচল করে দিতে তৈরী হয়েছে গ্যাট চুক্তি। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন এ সব দেশকে গ্রামীণ যুগে ফিরিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি এসব দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির আধুনিকায়নের পক্ষে জনমতও প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রবল হয়ে উঠা জনমতকে পাল্টে দিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা বেশ কাজের হতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখাশুনার দায়িত্ব বিশ্ব ব্যাংকের উপর। বাংলাদেশে নতুন, ভারী বা মাঝারী শিল্প গড়ে উঠেনি। যে শিল্প আছে সেগুলিও ধ্বংস করার জন্য সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। বিরাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমিক ছাটাই, রেল ভাড়া বৃদ্ধি, টাকার মূল্যমান কমানো ইত্যাদি শর্তকে অর্থ সাহায্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। কৃষিকে ধ্বংস করার জন্য সার থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার, কৃষি সরঞ্জামের ব্যবসা মুনাফাবাজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের নীতি হল, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন ও নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে নীচু মাত্রায় ধরে রাখা। পুঁজি ও পণ্য সরবরাহের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা।

ডঃ ইউনূস শিল্পায়নকে অপচয় মনে করেন। বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলে দেশে উৎপাদন বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে তিনি সমর্থন করেন না। তিনি কারখানায় বিনিয়োগ না করে ঐ একই পরিমাণ অর্থ অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে তুলে দেবার পক্ষপাতি। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে গরীব মানুষেরা টুকটাক কাজ করে অর্থনীতিতে জোয়ার বইয়ে দেবে। তিনি বলেছেন, এভাবে সমাজের নীচু স্তরের সব মানুষের ঋণ দিয়ে ক্ষমতা বাড়ানো যায় তাহলে অভাবিত ব্যাপার হবে। "১২ কোটি টুথ ব্রাশ লাগবে বাংলাদেশে। টুথ ব্রাশ ইণ্ডাষ্ট্রি কি রকম চলত আপনি হিসাব করেন?" কাজেই ক্রয় ক্ষমতা বাড়াবার জন্য গরীবের কাছে ঋণের মাধ্যমে নগদ টাকা পৌছে দাও। বহুজাতিক কোম্পানীর পণ্যের অভাবিত এক বাজার প্রস্তুত করে তোল- এ হলো ডঃ ইউনূসের মহান ব্রত।

বিশ্বব্যাংক, ইফাদ, বিশ্বখাদ্য পুরস্কার, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, হিলারী ক্লিনটন এসব প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি গ্রামীণ ব্যাংকের দারিদ্র ঘোচানোর বৈপ্লবিক কর্মের সাথী। অস্ত্র, পণ্য, পুঁজির ব্যবসা চালাতে পৃথিবীর উপর খবরদারি বজায় রাখতে যে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব জনগণের উপর নিষ্ঠুরতম বর্বরতা চালায়; খাদ্যবস্ত্র ব্যবহার করে লাখ লাখ

www.pathagar.com

মানুষকে না খাইয়ে মারে; শিশুদের তিলে তিলে হত্যা করে; খুন করে লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ; সেই সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পীবাহকেরা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ বাঁচানো সংগ্রামে ডঃ ইউনূস সাহেবের সাথী(?)। সত্য মিথ্যা বিচারের ভার এ দেশের, বিশ্বের জনগণের। আমাদের দেশের এক কোটিরও বেশী পরিবারে মাসিক আয় মাত্র ৩০০ টাকা। অর্থাৎ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ প্রতিদিন ১০ টাকা আয় করে এবং ঐ ১০ টাকার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আসলে কি বাঁচা যায়? কত দিন বাঁচা যায়? বাংলাদেশে চলছে এক নীরব দুর্ভিক্ষ। পুষ্টিহীনতা, বিনা চিকিৎসায় খুন হচ্ছে মানুষ। জনসংখ্যার সিংহভাগ মানুষ নিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ, এ দেশীয় দালালেরা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। আমাদের অভাব, ক্ষুধা, বেকারত্ব, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের শ্লোগান দিয়ে তারা এগুচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী মুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ঋণের অধিকার, ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর কর্মসূচীর মূলে ঝুলিয়ে দিয়েছে এনজিওদের নাকে। সরকারকেও গরীবের জন্য নিবেদিত হতে, এনজিওদের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। এ সবই হচ্ছে গরীবদের গরীব করে রাখার জন্য, নতুন জীবনের হাতছানিতে যেন ভুলে না যায় তার জন্য। তারা চায় জনগণ গৃহপালিতের মত একান্ত বাধ্য থেকে পুঁজির জয়গানে ভূবন ভরিয়ে তুলুক।

এটা চায় সাম্রাজ্যবাদীরা, দেশীয় লুটেরারা। কিন্তু প্রগতিপন্থীরা কি চায়? দরিদ্র জনতার জন্য কি কর্মসূচী তারা দিতে পারে? কি হতে পারে দরিদ্র জনতার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা?

প্রগতিপন্থীদের কর্তব্যঃ

দেশের সিংহভাগ মানুষ রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতি আস্থাহীন, উদাসীন, বিরক্ত। দেশে বিরাজ করছে চরম এক রাজনৈতিক শূন্যতা। গণতন্ত্র চর্চার নামে ডানপন্থীরাও নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে।

এমতপরিস্থিতিতে, প্রগতিপন্থীদের এগুতে হবে দৃষ্টান্তের জোরে। প্রকৃত পরিস্থিতিকে অনুধাবন ও যুগোপযোগী কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে।জনগণের আস্থা অর্জন করাই হলো এই মূহুর্তের অন্যতম দায়িত্ব। প্রগতিপন্থীদের কর্মসূচীর প্রতি জনগণের আস্থা যতদিন সৃষ্টি না হবে, ততদিন ঐ কর্মসূচী কোন মুল্যই বহন করবে না। এ কথা মনে রেখে অনুসৃত কর্মসূচী বিন্যস্ত করতে হবে। জনগণের চেতনার স্তর, তাদের বাস্তব ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও অর্জনের সম্ভাবনার মাত্রার উপর সাম্রাজ্যবাদীদের সব চক্রান্তকে, তাদের নেটওয়ার্ককে ভণ্ডুল করে দেবার মত বাস্তব সম্মত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাফল্যের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের সম্ভাব্যতা অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রগতিপন্থীদের মনে রাখতে হবে বর্তমান রাজনীতিতে লুটেরা শ্রেণীর প্রভাব বিদ্যমান। শ্রমিক অংগনও লুটেরাদের নিয়ন্ত্রণে। কৃষক জনগোষ্ঠির কোন নেতা নেই। তবে এই মূহুর্তে এনজিও নেটওয়ার্কের কবলে। এছাড়া রাতারাতি ধনী হবার লুটেরা মনোবৃত্তি ভাইরাসের মত সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। সীমাহীন অভাব,

www.pathagar.com

বেকারত্ব এই লুটেরা মনোবৃত্তি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শক্তি-সুযোগ-ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ২/১ জন রাতারাতি বদলে নিচ্ছে নিজেকে; পুটি হতে কোটিপতিতে। এসব কলংকিত রীরপুঙ্গবেরা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এ সব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে অনেকেই পরিণত হচ্ছে ২/১ জনের ভাগ্য গড়ার কারিগর, ভাড়াটে মাস্তান। অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা, শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা।'অর্থই ক্ষমতা' এ দুর্জন বাক্য এখন সর্বজনগ্রাহ্য অনুসৃত সত্যে পর্যবসিত হতে চলেছে। আরো মনে রাখতে হবে, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া বিপ্লবের কর্তব্যই কেবল ত্যাগ করেনি, তারা শিল্পোৎপাদনের কর্তব্যকেও বর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের কারণেই একদিন যেমন তারা মুৎসুদ্দী হিসাবে কাজ করেছে; এখন তারা আর মুৎসুদ্দী নয় হতে চায় কমিশনভোগী। শিল্পোৎপাদনকে তারা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে ছেড়ে দিতে চায়। বিদেশী পুঁজি ও পণ্যের আয়ের কমিশনভোগী মুৎসুদ্দী হতে চায়। বিশ্বপুঁজিবাদ ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অর্থনীতিকে ইংরেজ যুগের প্রথমের অর্থনীতিতে ফেরৎ পাঠাতে চায়। প্রভুদের ইচ্ছার পদতলে নিজেকে সঁপে দিয়ে এই মুৎসুদ্দীরা দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফলে শ্রমিক রাজনীতির চরিত্রই যাচ্ছে পাল্টে। শিল্পে যে মন্দাভাব চলছে তা শ্রমিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতা ও ছাটাইয়ের সম্ভাবনা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে। এ পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ ব্যবহার করছে সুবিধাবাদীরা। শুধু তাই নয়, বহুযুগ ধরে হরতাল-ধর্মঘট ছিল মেহনতি মানুষের দাবী আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটিও কমিশনভোগী ব্যবসায়ী মুৎসুদ্দীরা যথেচ্ছা ব্যবহার করে চলেছে। ফলে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে হরতাল ধর্মঘটের হাতিয়ারটি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের ৮৩% ভাগ মানুষ ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষী। ৬.৪% ভাগ নিঃস্ব মৎস্যজীবী ও কারিগর। মাঝারী কৃষকের অনুপাত খুবই সামান্য। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি এখন বিলুপ্তির পথে। দেশের সকল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মাত্র ৫% ভাগ ভাগ্যবানের হাতে। মোট কথা, দেশের মোট জনসংখার সিংহভাগের হাতে উৎপাদনের উপকরণ নেই বললেই চলে। এই সিংহভাগ মানুষের অস্তিত্ব সমাজ বদলের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। এই মহূর্তে বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন সংগ্রামের সঙ্গেও যুক্ত। বহুজাতিক কোম্পানীর আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এ জন্যে প্রগতিপন্থীদের আর রাজনৈতিক অঙ্গনেই কেবল নিজেদের গুটিয়ে রাখা উচিৎ হবে না। নেতৃত্ব দিতে হবে অভূক্ত, কর্মহীন, সম্বলহীন মানুষকে উৎপাদনমূখী সংগ্রামে। তাদের কর্তব্য হবে, শ্রমিক-কৃষক-কারিগর- মৎস্যজীবি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-কর্মজীবী-পেশাজীবী মানুষকে নিয়ে সমবায় ভিত্তিক সংস্থা গড়ে তোলা; সমবায় সমিতি গড়ে তুলে তাদের সীমিত সম্পদ ও শ্রমশক্তিকে সমষ্টিগতভাবে ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া; এ সকল সমবায় স্থানীয়ভাবে খাস জমি, বদ্ধ ও মুক্ত জলাশয়ের দখল নেওয়া ও মৎস্য চাষ-কৃষি ফার্ম গড়ে তোলা; জোতদারদের জমির উপর দখল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্গা প্রথার তে-ভাগা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। কৃষি দ্রব্যের নায্যমূল্য

www.pathagar.com

আদায় করার জন্য বাজার বয়কটের লক্ষ্যে শস্য ব্যাংক গড়ে তোলা; বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা সমবায় ভিত্তিতে চালু অথবা ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি করা। দেশের বিপুল নারী জনশক্তিকে এ সব সমবায় উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা। কুটির শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী সমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

এনজিও কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে, বেকার ও দরিদ্র জনশক্তিকে এনজিও-খপ্পর হতে মুক্ত করার অন্যতম উপায় হবে এ সমবায় প্রচেষ্টা। নিঃস্ব, অভুক্ত মানুষের দু'বেলা খাবারের সংস্থান সৃষ্টি না করে বা উপার্জনের পথ না করে দিয়ে শধুমাত্র এনজিও বিরোধীতা শুন্যগর্ভ বুলির সামিল। লুটেরা রাজনীতিকদের ভোট ও লুটপাটের অস্ত্র হিসাবে জনগণকে ব্যবহারে সমবায় হবে বড় অন্তরায়। কর্মহীন, হতাশাগ্রস্ত, বুভুক্ষু মানুষের সামনে উদ্যোগের এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। খুঁজে পাবে জীবিকার্জনের একটি উপায়ও। এ সমবায় প্রচেষ্টার সাফল্য মানুষের মধ্যে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। গ্রামীণ সমাজে যে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হযেছে এ সমিতি তা পূরণ করবে। মুক্ত করতে পারবে গ্রাম্য টাউটের খপ্পর থেকে। শিল্পাঙ্গণ থেকে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব উচ্ছেদে এ সমবায় হবে কার্যকর শক্তি।

লুটপাট নয়, উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকার্জন; জনবিচ্ছিন্ন, বাস্তববর্জিত রাজনীতি নয়; গড়ে উঠবে জনগণের সমর্থনপুষ্ট শ্রমজীবী নেতৃত্ব। এ নেতৃত্ব উঠে আসবে উৎপাদন ও শ্রেণী সংগ্রামের, গণসংগ্রামের মধ্যদিয়ে। সমবায় প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে প্রগতিশীল নেতা কর্মীরা সৃষ্টি করবে এ ভাবমূর্তি- প্রগতিপন্থীরা শুধু কোন এক অনুগত সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখায় না, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে তারাও থাকে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তারা জনগণ থেকে বিছিন্ন নয়, জনগণেরই অংশ, শ্রেণী সচেতন অংশ।

প্রগতিপন্থীদের আরও কর্তব্য হলো, গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিওদের দারিদ্র্য বিমোচনের আসল রহস্য উন্মোচন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা। ছোট ছোট টিম গঠন করে এনজিও কার্যক্রমের উপর সরেজমিন অনুসন্ধান এবং সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা। আর্থ-সামাজিক জীবন ধারায় এনজিও কর্মকাণ্ড কি ধরণের প্রভাব ফেলেছে তা নিরূপণ করা। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করার নামে যে নানাবিধ অত্যাচার নিপীড়ন, পুলিশী নির্যাতন চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়ে তাদের এগুতে হবে, এনজিও ও প্রগতিশীল সংগঠন ও কর্মীদের মধ্যে একটা বিভাজন রেখা টানতে হবে। এনজিওতে কর্মরত অসংখ্য মানুষ। তাদের ইউনিয়ন করার কোন অধিকার দেওয়া হয় না। এনজিও অলাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এখানে ইউনিয়ন করা চলবে না- এই বলে ইউনিয়ন করতে আগ্রহী কর্মীদের ভয়ভীতি, ক্ষেত্র বিশেষে চাকুরীচ্যুত করে। এনজিওতে কর্মরতদের ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলনে সমর্থন যোগাতে হবে। সর্বোপরি, এনজিও আগ্রাসনের স্বরূপ তুলে ধরে ব্যাপকভাবে প্রচার আন্দোলন সৃষ্টি করা অপরিহার্য কাজ হবে।

www.pathagar.com

পাঁচ রকমের ভোট চুরি

রাহমান মাসুম

আওয়ামী ঘরানার লোকেরা তো ব্যাপারটা কানেই তোলে না! তারা বলে কিসের কারচুপি, কিসের পুকুরচুরি! বিএনপি'র লোকেরা কি সব যা তা বলে? না হয় অতিথি ভোটাররা সখ করে কিছু সীল মেরেছে, না হয় ছেলেপেলেরা ফূর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে অতিরিক্ত কিছু হাতাহাতি, ফুটুস ফাটুস হয়েই গেছে, না হয় কিছু কিছু নির্বাচনী কর্মকর্তা খুশির চোটে ভোটের ফলাফল ইতিউতি সামান্য করেই ফেলেছে তাই বলে এসবকে পুকুরচুরি বলে নিন্দা করতে হবে? পুনঃনির্বাচন দাবি করতে হবে? ভোট হাইজ্যাক করার জন্য এখনো তো হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়নি, তাতেই এতো? আওয়ামী লীগারদের কথা, 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে 'নেত্রী' তো প্রথম থেকেই বলে আসছেন তাদের কিছু 'কৌশল' আছে। লুকোছাপার তো কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে বিএনপির লোকেরা চেঁচামেচি করে কেন?

আ'লীগের কর্মীরা 'জননেত্রী'র উপযুক্ত সাগরেদই বটে! কিন্তু এদিকে মুশকিল হয়েছে সাধারণ ভোটারদের নিয়ে। ভোটের ফলাফলে তাদের আক্কেল গুড়ুম। খায় দায় ফজর আলী, মোটা হয় জব্বর -এ কেমন কথা! ভোট দিলাম ধানের শীষে, পাস করলো নৌকা, এটা কি করে হয়? অনেক সেন্টারেই তারা আওয়ামী কর্মীদের জাল ভোট দিতে দেখেছে। অনেক সেন্টারেই আওয়ামী নেতাদের নগদ টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা রুখে দিয়েছে, পুলিশের সহায়তায় আওয়ামী মাস্তানদের সেন্টার দখলের তান্ডব তাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা বুঝে উঠতে পারে না ফলাফলে এতো বেশকম হয় কি করে? তাদের কথা আওয়ামীওয়ালারা যতো কারচুপিই করুক এমন কতকগুলো আসন আছে যেখানে তাদের জিতবার কোনো কথাই নয়। অথচ ফলাফলে তারা জিতে গেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো?

আসলে এদেশের সরলপ্রাণ মানুষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের প্যাঁচপ্যাঁচে নোংরামি বুঝে উঠতে পারে না, প্রশাসনের চুরি-চামারি তাদের মাথায় ঢোকে না। সে কারণেই সপ্তম সংসদ নির্বাচনের এই ফলাফলের কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না তারা।

সরেজমিনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, সব আসনে না হলেও বেশির ভাগ আসনে এবার যে ভোটচুরি হয়েছে তা কৌশল এবং অভিনবত্বের দিক থেকে একবারেই নজিরবিহীন! বিদেশী ভোটার ভাড়া করা, টাকা

www.pathagar.com

দিয়ে ভোট কেনা, ভোট না দিে জানের হুমকি দেয়া, এসব ঘটনার কথা বাদ দিলেও ভোট কেন্দ্র থেকে নির্বাচন কমিশন অবধি পাঁচটি ধাপে পাঁচ রকমের ভোটচুরি হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই পাঁচটি ধাপের ভোটচুরি সম্পর্কে কিঞ্চিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ভোটের আগে জাল ভোট

অনেক ভোটারই এই ধরনের ভোটচুরি বুঝে উঠতে পারেননি। কারণ এটি অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং খুবই গোপন কারচুপি। যে কোনোভাবেই হোক, প্রশাসনকে পক্ষে টেনে এই অপকর্মটি করেছে অনেক আওয়ামী প্রার্থী। নির্বাচনের আগের রাতে কিছু ভাড়াটে মাস্তানকে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচনী অফিসারদের কাছে। সেখানে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স রেডিই ছিল। মাস্তানরা মোট ভোটারের ৫০ ভাগ বা তারও বেশি ব্যালট পেপারে সীল মেরে বিজয়ের পালা রাতেই সাঙ্গ করে এসেছে। যে কারণে পরের দিন ভোট দিতে গিয়ে অনেকেই দেখেন তাদের ভোট কাস্ট করা হয়ে গেছে। আবার ফলাফলে দেখা গেছে মোট ভোট পড়েছে মোট ভোটার সংখ্যার চেয়েও বেশী। এখানে উল্লেখ্য যে , ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটার সংখ্যার চেয়ে বেশি ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়ে থাকে, আপদকালীন মজুদ হিসেবে।

এই ধরনের ভোট চুরির জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত কুমিল্লা-১২ আসনের যুগিরকান্দি কেন্দ্র। সেখানে মোট ভোটার ১৫৪৩ অথচ ভোট কাস্ট হয়েছে ১৮৩২। গোপালগঞ্জের একটি আসনেও এমন কান্ড ঘটেছে। বার্তা সংস্থা মিডিয়া সিন্ডিকেট অংক কষে দেখেছে ৭৩ ভাগ ভোট গ্রহন করতে সময় লাগার কথা ২ দিন। অথচ তা মাত্র ৮ ঘন্টায় সম্পন্ন হলো কি করে? অনেক সেন্টারে তো ভোট গ্রহণ চলেছে মাত্র চার থেকে ছয় ঘন্টা। নির্বাচনেরআগের রাতে জাল ভোট প্রদানই এর অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রক্সিভোট, ভুয়াভোট

ভোটচুরির এই কৌশলটি সম্পর্কে পুরোপুরি না হলেও কিছু কিছু ধারণা আছে সাধারণ মানুষের ।আওয়ামী লীগের কর্মীরা এ ধরনের ভোট প্রদানে বিশেষ পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে আসছিল দীর্ঘকাল ধরে। এবার তারা পুরনো কৌশলের সাথে নুতন মাত্রা যুক্ত করেছে জার্মানি থেকে আমদানি করা নতুন 'ইঁংক রিমুভার' ব্যবহার করে। ঢাকার লালবাগ, ইসলামপুর, গোড়ান, মতিঝিলসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী কর্মীরা এই কেমিক্যালের সাহয্যে 'অমোচনীয় কালি' মুছে ফেলে বিস্তর প্রক্সি ভোট দিয়েছে। মফস্বলেও তারা এই কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে। দৈনিক সংগ্রামের এক রিপোর্টে প্রকাশ, চাঁদপুর-৩, চাঁদপুর-৪, চাঁদপুর-৬ আসনে এক একজন মহিলা ১৫/২০টি করে ভোট দিয়েছে। প্রিজাইডিং বা পোলিং অীফসাররা দুই হাতে তাদের সাহায্য করেছে। উল্লেখ্য যে ঢাকার গোড়ান এলাকাসহ বেশ্ কিছু কেন্দ্রে এ ধরনের

www.pathagar.com

প্রক্সি ভোট বা জালভোটদানকারী মহিলাদের জনগণ পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশ তার কোনো প্রতিকারই করেনি।

নানা কারণে যেসব ভোটারের পক্ষে ভোটকেন্দ্রে আসা সম্ভব হয় না, তাদের ভোট অন্যের দ্বারা কাস্ট করানোই হচ্ছে প্রক্সি ভোট। আর যাদের ভোট দেবার বয়স হয়নি, অথচ কৌশলে ভোটার তালিকায় নাম ঢুকানো হয়েছে এরা ভুয়া ভোটার। এবারে অনেক নাবালককে ভোট দিতে দেখা গেছে। প্রতিবাদ উঠেছে জনগণের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসারের কিছু করার নেই কারণ ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে। এ সবই নাকি নতুন নির্বাচন কমিশনের অবদান। খবর এসেছে ১২জুন পর্যন্ত ফরিদপুর ২ আসনের আলকাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮শ ২। নির্বাচন স্থগিত হওয়ার চারদিন পর এখন সেখানে ভোটার সংখ্যা দেখান হচ্ছে ৩ হাজার ৯শ ৩১। মানে ১শ ২৯ ভোট বেশি। এটা কি করে সম্ভব হলো? লোকে বলাবলি করছে এ হচ্ছে 'গতিশীল' নির্বাচন কমিশনের গতিময় অবদান।

বুথ দখল না চর দখল

এটাকে ভোটচুরি না বলে ভোট ডাকাতি বলাই যুক্তিযুক্ত । সকলের সামনে এটি সংঘটিত হয় বলে, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। অভিযোগ আছে পুলিশ, বিডিআর, প্রশাসনের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে এবার আওয়ামী মাস্তানরা। কিশোরগঞ্জ-৭ আসনের ২০টি কেন্দ্র, ভোলা-১ আসনের ১২টি কেন্দ্র, ঢাকা-৪ আসনের ৩০টি কেন্দ্র, কুমিল্লা-১২ আসনের ৩০টি কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের ১১টি কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ-২ আসনের ৯টি কেন্দ্র, পার্বত্য খাগড়াছড়ির ৫০টি কেন্দ্র, কুমিল্লা-৭ আসনের ১৬টি কেন্দ্রসহ দেশের অসংখ্য ভোটকেন্দ্র দখল করে মাস্তানরা নিজেদের ইচ্ছামতো সীল মেরে বাক্স পুরণ করেছে। এসব ঘটনায় হানাহানি, সন্ত্রাসে ৬ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়েছে ।

প্রশাসনের কারচুপি

জামালপুর-২ এলাকার নুতন পাড়া বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল, সুখচর সরকারি প্রাইমারী স্কুল এবং রামভদ্র কেন্দ্র এই ধরনের ভোটচুরির জলজ্যান্ত প্রমাণ। ওই আসনের বিএনপি প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবু নতুনপাড়া বেসরকারি প্রাইমারী স্কুল কেন্দ্রে পেয়েছেন ৪৪৩ ভোট কিন্তু সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৪৩, পক্ষান্তরে এই কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের হাজী রাশেদ মোশাররফ পেয়েছেন ২২২ ভোট, অথচ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৪৫।

একইভাবে সুখচর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে বিএনপি প্রার্থীর ২৪৫ ভোটকে কমিয়ে ৪৫ এবং আ'লীগ প্রার্থীর ৫৬৫ ভোটকে বাড়িয়ে ১৭২১ করা হয়েছে। রামভদ্র কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীর ৫২৫ ভোটকে কমিয়ে ২৪ এবং আলী'গ প্রার্থীর ৪৭৩ ভোটকে

www.pathagar.com

বাড়িয়ে ১০১৫ করা হয়েছে। এগুলো মৌখিক অভিযোগ মাত্র নয়, এর সঙ্গে দালিলিক প্রমাণও রয়েছে। রাশেদ মোশাররফের মতো পরিচিত ব্যক্তিকেও নির্বাচনে জেতার জন্য এহেন প্রশাসনিক কারচুপির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাহলে সারাদেশে বিএনপি প্রার্থীদের হারানোর জন্য আওয়ামী লীগ কি পরিমাণ জালিয়াতি, কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রশাসনিক কারচুপির আরো নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। জামালপুর-২ আসনের কাস্তে মার্কায় সীল মারা ব্যালট পেপারসহ অসংখ্য বৈধ ব্যালট পেপার রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। কিশোরগঞ্জ এলাকায় ধানের শীষে সীল মারা বৈধ ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসারের গোল সীল মেরে নষ্ট করে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়েছে।

ফলাফল ছিনতাই

চার ধাপে ভোটচুরির পরও আওয়ামী লীগ যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছিল না। তখনই প্রয়োগ করা হচ্ছিল সর্বশেষ অস্ত্র। কেন্দ্রীয়ভাবে যারা ফলাফল মনিটরিং করছিলেন তারাই আওয়ামী লীগের পক্ষে এই মহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছিলেন। তবে এইখানে বোধহয় নীলনকশাকারীদের আয়োজনে সামান্য 'ত্রুটি' ছিল। এ কারণে রেডিও বাংলাদেশ যখন বলে বিএনপি ১১২টি আসনে জিতেছে,তখন নির্বাচন কমিশনের বরাতে বিটিভি থেকে কখনো ১০৭, কখনো ১০৫, কখনো ১০৩ ঘোষনা দেয়া হচ্ছিল। আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে রাখার চেষ্টা আর অপকৌশলটি কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। অবাক বিস্ময়ে দেশবাসী একটি প্রহসনের নির্বাচন এবং নীলনকশার ফলাফল প্রত্যক্ষ করলো। [দৈনিক দিনকাল ১৯/৬/৯৬]

www.pathagar.com

নির্বাচনী কারচুপিঃ '৯৬ ষ্টাইল

এডভোকেট এ, কে, এম, বদরুদ্দোজা

৭ম জাতীয় সংসদে প্রধান চারটি দল অংশ নেয়। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাপা ও জামায়াত। কিন্তু কার্যতঃ আরো অন্ততঃ চারটি দল নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং তা করা হয় একটি বিশেষ দলের পক্ষে। শেষোক্ত চারদল আদৌ রাজনৈতিক দল নয়। কিন্তু দল বিশেষকে জয়ী করার লক্ষ্যে তাদের মারমুখী প্রয়াস রাজনৈতিক দলগুলিকেও হার মানিয়েছে। এই চার দল হলো; (১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২) নির্বাচন কমিশন (৩) সিভিল বুরোক্রাসি এবং (৪) পুলিশ। এদেরকে পেছন থেকে কভার দিয়েছে প্রায় সবকটি প্রধান জাতীয় দৈনিক।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা অসহযোগ আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণাকারী ছয় সচিবের অন্যতম সৈয়দ আহমদকে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব পদে নিয়োগ করে চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেন। উপরন্তু একজন বিচারপতি হয়েও প্রধান উপদেষ্টা প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে একজন আমলাকে নিযুক্ত করেন। প্রধান নির্বাচন পরিচালক আবু হেনা নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব পালনকালে বিচারক সুলভ মনোভাব প্রদর্শনে লাগাতার ব্যর্থ হন। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আপত্তি সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ঢালাও রদবদল করেন। পরিনামে প্রশাসনের মাঠপর্যায়ে জনতার মঞ্চের সাথে একাত্মতা ঘোষণাকারীদের নিরংকুশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। টিভির মহাপরিচালক পদে এমন একজনকে বসানো হয় যিনি বিশেষ একটি দলের অনুগ্রহভাজন। অভিযোগ আছে "সবিনয়ে জানতে চাই" অনুষ্ঠানের প্রশ্নমালা একটি দলকে পূর্বাহ্নেই সবরাহ করা হয় এবং তারা সাবলীলভাবে বক্তব্য পেশের সুযোগ পান। পক্ষান্তরে জামাত ও বিএনপিকে পরিকল্পিতভাবে বিব্রত ও নাজেহাল করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা এনজিও গোষ্ঠীকে বিএনপি ও জামাতের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা পালনে অব্যাহত সহযোগিতা করেন। ব্রাক, আশা, প্রশিকা, এমনকি সরকারী মালিকানাধীন গ্রামীণ ব্যাংকের লোকজন একটি দলকে জয়ী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সংবিধানে সন্নিবেশিত "বিস্‌মিল্লাহ হির রাহমানির রাহিমের' পরিবর্তে' পরম করুণাময়ের নামে' ভাষণ শুরু করে প্রধান উপদেষ্টা তার নিরপেক্ষতার লেবেল শুরুতেই ছুঁড়ে ফেলেন। সরকারের একজন সচিব হয়েও ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর তত্ত্বাবধায়কের তিন মাসে অবাধে রাজনৈতিক বক্তৃতা বিবৃতি দিতে থাকেন। সচিবালয়ের কোন কোন কর্মকর্তার

www.pathagar.com

কক্ষে মিটিং করে কোন দলকে কত আসন দেওয়া হবে তার নক্শা প্রণীত হয়। ১১ই জুন দুপুরে ঢাকা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে অমুক দলকে দুই কিংবা একটি আসন ছেড়ে বাকীগুলো কব্জা করা হবে। এসব আঁতাতে পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের ডাকসাইটে কর্ণধারের সংযুক্ত থাকার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অথচ এসব ক্ষেত্রে কেয়ারটেকার সরকার বোবা বধিরের রোল প্লে করেন।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিলো আরো হতাশাব্যাঞ্জক এবং অস্বচ্ছ। তারা নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে হাজার হাজার ভূয়া ভোটারকে যাচাই বাছাই ছাড়াই নিবন্ধিত করেন বলে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। যেখানে নতুন ভোটার নিবন্ধনের জন্য একজন আবেদনকারীর সরাসরি দরখাস্ত সমেত উপস্থিত হবার কথা, সেখানে একেকজনের কাছ থেকে দুই তিন হাজার আবেদন পত্র গ্রহণ ও সরজমিনে যাচাই ছাড়াই তা নিবন্ধন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অভিযোগ পেয়েও কমিশন ব্যবস্থা নেয়নি। দেখা গেছে একজন ভোটারের নাম একই নির্বাচনী এলাকায় ৩ থেকে ৪ বার নিবন্ধিত হয়েছে। অনেক প্রার্থী নির্বাচনের দিনেও নতুন ভোটারে তালিকা পাননি। নির্বাচনী আচরণ বিধির ব্যাপারেও নির্বাচন কমিশন ছিলো নির্লিপ্ত এবং উদাসীন। অননুমোদিত আকৃতির প্রতীকে দেশ ছেয়ে গেছে, তফসিল ঘোষণার আগেই প্রার্থীরা রঙিন পোস্টারের সয়লাব বইয়েছেন, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল রমনায় ভোটারে বাড়ী বাড়ী ফুল আর মিষ্টি পাঠানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন দু'একটি ক্ষেত্রে নোটিশ আর সাবধান বাণী জারী করে দায় সেরেছেন। একটি নির্বাচনী এলাকায় সর্ব্বোচ্চ ১৫টি ক্যাম্প এবং বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা অবধি অনধিক ৩টি মাইক ব্যবহারের বিধানও মানা হয়নি। এসব মনিটর করে ব্যবস্থা নেওয়ার গরজ বোধ করেনি নির্বাচন কমিশন। আচরণ বিধি নিছক তামাশায় পর্যবেশিত হয়।এ যাবৎ কোন সাধারণ নির্বাচনেই সশস্ত্র বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করেনি। অথর্ব নির্বাচন কমিশন সশস্ত্র বাহিনীকে নিজেদের তদারকীতে নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সশস্ত্রবাহিনীকে নিজ নিজ ক্যাম্পে সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে আমাদের ঘুণেধরা পুলিশ আনসার আর বিডিআর পুকুর চুরির মওকা পেয়ে তা সদ্ব্যবহার করে। নির্বাচনকালে গোটা প্রশাসন যেখানে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত থাকার কথা সেখানে আমর্ড পুলিশকে হোম-এর অধীনে ন্যস্ত করা সুগভীর চক্রান্তের ফসল। কমিশন দেশব্যাপী প্রিজাইডিং ও পুলিং অফিসার নিয়োগেও চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়। বিভিন্ন স্থানে দলীয় লোকদের প্রিজাইডিং পোলিং অফিসার পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে পূর্বাহ্নে আনীত আপত্তি কমিশন ঢালাওভাবে অগ্রাহ্য করে।

নির্বাচনে পুলিশের এবং পাশাপাশি আনসার বিডিআরের ভূমিকা ছিলো ন্যাককারজনক।তারা বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে। অনেক মহিলা ভোটার অভিযোগ করেছেন যে,এসব বাহিনীর লোকেরা তাদের বিশেষ মার্কায় ভোট দিতে চাপ

www.pathagar.com

প্রয়োগ করে। কেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ঢুকলে যেখানে অন্যান্য দলের ব্যাজধারীদের বের করে দেওয়া হয়েছে সেখানে একটি দলের কর্মীরা ব্যাজ ধারণ করে ৪০০ গজের মধ্যে মিছিলও করেছে। বেগম খালেদা জিয়া ডেমরার একটি কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ফিরে যাবার সময় তার গাড়ী ঘিরে নৌকা নৌকা শ্লোগান দেওয়া হয়। এ সময় বেগম জিয়ার সমর্থকদের ৪০০ গজের বাইরে কর্ডন করে রাখা হয়। পুলিশ ভোট দিতে আগত অসংখ্য মহিলাকে আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে বলে অযথা ধমক দিয়ে ফেরৎ পাঠায়। ঢাকায় বেশ ক'জন প্রার্থী কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী তাদের সহায়তা করেনি। ১১ই জুন রাতে নগরীর বিভিন্ন বস্তিতে যখন নোট দিয়ে ভোট কেনা হচ্ছিলো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েও পুলিশ যায়নি। ১২ই জুন ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে গড়ে ১০/১২ জন করে জালভোটার ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের একজনকেও গ্রেফতার করে বিচারে সোপর্দ করেনি। বরং প্রতিবাদী পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া মাত্র পুলিং এজেন্টদের পুলিশ বিডিআর আনসার বের করে দেয়। আধঘন্টা থেকে একঘন্টা পর যখন তাদের গণনার টেবিলে ডাকা হয় ইতিমধ্যে পুকুরচুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ আছে।

নির্বাচনের দিন প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, আনসার, বিডিআর একটি বিশেষ দলের পক্ষে নির্লজ্জভাবে কাজ করেছে। ঢাকা শহরের বেশ কটি ভোটকেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের হাতে অমোচনীয় কালি মেখে ব্যালট পেপার না দিয়েই বের করে দেওয়া হয়। তাছাড়া মহিলাদের ভোটগ্রহণ অযথা বিলম্বিত করায় অনেকেই ফিরে যান ভোট না দিয়ে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মহিলা ভোটারদের ভুল লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। দরজায় এলে তারা জানতে পারে এই বুথে নয় তার ভোট অন্যবুথে। অশিক্ষিত ও নিম্নবিত্ত মহিলাদের খালেদার মার্কা নৌকা বলেও বিভ্রান্ত করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে জালভোটের হিড়িক শুরু হয়। সেজন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পুলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন ব্যবস্থাতো নেনই নাই বরং ভোটগ্রহণ স্থগিত করার আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অগত্যা প্রার্থী বা তার এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কমিশনের শরনাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু ঢাকা মহানগরীর ৮টি আসনের একটি কেন্দ্রের ব্যাপারেও তারা কোন ব্যবস্থা নেননি। নির্বাচন কমিশনের বড়কর্তা আধাবেলা ফরিদপুরে পাড় করে ঢাকায় আসেন। অভিযোগ সম্পর্কে জেনেও নীরবে পাশ কাটিয়ে গেছেন তিনি।

আমাদের সংবাদপত্র গুলোকে নির্বাচনী অনিয়ম ও কারচুপির তথ্য জানানো হলেও তারা বেমালুম চেপে গেছেন। খুলনা-২ আসনে পরাজিত প্রার্থীর আবেদনে ভোট গণনার পর বিজীয় প্রার্থীর ভোট ১৮০টি বৃদ্ধি পাওয়া, কোন কোন কেন্দ্রে ভোটারের অধিক ভোট প্রদান, বিভিন্ন প্রতীকে সীল মারা ব্যালট যত্রতত্র কুড়িয়ে পাওয়া, ভোটার

www.pathagar.com

লিষ্টে একই ব্যক্তির নাম ৩/৪ স্থানে অন্তর্ভূক্তি, পুলিশ আনসার বিডিআরের প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব, প্রাপ্ত ভোট কমানো বাড়ানো, গণনার আগে ভোটকেন্দ্র থেকে এজেন্টদের সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়া, প্রার্থীদের পূর্বাহ্নে না জানিয়ে পোস্টাল ব্যালট একীভূতকরণ, নির্ধারিত ফরমের পরিবর্তে সাদা কাগজে ফলাফল সরবরাহ, ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই নির্ধারিত ফরম সাদা রেখেই এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ ইত্যাদি প্রমানিত বিষয়েও সংবাদপত্রগুলি মুখ খুলেনি। অথচ খোদ্ শেখ হাসিনা ১২ই জুন নির্বাচন পুরোপুরি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি ইঙ্গিত দিয়ে মন্তব্য করেন, নির্বাচন মোটামোটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনের বোধ করি শেখ হাসিনার চেয়েও বড় আওয়ামী। তারা দু'জনে নির্বাচনে ষোলআনা অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে রায় দেন।শুধু কি তাই জনগণের সন্দেহ দূর করতে তাদের রায় যথেষ্ট মনে না করায় তারা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সনদপত্রও যোগাড় করে দেন।

১২ই জুনের নির্বাচন যে স্বচ্ছ, নির্বিঘ্ন, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি তার বড় প্রমাণ ২৭টি আসনের ১২৩টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন। ৯১ সনে একটি কেন্দ্রেও ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়নি। ৯১ এর নির্বাচনে বিএনপি কোন অন্যায় সুযোগ নিয়ে সরকার গঠন করেছিলো এমন অভিযোগ উঠেনি। শেখ হাসিনা সুক্ষ্ম কারচুপির কথা বললেও তা বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। কিন্তু '৯৬ সনে বিএনপি এবং জামায়াত স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি বলে যে অভিযোগ করেছে তা উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। ১২ই জুন রাতে টিভি যখন বিএনপি ১০৫ আসন পেয়েছে বলে প্রচার করছিলো তখন রেডিও বিএনপি ১১২ আসন পেয়েছে বলে প্রচার করে। পরে টিভি ১০৫কে কমিয়ে ১০৪ এ আনে। টিভি ঢাকার ৮টি আসনের ফলাফল দিতে শুরু করে ভোর ৬টায়। অথচ প্রত্যন্ত এলাকা খাগড়াছড়ি ও গোপালগঞ্জের ফলাফল রাত ৯টার আগেই জানিয়ে দেয়। এতে একটা মিডিয়া ক্যুর প্রমাণই পাওয়া যায়। তাছাড়া নির্বাচনে অনিয়ম ও পুকুরচুরির অভিযোগ বিএনপি একা উত্থাপন করেনি। জামায়াত বলেছে, 'আমরা ৯১-এর মত একটা নির্বাচন চেয়েছিলাম কিন্তু তা হয়নি। জামায়াত কালো টাকা, এনজিও, কেন্দ্র দখল, প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব এবং পেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে।' রাশেদ খান মেনন বলেছেন একটি দলের সমর্থকরা কেন্দ্র দখল করে তাকে ও তার এজেন্টদের আটক করে। সেনাবাহিনী সদস্যদের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্ত হন। জাকের পার্টি পুরো নির্বাচনী ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জাপার অনেক প্রার্থী ভোট পুনঃ গণনার দাবী করেছেন।

'৯৬ এর নির্বাচন '৯১ এর নির্বাচনের তুলনায় স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। বরং '৯৬ এর নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একটি বিশেষ দলের পক্ষে নির্লজ্জভাবে কাজ করা সম্পর্কে গোটা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারাই যদি একদিকে ঝুলে পড়ে জাতি কার কাছে যাবে?

www.pathagar.com

অবাধ নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচনের স্বরূপ

সালাউদ্দিন বাবর

ক্ষমতাসীন মহল তথা আওয়ামী লীগ ছাড়া এবার কেউই '৯৬ এর ১২ই জুনের নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ বলেনি। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী অন্যতম বৃহৎদল জামায়াতে ইসলামী। এই দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে গত ১২ই জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে, কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতিগত ও বিধি বিধানগতভাবে যত ঘোষণাই দিয়ে থাকুন বাস্তবে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি।

মজলিসে শূরার বৈঠকে ১২ই জুন অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনা করে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী মৌলবাদের নামে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং জামায়াতকে নির্বাচনে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হারানো হয়েছে। উপরন্তু জালভোট , কারচুপি , পরিকল্পিত সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন, দেশের প্রচলিত আইন লংঘন করে নির্বাচনের ব্যাপারে কতিপয় এনজিও'র রাজনৈতিক ভূমিকা, কালো টাকার ছড়াছড়ি ও প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং কেয়ারটেকার সরকারের অনাকাংখিত দুর্বলতা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা দারুণভাবে ব্যাহত করেছে।

জামায়াতের মজলিসে শূরা গভীর বেদনার সাথে উল্লেখ করে যে, কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ '৯১-এর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সরকারের মত নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শর্তারোপ করে বিটিভির 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বিষয়টি অবহিত করার পর তারা জানিয়েছিলেন যে, দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন। অথচ দলীয় প্রধান সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী না হলে ভাষণ দিতে পারবেন না এ অযৌক্তিক অযুহাতে আমীরে জামায়াতকে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়া থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হলে এ ঘটনা ঘটতে পারতো না।

www.pathagar.com

মজলিসে শূরার বৈঠকে বলা হয়, ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হবে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। অথচ নির্বাচনের দিনে যেসব ভোট কেন্দ্র দখল করা হয়েছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও ঐসব ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়নি। এমনকি নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করেও অভিযোগ করার মত লোক পাওয়া যায়নি অথবা অভিযোগ করেও কোন কাজ হয়নি। ভোটকেন্দ্র দখল করে ভোটার সংখ্যার চাইতে বেশী ব্যালটে সীল মারা হয়েছে এমন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণও স্থগিত করা হয়নি। পুলিশ ও বিডিআর যা দেয়া হয়েছিল তা ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু '৯১-এর মত নির্বাচনে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সেনাবাহিনী কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি বা ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়নি। ফলে সেনাবাহিনী মোতায়েনের মূল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, এবারের নির্বাচনে কালো টাকার খেলা এতটা প্রকাশ্যে চলেছে যে নির্বাচন কমিশন তা রোধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করলে সহজেই তা ঠেকাতে পারতেন। নির্বাচন আচরণবিধি অবাধে লংঘিত হয়েছে। প্রকশ্যেই শাড়ী, লুঙ্গি, টিভি সেট, নগদ টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়া হয়েছে। অথচ নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন এসব ব্যাপারে ছিল নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। যেসব জায়গায় প্রশাসন সন্ত্রাস ও অনিয়ম হতে দেননি সেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছে। কিন্তু অনেক জায়গায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ রয়েছে এবং বহু জায়গায় সন্ত্রাস ও কারচুপির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা সত্ত্বেও মাত্র ২৭টি আসনের ১২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছন কিন্তু বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে নির্বাচন ১৯৯১ সালের মতো অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে ' ফেমা' নামক সংস্থার ভূমিকা তীব্র সমালোচনা করে বলা হয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে সংস্থাটি সুপরিকল্পিতভাবে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলে দাবী করা হয়। বৈঠকে আরো বলা হয়, কয়েকটি পশ্চিমা দেশের অর্থে পরিচালিত এই সংস্থাটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনে যাতে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হতে না পারে সে ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, '৯৫ সালেই জামায়াতের পক্ষ থেকে বিদেশী অর্থে পরিচালিত এ সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। বস্তুতঃ আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়েই এই সংস্থাটি গঠিত।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও পাবনা- ১ আসন থেকে '৯১ সালে বিপুল ভোটে বিজয়ী প্রার্থী মওলানা মতিউর রহমান নিজামী অভিযোগ করেছেন,

www.pathagar.com

তার নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রশাসন সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কারচুপিতে অংশ নিয়েছে। মওলানা নিজামী একে আওয়ামী লীগের পক্ষে আমলাতান্ত্রিক কারচুপি বলে অভিহিত করে বলেন, আমার এলাকার জনগণ নির্বাচনের এই ফলাফর অগ্রাহ্য করেছে।

মওলানা নিজামী একটি জাতীয় দৈনিকের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন পাবনা-১ আসনে বহু কেন্দ্রর প্রিজাইডিং অফিসার এবং পুলিং অফিসার প্রকাশ্যে নগ্নভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। পোলিং অফিসারদের অনেকেই ভোটারদের হাত থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে নিজেরা সিল দিয়ে তা বাক্সে ফেলেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রতীকে ভোটদানকারীদের ব্যালট পেপার নিয়ে তারা ছিড়ে ফেলেছে। আবার একজনকে একাধিক ভোট দেয়ার সুযোগও তারা দিয়েছে। এসব বিষয়ে অভিযোগ করার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে যাওয়া হলে তাকে তার দফতরে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যাক্তিরা অত্যন্ত তৎপর ছিল, তারা নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের দিন জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেবে এমন সব ব্যক্তিকে হুমকি দিয়েছে, নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। সেখানকার স্থানীয় একটি বাজারে ইজারাদার এবং আওয়ামী লীগ নেতা বাজারের ব্যবাসায়ীদের জামায়াত প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার জন্য হুশিয়ার করে দেয়। তিনি বলেন, অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়েছে সেখানে প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা যৌথভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য একযোগে কাজ করেছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের নামে পাবনা-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য একটি সাজানো নাটক করা হয়েছে। ফলে এই নির্বাচনের ফলাফল দেখে জনগণ বিস্মিত হয়েছে, তারা সেখানে দাঁড়িপাল্লার বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সেখানে নৌকা প্রতীকের বিজয়ে তারা হতবাক হয়েছে। এই ঘোষণা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। মওলানা নিজামী তার এলাকায় টহল দানকারী সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নির্বাচনের সময় অন্যান্য দলের কর্মীরা সমর্থকদের গাড়ী দিয়ে আনা নেয়ার ব্যাপারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন কিছু বলেনি। আমার নির্বাচনী এজেন্ট বৈধ কাগজ পত্রসহ ভোট কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শন করতে গেলে তাকে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা বাধা দেয় এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। মওলানা নিজামী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এবার নির্বাচনের সময় বিভিন্ন এনজিও আমার এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে। আমার এলাকায় গ্রামীন ব্যাংক, আশা, ব্রাক তাদের সমিতির সদস্যদের উপর চাপ দিয়েছে যাতে তারা জামায়াত প্রার্থীকে ভোট না দেয়। অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে তারা এসব করেছে। তারা তাদের

www.pathagar.com

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের রীতিমত যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মওলানা নিজামী আরো উল্লেখ করেছেন, এবার নির্বাচনে তার এলাকায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীরা সমান তালে টাকা খরচ করেছে। বিপুল অর্থ দিয়ে তারা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করেছে। এভাবে নির্বাচনে কালোটাকা খরচ করা হলে দেশে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হবে। তিনি আরো অভিযোগ করেন, বিএনপি প্রার্থী নির্বাচনের সময় বিপুল অর্থসহ জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং গুজব ছড়িয়েছে।

কুমিল্লা- ১২ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এই নির্বাচন ফলাফল বাতিল করে নয়া নির্বাচনের দাবী জানান। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, ১২ই জুনের চৌদ্দগ্রাম এলাকার নিবাচন ছিল প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের আঁতাতের এক নীল নকশার নির্বাচন। নির্বাচনের দিন সকাল দশটায় আওয়ামী লীগের সশস্ত্র-মাস্তান বাহিনী একযোগে সকল কেন্দ্রে হামলা চালায় এবং ৬৬ কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্র চর দখলের মত করে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। হামলার সময়ে তারা পিস্তল, কাটা রাইফেল ব্যবহার করে এই সকল কেন্দ্র থেকে তারা জামায়াত , জাতীয়পার্টি এবং বিএনপির এজেন্টদেরকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং ইচ্ছামাফিক নৌকা মার্কায় সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে। কোন কোন কেন্দ্রে তারা শতকরা ৯০%-৯৫% ভোট নেয়। এসকল কেন্দ্রে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। এদের কয়েকজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। তারা মহিলা ভোটারদের উপরও বোমা হামলা করে। এমনকি তারা আমার উপর হামলা করে এবং আমার গাড়ী ভেংগে দেয়। এসব ব্যাপারে টি.এন.ও, ডি.সি.-এর সাথে যোগাযোগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

ষড়যন্ত্র শুরু হয় প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ থেকে। বাছাই করে আওয়ামী লীগারদেরকে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। আমাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও-এর কোন প্রতিকার করা হয়নি। যে সকল কেন্দ্র তারা দখল করে নেয় বার বার আবেদনের পরও সে সকল কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়নি। পক্ষান্তরে ভাল কেন্দ্রগুলো সামান্য অজুহাতে স্থগিত ঘোষণা করে। টি .এন.ও এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করে এবং পুলিশ- বিডিআরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

এই নির্বাচন ছিল ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখল এবং ভোট ডাকাতির নির্বাচন। এই নির্বাচন কোন ভাবেই সুষ্ঠু ও অবাধ বলা যায় না। আমি নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে পুনঃ নির্বাচনের দাবী করেছি।

www.pathagar.com

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ডাঃ তাহেরসহ জাতীয় পার্টির প্রার্থী কাজী জাফর আহমদ ও বিএনপি প্রার্থী এম,এ, গফুর পাটোয়ারী ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেন। এই তিন প্রার্থী কুমিল্লা প্রেস ক্লাবে যৌথভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

জামায়াত প্রার্থী ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জাতীয় পার্টি প্রার্থী কাজী জাফর আহমদ ও বিএনপি প্রার্থী এম, এ, গফুর পাটোয়ারী কুমিল্লা- ১২ নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক সশস্ত্র সন্ত্রাস ও ব্যাপক ভোট জালিয়াতির প্রতিবাদ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থীত্রয় বলেন, নির্বাচন শুরুর সাথে সাথে আওয়ামী লীগ সুপরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে জোর পূর্বক চর দখলের মত বিভিন্ন কেন্দ্র একটির পর একটি দখল করে নিতে থাকে। দুপুরের পূর্বেই তাদের কেন্দ্র দখলের কাজ সম্পন্ন হয়। ঐ সকল কেন্দ্রে ২/১ জন পুলিশ ও ২ জন আনসার ছাড়া আইন-শৃংখলা রক্ষার কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। আওয়ামী লীগ যে সকল কেন্দ্র দখল করে ইচ্ছা মাফিক ব্যালট পেপারে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়েছে এবং শতকরা নব্বই থেকে নিরানব্বই ভাগ ভোট কাস্ট করেছে। এ সকল কেন্দ্র হলোঃ পদুয়া কেন্দ্র, ভাংগা পুস্করিনী কেন্দ্র, খগৈর কেন্দ্র, নারচর কেন্দ্র, নালঘর কেন্দ্র, কাদৈর কেন্দ্র, উনকট কেন্দ্র, মিয়া বাজার কেন্দ্র, নানকরা কেন্দ্র, দক্ষিণ শ্রীপুর কেন্দ্র, সুরিকরা কেন্দ্র, নোয়াগ্রাম কেন্দ্র, বিজয়করণ কেন্দ্র, চনকরা কেন্দ্র, গালর্স হাইস্কুল কেন্দ্র, দেওকোটা কেন্দ্র, ও যুগির কান্দি কেন্দ্র। তারা নির্বাচনের পূর্বেই আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মীরা ভোট কেন্দ্র দখলের এক নীল নকশা তৈরী করে। আমরা এটা জানতে পেরে, যে সকল কেন্দ্র তারা দখল করবে বলে স্থির করেছে তার তালিকা সম্বলিত দরখাস্ত ১১ই জুন '৯৬ তারিখে জেলা রিটার্নিং অফিসারের বরাবরে পেশ করি। আমরা ঐ সকল কেন্দ্রে সম্ভাব্য সন্ত্রাস, গোলযোগ ও জালিয়াতি বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইন-শৃংখলা বাহিনীর পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকজন মোতায়নের দাবী জানাই। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, স্বরাষ্ট্র সচিব, সেনাবাহিনীর প্রধান বিডিআর এর মহাপরিচালক, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের নিকট টেলিগ্রাম প্রদান করি। জেলা পুলিশ সুপার, থানা নির্বাহী অফিসার এবং থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয় এবং ফলে আমাদের আশংকা সত্যে পরিণত হয় এবং আওয়ামী লীগ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় চর দখলের মত নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহ দখল করে নির্বাচনকে চরম প্রহসনে পরিণত করে।

তারা বলেন, দাবী মানা না হলে চৌদ্দগ্রামবাসী বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করবে। যার দায় দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।

তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হলে তিন প্রার্থীই পরবর্তীতে ১৯শে জুনের কয়েকটি কেন্দ্রের নির্বাচনকে তারা বর্জন করেন।

www.pathagar.com

নির্বাচন তদন্ত কমিটি বিলুপ্ত করা হল কেন?

মিজানুর রহমান খান

বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে নির্বাচন তদন্ত কমিটি একটি নতুন ধারণা। ১২ জুনের নির্বাচনেই এর প্রথম প্রয়োগ। সাব জজদের সমন্বয়ে ৬৪টি জেলায় গঠন করা হয় ৬৪ টি কমিটি। নির্বাচনী আইনে এই কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। এটা নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের ওপর। নির্বাচন তদন্ত কমিটি এবার সারাদেশের নির্বাচনী শৃংখলা রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তবে কমিটি তার কার্যক্রম রাজনীতিকদের আচরণের তদন্তেই সীমাবদ্ধ রাখে বলা যায়। রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে কমিটি প্রায় দু'শটি তদন্ত পরিচালনা করে। এর মধ্যে প্রায় একশ'টি ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্টপক্ষকে সতর্ক করে দেয়। এসব অভিযোগের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল নির্বাচনী প্রচারণার লংঘন। প্রতিপক্ষের পোস্টার ছেঁড়া, মাইকের অত্যধিক ব্যবহার, নির্বাচনী বক্তৃতায় উস্কানিমূলক বক্তৃতা ছিল এর অন্তর্ভূক্ত। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলেছেন, যে অভিযোগের ব্যাপারে একবার কোন প্রার্থীকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে তিনি দ্বিতীয়বার অনুরূপ আচরণবিধি লংঘন করেননি। নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ধরণের ইতিবাচক ডেভেলপমেন্ট। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তা প্রয়োগ করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচন তদন্ত কমিটিকে মূলত আচরণবিধি লংঘনের তদন্ত করার এখতিয়ার দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে কমিটির কাছে এমন অনেক অভিযোগ নথিভুক্ত হয় যা নির্বাচনী আইন অর্থাৎ আরপিও-তে বর্ণিত বিধি লংঘনের পর্যায়ে পড়ে। আর ওইসব কারণে অভিযুক্তদের দন্ড ছিল জরিমানাসহ দুই থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড। এধরণের নির্বাচনী অপরাধকে বলা হয় 'কগনিজেবল অফেন্স।' যার বিরুদ্ধে পুলিশ এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সারাদেশে আরপিও-র ভুরি ভুরি লংঘন ঘটেলেও কোন থানা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট একটি মামলাও দায়ের করেননি। ক্ষমতায় থেকেও ক্ষমতা না প্রয়োগের এমন নজির আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরনের অন্তরায় বলে গণ্য করেন সচেতন মহল।

যে আইনবলে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, সে আইনে কমিটিকে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের আচরণ তলিয়ে দেখারও এখতিয়ার দেয়া হয়। ১২

www.pathagar.com

জুনের নির্বাচনে ৬৮ জন রিটার্নিং অফিসার, ২৫,৯৫৭ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ১,১৪,৭৪৯ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনের দু'দিন আগে নির্বাচন কমিশন থেকে কমিটিগুলোকে ফ্যাক্স বার্তা দেয়া হয় যে, তারা যেন আচরণবিধির এগারো নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় তদন্ত পরিচালনা করেন। এ সময় কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, কমিটির অস্তিত্ব থাকবে গেজেটে ফল প্রকাশের দিন পর্যন্ত। বাস্তবে তাই ঘটে। কিন্তু লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, কোন একটি কমিটিও এগারো অনুচ্ছেদের আওতায় তদন্ত পরিচালনা করেনি বা উদ্যোগও নেয়নি। এতে বলা ছিল , কোন সরকারী কর্মকর্তা কোন নির্বাচনী কার্যক্রমে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্যে ১৯৯১ সালে প্রণীত বিশেষ বিধান অধ্যাদেশটি এবারও বলবৎ ছিল। কিন্তু এর কোন বিধানই প্রয়োগ করা হয়নি। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, বিভিন্ন পর্যায়ে হাজার হাজার নির্বাচনী কর্মকর্তার কোন একজনও কোন অনিয়ম করেননি?

১৯৯১ সালের নির্বাচনের ওপর প্রণীত প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠার রিপোর্টে দেখা যায়, '৯১ সালে প্রাক নির্বাচনী অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে ৩৮ জন কর্মকর্তার আচরণ তদন্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ডেপুটি কমিশনাররাও ছিলেন। ১৯৯৬ সালে কর্মকর্তাদের ইস্যুটি ছিল জ্বলন্ত। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে প্রাক অনিয়ম যাচাই করে দেখা হয়েছে সামান্যই। আর নর্বাচনের আগের দিনের আচরণ নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলা হল না। অথচ অভিযোগ ছিল অনেক এবং সুনির্দিষ্ট। আর এ অভিযোগ কেবল বিএনপি নয়, ব্যারিস্টার মওদুদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, কাজী জাফর আহমেদ ও মতিউর রহমান নিজামীর মতো আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতারাও এনেছেন। বিএনপির ১১১টি আসনের পুনর্নির্বাচনের দাবির প্রেক্ষিতে কমিশনের কি কিছুই করার ছিল না-এ প্রশ্নের জবাবে একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, ভোটগ্রহণ শেষ হয় বেলা ৪ টায়। গোপালগঞ্জ- ৩ আসন থেকে ফলাফল আসে বেলা সাড়ে ৪টায়। খুলনা বিভাগের ভোটারদের উপস্থিতি শতকরা ৮২ শতাংশ।কর্মকর্তাটির ভাষায় এ ধরণের অনেক ব্যাপার আছে,যাতে অসঙ্গতি রয়েছে বলেই মনে হয়। এসব তদন্ত করে দেখা সম্ভব ছিল। নির্বাচন তদন্ত কমিটি বিলুপ্ত না করে তাকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা কেন করা হলো না- সে এক গুরুতর প্রশ্ন বটে। [রোববার / ২৩-৬-৯৬]

www.pathagar.com

একনজরে ভোট কারচুপির নানা কৌশল

১। প্রতিপক্ষের ভোটারদের তালিকার বাইরে রাখা।
২। ভোট কেন্দ্রের অবস্থান অসুবিধাজনক এলাকায় নিয়ে যাওয়া।
৩। পুলিশ বাহিনীকে অপব্যবহার করা কিংবা প্রার্থী কর্তৃক পুলিশের হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে যা খুশী তা করা।
৪। নির্বাচনের আগে মাস্তানদের প্যারোলে মুক্তি দান।
৫। বিরোধী পক্ষের সমর্থকদের আটক করা ।
৬। কেন্দ্রীয় পুলিশ ফোর্সকে নিয়োজিত না করা।
৭। নির্বাচনে সরকারী যানবাহন ব্যবহার।
৮। সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচনে ব্যবহার।
৯। ভোটারদের কোথাও জড়ো করে আটকে রাখা।
১০। হাঙ্গামা বাধিয়ে ভোটার আসতে না দেওয়া।
১১। অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ভীতি প্রদর্শন।
১২। বৈধ অস্ত্র নিয়ে বাহাদুরি প্রদর্শন।
১৩। ব্যালট কাগজের হিসাবে গরমিল।
১৪। বুথে আসা যাওয়ার পথ জ্যাম করে দেওয়া।
১৫। ভোট কর্মচারীদের প্রলোভনে বশ করা।
১৬। ভোট গণণার সময় প্রতিপক্ষের ভোট বাতিল।
১৭। কাউন্টিং এজেন্ট হিসাবে মন্ত্রীদের উপস্থিতি।
১৮। প্রতিপক্ষকে অসুবিধায় ফেলবার জন্য ভূয়া প্রার্থী দাঁড়া করানো।
১৯। লাগাম ছাড়া অর্থ ব্যয়।
২০। দল, প্রার্থী, ভোটারদের আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য কয়েকটি খুন খারাবী ঘটিয়ে দেওয়া।
২১। জনসভায় হাঙ্গামা বাঁধানো।
২২। প্রতিপক্ষের পোষ্টার নষ্ট করা।
২৩। নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি।
২৪। নাজুক এলাকার মধ্যে দিয়ে মিছিল নিয়ে যাওয়া।
২৫। বিমানের অপব্যবহার।
২৬। ভূয়া ভোটার তৈরী।
২৭। অস্পষ্ট নাম ঢুকিয়ে তালিকা তৈরী।
২৮। নাবালকদের ভোটার করা।
২৯। এক ভোটারকে ৮/১০ জায়গায় ভোটার করে রাখা।
৩০। নাগরিকত্বের ভুয়া কাগজ তৈরী।

www.pathagar.com

নির্বাচনী জরিপ ব্যবসা

আবু বরক সিদ্দিকী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এখন বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠন নির্বাচনের আগে নির্বাচনী জরিপ পরিচালনা করে থাকে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জনমত জরিপের ফলাফল নির্বাচনের পরে ঘোষিত ফলাফরের সাথে সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকে। সেক্ষেত্রে উনিশ/বিশ হলেও বাংলাদেশে এ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। উন্নত বিশ্বে জরিপকারীরা যে দলেরই সমর্থক হোননা কেন জরিপ পচিালনার ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাদের জরিপ রিপোর্টে সত্যিকার অর্থেই জনমত প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আর বাংলাদেশের জরিপকারীরা যে সংস্থা বা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জরিপ পরিচালনা করেন তা সেই সংগঠনের ভাবাদর্শে এমন অন্ধ হয়ে যান যে, জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। জনমত জরিপের ক্ষেত্রে হয় ভুল। আবার নির্বাচনের সময় এদেশের জনমত জরিপের নামে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলে চলে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। জনমতকে প্রভাবিত করার জন্যে বিশেষ বিশেষ দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধরা একটু ভিন্ন লেবাস গায়ে জড়িয়ে নিজ নিজ দলের পক্ষে জনমতের তথাকথিত ফলাফল ঘোষণা করে সাধারণ ভোটারদের রায় দলের পক্ষে আনার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র করে থাকে। অনেকে আবার টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনমত জরিপ করে থাকেন। এসব কারণেই বাংলাদেশে নির্বাচনে জনমত জরিপের ফলাফল এখনো পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। এবারের নির্বাচন প্রাক্কালেও অনেক সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা জনমত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। একাধিক জ্যোতিষী গ্রহ নক্ষত্রের গণনা করে আগাম ফলাফলের ঘোষণা দেন। কিন্তু এসব ফলাফলের সাথে নির্বাচনের প্রকৃত ফলাফলের ব্যবধানে মাত্রা বাস্তবের সাথে একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এর কারণ কি?

নির্বাচনী জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে জরিপকারীকে যেটা করতে হবে তা হলো নির্বাচনে যারা ভোট দিতে পারে তাদের সঙ্গে নির্বাচনের আগে যোগাযোগ করা। জরিপকারী যাদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রথমে তাদেরকে তিনি বাছাই করবেন। একটা নির্বাচনের ফলাফল কি হতে পারে সেটা জনমত জরিপের ভিত্তিতে বলার সবচেয়ে সহজ সরল উপায় হলো এক একটি দলের পক্ষে কয়জন ভোট দেবেন বলে বলেছেন তার অনুপাতটা অঙ্ক কষে বের করে ফেলা। তবে এক্ষেত্রে জরিপকারী যার সাথে কথা বলবেন তার বয়স, আয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা- এসব কিছুর ভিত্তিতেই একটা

www.pathagar.com

আনুপাতিক গড় হিসেব বের করতে হবে। অতঃপর প্রশ্ন তৈরি করে বাছাই করা ব্যক্তিদের উত্তরের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে তত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশে নির্বাচনী জরিপ পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রেই ভূল হয়ে থাকে। যাদের সাথে কথা বলা হয় তাদের বাছাই করতে ভুল হয়। ভোটার অনুপাতে জরিপে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে স্যাম্পেলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। আর এ কারণেই এদেশের জরিপগুলো পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট হয়। এছাড়া জরিপকালে যাদের সাথে কথা বলা হয় এদের অনেকেই প্রকৃত প্রশ্ন না বুঝেই একটা উত্তর দিয়ে দেন। এসব কারণেই জরিপ রিপোর্টে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। এখানে নির্বাচন -পূর্ব কিছু জরিপ রিপোর্ট এবং নির্বাচনে ঘোষিত প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল পত্রস্থ করে সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য দেখানো হলো।

একজন জরিপ সমন্বয়কারীর অভিমত

নির্বাচনী জনমত জরিপ পরিচালনার নানা দিক নিয়ে পি.আর. পি. সিস্ব-র জনমত জরিপ সমন্বয়কী ও সমাজ গবেষক জনাব হোসেন জিল্লুর রহমান এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নির্বাচন যখন হয় তখন অবশ্যই সারাদেশের সব মানুষই জরিপকারীদের বিবেচনার মধ্যে চলে আসে। আর এলাকাভিত্তিক যে বিভাজন আছে সেটা ধরার একটা চেষ্টা করতে হয়। সব সময় এই ধরনের সব বিভাজন বিবেচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে চেষ্টা করা প্রয়োজন- মূলত যেগুলো প্রধান বিভাজন যেমন পুরুষ, মহিলা বয়সভিত্তিক এবং পেশা বা শ্রেণীভিত্তিক। এই তিনটি প্রধান বিভাজনকে নমুনার মধ্যে না আনলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তা সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক হবে না। তাঁর মতে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা এবং তার পরে তথ্য বিশ্লেষণের অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক সময় নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে বিশেষ করে খুবই সতর্ক হতে হয় যে, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় যেন কোন ভুল না হয়। এজন্য তাদের সংস্থায় কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুবার তা যাচাই করা হয়। অধিকাংশ সময় প্রশ্নগুলোর কিছু পূর্ব-নির্ধারিত উত্তরের একটা তালিকা থাকে। এটা করার উদ্দেশ্য হলো এক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজ করতে অনেক বেশি সহজ হয়। আগে থেকে কম্পিউটারে একটি ছক তৈরি করে ফেলা হয়। তথ্য আসা মাত্রই তথ্যটা ছকে ঢুকানো হয়। তারপর তা বিশ্লেষণের পর্যায়ের চলে যায়। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের এক অংশ হয়ে যায় যখন প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় তখন। তাঁর মতে প্রাক-নির্বাচনকালে তাদের জরিপে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ছিল।যার একাংশ ছিল ভোটারের পছন্দ। আর একাংশ ছিল প্রার্থী পরিচিতি। জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনমত জরিপে ভুলের কারণ সম্পর্কে হোসেন জিল্লুর রহমানের অভিমত হল-প্রশ্নগুলো যদি সঠিক না হয় বিশেষ করে নমুনা নির্বাচন যদি সঠিক না হয় তাহলে যে উত্তর পাওয়া যাবে তাতে সঠিক ফলাফলের প্রতিফলন হবে না। এছাড়াও জরিপের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে ভুলগুলো হতে পারে তা হলো

www.pathagar.com

জনমত তো বেশ পরিবর্তনশীল। অতএব যে সময় জরিপ পরিচালিত হবে সে সেময় থেকে কিছু দিন পরে জনমত পাল্টে বা উল্টে যেতে পারে বিভিন্ন কারণে।

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার জরিপ

বেসরকারী সংস্থা ডেমোক্রেসি ওয়াচ এবার নির্বাচনের আগে মোট ৩ দফায় বাংলাদেশের কয়েকটি আসনে নির্বাচনী জনমত জরিপ চালায়। এই জনমত জরিপের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে একই আসনে তারা মোট ৩ বার করে জরিপ চালায়। উদ্দেশ্য ছিল সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনমতের ফলাফলের কোন পরিবর্তন হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। ডেমোক্রেসি ওয়াচের অঙ্গ সংস্থা সোশ্যাল সার্ভে সর্বশেষ গত ১ ও ২ জুন বাংলাদেশের ১২টি মার্জিনাল আসনে জনমত জরিপ চালায়। এই জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ১৯৯১ এর তুলনায় এবারকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিছুটা এগিয়ে আছে। রিপোর্টে বলা হয় '৯১-এর তুলনায় বিএনপির অবস্থানে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। এই রিপোর্টে একথাও বলা হয় যে জাতীয় পার্টির অবস্থানেরও উন্নতি হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জামায়াত। একথাও বলা হয় যে, সার্বিক পর্যালোচনায় আওয়ামী লীগও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে ছিল কৃষক ১৬%, শ্রমিক ১১%,অফিস কর্মচারী ১০% ব্যবসায়ী ২০%, পেশাজীবী ৪%, ছাত্র ১১%. বেকার ৩%, গৃহবধূ ২৪%, ও অন্যান্য ১%। সর্বশেষ জরিপে কাকে ভোট দেবেন এই প্রশ্নের উত্তরদাতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছিল ৩১%, বিএনপি ২৯% , জাতীয় পার্টি ১৭%, জামায়াত ৬%, রামফ্রন্ট ১%, অন্যান্য ২%। ভোট না দেবার সংখ্যা ছিল ১% ও জানি না ছিল ১৩%। ডেমোক্রেসি ওয়াচ অবশ্য কোন্ দল কতটি আসন পাবে সে বির্তকে যায়নি। তবে তাদের জরিপে বলা হয় যে বিএনপির পক্ষে গৃহবধূ, ছাত্র এবং নিরক্ষরদের অবস্থান ছিল বেশী।

একটি সরকারী সংস্থার রিপোর্টের সারমর্ম ছিল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাবে ১২৫ আসন বিএনপি ৯৫ জাতীয় পার্টি ৫৫ জামাত পাবে ২০ ও অন্যান্য দল পাবে ৫টি আসন।

পত্র-পত্রিকার জরিপ

নির্বাচন '৯৬কে ঘিরে অন্যান্যবারের মত এবারও একাধিক পত্র-পত্রিকা তাদের নিজস্ব জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এসব জরিপের ক্ষেত্রেও একটার সাথে অন্যটার কোন মিল নেই। পত্রিকাগুলোর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এসব জরিপের ফুটে উঠেছে। ফলে পত্রিকাগুলোর নিয়মিত পাঠক ছাড়াও সাধারণ ভোটারদের কাছেও এসব জরিপ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি।প্রভাবশালী বেশ কয়েকটি পত্রিকাগুলোর জরিপ ফলাফল ছিল নিম্নরূপ। নির্বাচনের আগে এসব জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা দেশব্যাপী তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা দিয়ে নির্বাচনী জরিপ পরিচালনা করে। ১১ জুন ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত এই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়

www.pathagar.com

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১২৬ বিএনপি ৮৩, জাতীয় পার্টি ৬৫ এবং জামাত ২১টি আসন পাবে। জাসদ (রব) ফ্রিডম পার্টি ও বামফ্রন্টও ১টি করে এবং স্বতন্ত্র ২টি আসনে জয় লাভ করবে।

দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা দেশব্যাপী তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক নির্বাচনী জরিপ চালায়। গত ১২ জর্ন মিল্লাত সর্বশেষ এই জরিপ রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। এই জরিপে বলা হয়েছিল নির্বাচনে বিএনপি ১৪৯, আওয়ামী লীগ ৭৬, জাতীয় পাটি ৪২, জামায়াত ১৭, ফ্রিডম পার্টি ৩, অন্যান্য ৪ এবং স্বতন্ত্র ৯ টি আসন পাবে।

দৈনিক রূপালী পত্রিকায় নিজস্ব জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয় আওয়ামী লীগ ১৫২, বিএনপি ৮৩, জাতীয় পার্টি ৫০ ও জামায়াত ১৩ টি আসন পাবে। দৈনিক সমাচার পত্রিকায়র জরিপে বলা হয়েছিল বিএনপি ১৩০, আওয়ামীগ ১০০, জাতীয় পার্টি ৪০, জামায়াত ১৫ ও অন্যান্য দল ১৫ টি আসন পাবে। সাপ্তাহিক জনতার ডাকের নিজস্ব জরিপে বলা হয়েছিল বিএনটি ১৫৮, আওয়ামী লীগ ৯৬, জাতীয় পাটি ২৮, জামায়াত ১২ এবং বাকি ৬টি আসন পাবে অন্যান্য দল ।

সাপ্তাহিক আজকের সূর্যোদয়-এর জরিপে বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ ৪২.৯% বিএনপি ৩৫.৫%, জাতীয় পার্টি ১৫.৫% জামাত ৪.৫% এবং অন্যান্য দল পাবে ২% ভোট। দৈনিক সংবাদ-এ জরিপে ফলাফল ছিল আওয়ামী লীগ ১৩৫ বিএনপি ১০৬ জাতীয় পার্টি ৩৯, জামায়াত ১৪ এবং অন্যান্য দল ৬টি আসন পাবে।

নির্বাচনী ফলাফল একনজরে

গত ১২ জুন সংসদের ৩০০ আসনের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ফলাফলে মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৪৬টি, বিএনপি ১১৫টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াত ৩টি, জাসদ (রব) ১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি আসন পেয়েছে। নির্বাচনপূর্ব ঘোষিত জনমত জরিপ বা জ্যোতিষীদের গণনার ফলাফলের সাথে বাস্তবতার মিল হয় না।

আমাদের দেশে সঠিক জরিপের বাস্তব ভিত্তি এখনো রচিতি হয়নি। জরিপের নামে একটি মহল সকলকে ধোঁকা দিয়ে সুচতুরভাবে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত জনমতকে করছে প্রভাবিত। এ ধরণের জরিপ রিপোর্ট বা জ্যোতিষীর বাণী পত্রিকায় ছাপানো উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। [রোববার/১৬.৬.৯৬]

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নির্বাচন-'৭৩ থেকে-'৯১

১৯৭৩ - এর সংসদ নির্বাচন ভোট কারচুপির অখণ্ড নজীর

পাকিস্তানের কাঠামোতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ এর শেষ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদে নির্বাচিত লোকদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করে তাতে ১৯৭২ এর সংবিধান পাশ করা হয়। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে ১৪টি দলের ১০৯১ জন প্রার্থী থাকলেও আওয়ামী লীগ শুরুতেই ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। বাকী ২৮৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১কোটি ৯৩ লাখ (৫৫%) প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ১ কোটি ৩৮ লাখ (৭৩%) ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ ২৮২ আসনে জয়ী হয়। আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগ ভেঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সৃষ্টি জাসদ ২৩৭ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সোয়া ১২ লাখ (৬.৫২%) ভোট আর ১টি আসন পায়। জাতীয় লীগ পায় ১টি আসন (আতাউর রহমান খান)। ১২০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫% ভোট ও ৫টি আসন লাভ করে।

ফিলিপ গাইনের বর্ণানুসারে প্রথম সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচনেই ১৯৭৩ সালে ভোট কারচুপির নজীর ব্যাপক প্রকৃতি লাভ করেছিল। আওয়ামী লীগের মোকাবেলা করার মত কোন প্রার্থী না থাকা সত্বে ও দলটি নির্বাচনী অসদুপায়ে ব্যাপৃত হয়। কমপক্ষে ১৫টি নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ মারদাঙ্গা,এজেন্ট হাইজ্যাক ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই এর কান্ড ঘটায়।

এ প্রবণতাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে অব্যাহত থাকে এবং ১৯৮৮ সালে এরশাদের নির্বাচনে ভোট কারচুপির ব্যাপকতা সকল কারচুপির ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়।

১৯৭৭- এর গণভোট ভোটার হাজিরা ৮৮.৫%!

১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান একটি গণভোটে তার ক্ষমতাকে বৈধকরণের জন্য জনসমর্থন চান। তাতে ৮৮ দশমিক ৫ ভাগ ভোটার ভোট দিতে আসে বলে সরকারী বার্তা সংস্থা প্রচার করে দেয়।

১৯৭৯-র সংসদ নির্বাচন সিলেকশন-ইলেকশনের মিশ্রণে বড়সড় বিরোধীদল

প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পর জিয়াউর রহমান রাজনীতিক হিসাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এ নির্বাচনে ৩ কোটি ৮৩ লাখ ভোটারের মধ্যে ১ কোটি ৯৭ লাখ ভোটার (৫০%) ভোট দিয়ে ছিল বলে হিসাব আছে। ২৯ টি দলের ২১২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩০০ আসনের

www.pathagar.com

সংসদের বিএনপিকে দেয়া হয় ২০৭ আসন। আওয়ামী লীগ (মালেক) ২৫% ভোট পেয়ে ৩৯ আসনে জয়ী হয়। আওয়ামী লীগ (মিজান) ০০.৩৬% ভোট পেয়ে ২টি আসন পায়, তার মার্কা ছিল মই, ওটা উর্ধ্বারোহনের আদিম যন্ত্র। মুসিলমলীগ ও আইডিএল ২৬৬ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০% ভোট ও ২০টি আসন পায়। জাসদ ২৪০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫% ভোট ও ৮টি আসন পায়। ন্যাপ (মো) কুড়েঘর নিয়ে সোয়া ২% ভোট ও কুল্লে ১টি আসন পায়। খালকাটায় অংশ নিলেও মনিসিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি এর কোন ভাগ পায়নি। গণফ্রন্ট ২ আসন, সাম্যবাদী দল ১ আসন, জাতীয় লীগ ২ আসন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১ আসন, একতাপার্টি ১ আসন পাবার পর বিএনপি প্রার্থীরা অভিযোগ করেন যে, সরকার তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজিত করে বিরোধীদলকে আসন দিয়েছেন, পূর্ব সাব্যস্ত বাটোয়ারার অংশ হিসাবে। ৪২২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ১০% ভোট ও ১৬টি আসন পায়। সব মিলিয়ে এটাই ছিল প্রথম বড় বিরোধী দল সজ্জিত সংসদ। ১৯৭৩ এ নির্বাচিত ৭ জন বিরোধী দলীয় এমপি সংসদে গ্রুপ গঠনের অনুমতি পাননি। আর ১৯৭৫ এর ২৫ শে জানুয়ারী বাকশাল নামক একদলীয় শাসন কায়েমের পর এ ৭ জনকে বাকশালের সদস্যপদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। তখন আওয়ামী লীগের ২ জন এমপি পদত্যাগ করে তার প্রতিবাদ জানান।

১৯৮১-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের জন্য রক্তশূণ্য প্রেসিডেন্ট সাব্যস্তকরণ

১৯৮১ র ৩০শে মে জিয়াউর রহমানকে কালো পোষাকধারী কম্যান্ডোরা হত্যা করে। জেনারেল এরশাদের তত্ত্বাবধানে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এরা ওপার বাংলা থেকে আগত পরিবারের লোক। ১৯৮১-র নির্বাচনে ৫৫ দশমিক ৪৭% ভোটার ভোট দিতে আসে। এ ভোটের সাড়ে ৬৫ ভাগ ভোট পেয়ে আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। কেন্দ্রেগুলোতে ভোট পড়ে যুক্তিযুক্ত পূর্ব সাব্যস্ত মাত্রায়। অনেক কেন্দ্রে ভোট গণণাকারীরা ভোট গণণার মধ্যেই তাদের কেন্দ্রের ফলাফল রেডিওতে প্রচারিত হতে শুনতে পান। ন্যাপ (মোঃ) এর মরহুম দবির উদ্দিন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে ভোট দেখার জন্য কেন্দ্রে যান। সেখানে অসহায় পোলিং অফিসারের অনুরোধে তাকেও সীল হাতে মুড়িবই নিয়ে বসে ইলেকশন প্রসেসে, বই এর পর বই এ সীল মারা কাজে সাহায্য করতে হয় বলে গল্প প্রচারিত আছে। এইভাবে বিচারপতি সাত্তার আওয়ামী লীগের প্রার্থী কামাল হোসেনকে পরাজিত করেন। সাত্তার জিয়ার উত্তরাধিকার রক্ষার কথা বলে প্রচার চালান। আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের অঙ্গীকারে ভোট চেয়েছিল।

এসব অনিয়ম নিয়ে ডঃ কামাল হোসেন নির্বাচন কমিশনে ফাইট করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮২ র ২৪ শে মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাত পোহাতেই সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে যাওয়ায় সেসব মামলার আর প্রয়োজন হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৮৬-র এরশাদ-হাসিনার নির্বাচন সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল

সফল গণভোট ধীমান এরশাদকে নির্বাচন আয়োজন করে তার সরকারের বৈধতা অর্জনের সুযোগ খুজতে উৎসাহিত করে। তিনি ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলেন।১৯৮৬-র ১লা জানুয়ারী রাজনীতিকে ঘরের দুয়ার ছাড়তে আজ্ঞা দিলেন। তাতে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে তেজী রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। তিনি ধরে নিলেন বিক্ষোভের একাংশ তাঁকে সংসদ নির্বাচন করতে বলছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তখন বড় দুই রাজনৈতিক দল। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন চাইলেন। এরশাদ কিছু কনসেশন দিয়ে২৬ এপ্রিল নির্বাচনের দিন স্থির করলেন। ৩০০ আসনে ১৫০ ঃ ১৫০ করে দুইনেত্রী বা দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা মুসাবিদা খাড়া করে আওয়ামী লীগ। তাতে বিএনপির কোন কোন নেতার সায় ছিল বলে আওয়ামী লীগ দাবী করলো। একদিন রাতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বসলো। তখন কয়েক ঘন্টার জন্য খালেদা জিয়ার কোন অবস্থান জানা গেল না। বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দল ও বামগ্রস্থ ৫ দল ৮৬ র নির্বাচন বর্জন করে এরশাদ উত্তর রাজনীতি হস্তগত করার চেষ্টায় নামলেও আওয়ামী লীগ কেন নির্বাচনে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার খানিকটা পর্ব ডঃ কামাল হোসেনের জানা আছে।

নির্বাচন হয়েছিল রাম দা উঁচিয়ে, বন্দুক ও বল্লম হাতে ভোট কেন্দ্র থেকে প্রতিপক্ষকে তাড়া করার এক চর দখলের লড়াই-এর মত। ঢাকার ডেমরা থেকে ডঃ কামাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে একজন এরশাদভক্ত তরুনের কাছে পরাজিত হন। এখানে রাস্তাঘাট মাঠ ধূলি ধূসরিত করে পাইক বাহিনী এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যেন, ইরাকের মরু প্রান্তরে লড়াই চলছে। ভীতি প্রদর্শন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, চরম নৈরাজ্য ছিল এর বৈশিষ্ট্য। ১৫ জন মানুষ খুন করে, ৭৫০ জনকে হাতপা কেটে, পেট ফেঁড়ে, মাথা গুড়ো করে দু'দলই দু'দলকে বললো, ভোট ডাকাত। ভোটারদের আতঙ্ক ছিল এমনি প্রবল, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগরে সাংবাদিকরা দেখলেন, ভোট কেন্দ্রে গমন দূরে থাক, জনগণ নিজ বাড়ী ঘর থেকে বাইরে বেরুতেও সাহস করেনি।

পুলিশ ছিল এ নাটকের নীরব দর্শক। নির্বাচন কারচুপি, ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু-এর মত শব্দরাজনীতিতে হাজির হলো।

৫৪ ভাগের বেশী ভোটার ভোট দিয়েছিল বলে দেখানো হয় এ নির্বাচনে। এর মধ্যে ৮৩/৮৪ ভাগ ভোটই এরকম নিজের দলের পক্ষে বাক্সে ভরে ছিলেন। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের অনুমান, প্রকৃত পক্ষে ১৫ ভাগের বেশী ভোটার ভোট কেন্দ্রের ধারে কাছে আসেনি। এটা আসলেই ছিল আদিম, হিংসা অমানবিকতার অবাধ নির্বাচন।

৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১ কোটি ২১ লাখ ভোট নিয়ে ১৫৩ আসনে জিতে যায় জাতীয় পার্টি। ২৫৬ আসনে নেমে ৭৫ লাখ ভোট মেরে (২৬%) আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ ৭৬ আসন পায়। ১লাখ ভোট (৪%) ও ১০টি আসন পায় জামাত। মনিসিংহের কম্যুনিষ্ট পার্টি আড়াই লক্ষ ভোট ও ৫টি আসন লাভ করে। মো-ন্যাপ পায় ২, ন্যাপ ৫, বাকশাল ৩, জাসদ,৪, জাসদ (সিরাজ) ৩, মুসলিম লীগ- ৪, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩, স্বতন্ত্ররা ৩২ আসন পান।

এরশাদের এ সুখের ঘর তার ক্ষমতার জন্য কাল হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে নেতা হত্যার বদলে সরকার হত্যার রাজনীতি ডেকে আনলো এ নির্বাচন।

১৯৭৮- প্রেসিডেন্ট নির্বাচন রাজনীতিতে এনজিওর প্রথম হস্তক্ষেপ

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসন থেকে সংবিধান সম্মত প্রেসিডেন্ট পদে উত্তরণের জন্য জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্থপতি জেনারেল (অবঃ)ওসমানী এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এনজিওদের গড়া নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসাবে। এ নির্বাচনে ভোটার হাজির হয় ৫৪%। জিয়াউর রহমান নিজপক্ষে ৭৭ ভাগ ভোট নিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

১৯৮৮-র নির্বাচন এরশাদের নিঃসঙ্গ সার্কাস

১৯৮৬-র ভোট ডাকাতির নির্বাচনে গড়া এরশাদের সুখের ঘর বেশী দিন স্থায়ী হলো না। ১৯৮৭ সালেই আসলে ১৯৯০ এর মত গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা ও নকশা করে ফেলেছিলেন বিএনপির মোস্তাফিজুর রহমানেরা। কিন্তু তাতে গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি, তবে সুখের সংসদ ছেড়ে বিরোধীদল বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বেরিয়ে আসার আগে একটা পার্লামেন্টারী ক্যু ঘটানোর চেষ্টা চলে। ১৯৮৭-র মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। ৮৭-র নভেম্বর ও ডিসেম্বরে হরতাল, ষ্ট্রাইক, অবরোধ, বিক্ষোভের মুখে এরশাদ বিরোধী দলের দুই নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে স্বগৃহে অন্তরীন করেন। ১৯৮৭-র ২৭ শে জুন দেশে ইমার্জেন্সী জারী হয়। ১৯৮৭-র ৬ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে এরশাদ সংসদ হতে বিরোধী দলের পদত্যাগ বন্ধ করেন। এ সময় ঘোষিত হয় যে , ১৯৮৮-র ৩রা মার্চ ৪র্থ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এবার যথাবিহিত বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত ১৯৮৮-র সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। জাতীয় পার্টি ১৯৯৬ -র ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে সে বর্জনের প্রতিশোধ নিয়েছে বলেই কোন কোন মহল মনে করেন।

১৯৮৮-র নির্বাচনে নির্বাচনী প্রথার উপরেই মানুষের কোন বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল না। সিরাজুল আলম খানের তৈরী কিছু বাঘের বাচ্চা দিয়ে সার্কাস দেখানোর জন্য একটি দলকে এরশাদ এ নির্বাচনে নামান ও বিরোধী দলের দায়িত্ব দেন। ৮টি রাজনৈতিক দলের ৯৭৭ জন প্রার্থী ২১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রকৃত ভোটার হাজিরা ছিল ১%-এর সামান্য কিছু বেশী। নির্বাচন কমিশন নামক বিচারপতি চালিত যন্ত্রটা দাবী করে ৫৫% মানুষ ভোট দিয়ে গেছে। জাতীয় পার্টি ২৫১ সীট হাত করে। অজ্ঞাত পরিচয় ৭৬ টি রাজনৈতিক দল নিয়ে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী আসম রব ৩২ লাখ ভোট ও ১৯টি আসন পান, স্বতন্ত্র এমপি হয় ২৫ জন, ফ্রিডম পার্টি ২ ও শাজাহান সিরাজ ৩ আসনে আসেন।

একটা হরতাল ডাকা হয়েছিল নির্বাচনের দিনটিতে। রাস্তায় যানবাহন ও লোক ছিল না। জাতীয় পাটির লোকজন নিয়ে প্রার্থীরা একেক কেন্দ্রে গিয়ে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে বই টেনে সিল মেরে যান। আওয়ামী লীগ ত্যাগী কোরবান আলী সে কাজটি করার সময় ঢাকায় আপেল মার্কার এক ফিলিস্তিন প্রত্যাগত প্রার্থী তার প্রতিবাদ জানান এবং চীৎকার করেন, ইউ ওল্ড হ্যাগার্ড। নোদ্য কনসিকিউয়েন্সসী হোয়াট হেপেন্স । মুখের ওপর এ উচ্চারণের পর আড়াই পাউণ্ডের বারুদের ডিব্বার বিস্ফোরণে মোহাম্মদপুর সাদা ধূয়ায় ভরে গিয়েছিল। মনে হলো, হিউষ্টন থেকে কোন রকেট আকাশে উঠলো সবে। কোরবান আলী কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সীল মারা হলো। তারপর বেরিয়ে যাবার সময় বললেন, পুওর বয়!

এ সংসদে এরশাদ সংসদের ৮ম সংশোধনী পাশ করেন। তাতে হাইকোর্টের একত্বের বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা হয়। রাষ্ট্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৮-র বন্যা এরশাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক খেলোয়াড় ও নিম্নমধ্যবিত্ত কর্মী এবং পুরাতন গাড়ী কলম-চশমা সর্বস্ব বিদ্যাপতি গোছের চরিত্রগুলো প্রকাণ্ড নিনাদে তার ভোট ও সম্পদ ডাকাতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে অগ্রসর হয়। এ আন্দোলন ছিল এরশাদ পতনের। এরশাদ পতনের ফলাফল কার হাতে যাবে এটাই ছিল বিরোধী দলের দ্বিধা। একসময় সে দ্বিধা দূর হয়। ভার্সিটিকে থিয়েটার বা রণাঙ্গন করে শেষ অপারেশনে এরশাদকে আকার্যকর করে দেওয়া হয়। এবং তিনি ৯ বৎসরের মহান শাসন ত্যাগ করে ৬ ই ডিসেম্বর, ৯০ সালে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশে সামরিক সরকার, রাজনৈতক সরকারের পর, বিচারপতি- অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীদের একটা সরকার দৃশ্যপটে আসে।

৯১-র নির্বাচন সুন্দর ভোটাভুটির পর সংঘাতের জাহান্নাম

১৯৯১-র ২৭শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বিচারপতি ও প্রশাসক শাহাবুদ্দিন আহমদের দক্ষ প্রশাসনের অধীনে সম্পন্ন ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ ও তাঁর দলকে বিচারাধীন ও বিপন্ন করে যে দুটো দলকে এ নির্বাচনে প্রশ্রয় দেয়া হয়, সে দুটো দল বাংলাদেশকে গত ৫ বৎসরে দূর্নীতি ও সন্ত্রাসে প্রায় হাবিয়ার দোযুখে পরিণত করেছে। ১৯৫৪, ১৯৭৪, আর ১৯৯৫-র পরিস্থিতি বাংলাদেশে রাজনৈতিক শাসনের ভয়াল অভিশাপে মলিন। তবে ৯১ সালের নির্বাচন

www.pathagar.com

মওসুমী কাঁঠালের মত ছিল স্বাদু। এ নির্বাচনে কেয়ারটেকারের আবির্ভাব ঘটে। এবং ৯৬'র একতরফা সংসদ তাকে স্থায়ী করে যায়।

৯১ সালে ৭৬ টি দল ২৩৫০ জন প্রার্থী দাঁড়া করায়। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল ৪২৪। ৩০ আসন মহিলা আসন থাকায় জামায়াত ২ আসনের বিনিময়ে বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছিল সরকার গঠনে। কিন্তু বিএনপি এটাকে নিয়ে ক্ষমতার ব্যবসা ফেঁদেছে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৭২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩৫ আসন পায়। এরশাদ ও খালেদা ৫টি করে আসনে জয়ী হন।

৯১-র নির্বাচনে ফলাফল আসে নিম্নরূপঃ

বিএনপি	১৪০
আওয়ামী লীগ	৮৮
জাপা	৩৫
জামায়াত	১৮
সিপিবি	৫
বাকশাল	৫
স্বতন্ত্র	৩
মো- ন্যাপ	১
গণতন্ত্রী পার্টি	১
ওয়ার্কার্স পার্টি	১
জাসদ সিরাজ	১
ইসলামী ঐক্যজোট	১
এনডিপি	১

মোট ভোটের ১৭% প্রদত্ত ভোটের ৩১% পেয়ে বিএনপি ৪৭% আসন পায়। মোট ভোটের সাড়ে ১৬ ভাগ, প্রদত্ত ভোটের ৩০ ভাগ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ৩০%-এর কিছু কম আসন পায়। মোট ভোটের সাড়ে ৬ ভাগ ও প্রদত্ত ভোটের ১২ বাগের বেশী ভোট পেয়ে জামায়াত ৬ ভাগ আসন পায়।

এ নির্বাচনে ৫৫ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ৬ কোটি ২২ লাখ ভোটের মধ্যে বৈধ প্রদত্ত ভোট দাঁড়ায় ৩ কোটি ৪১ লাখ। বিএনপি পায় ১ কোটি ৫ লাখ ভোট। আওয়ামী লীগ ১ কোটি ২ লাখ ভোট। জাতীয় পার্টি সাড়ে ৪০ লাখ ভোট, জামায়াত সাড়ে ৪১ লাখ ভোট । [রাষ্ট্র ১৩-৬-৯৬]

www.pathagar.com

নিবাচন '৯৬ ঃ দলগত অবস্থান

সালাউদ্দিন বাবর

এবার ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসন ও ভোট দুটোই বেড়েছে। আওয়ামী লীগ এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮২ টিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এর মধ্যে ১৪৬টি আসনে বিজয়ী হয় আর ১৩৬ টি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ২১৪টি আসনে আর এর মধ্যে ১০৭ আসনে আওয়ামী লীগ এবং সমসংখ্যক আসনে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে। ৯১ সালের তুলনায় আওয়ামী লীগের তুলনায় আওযামী লীগের আসন ৪৬টি আর ভোট বেড়েছে শতকরা ৪ ভাগ। জাতীয় পার্টির আসন গত নির্বাচনের তুলনায় ৩টি কমলেও তাদের ভোট বেড়েছে ৪ ভাগের মত গত নির্বাচনে ৩শ আসনেই প্রার্থী দিয়ে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩০.৮১ ভাগ পেয়েছিল বি,এন,পি । ভোটের দিকে থেকে গত নির্বাচনে বিএনপি দ্বিতীয় ছিল। তবে আসন প্রাপ্তির দিক থেকে ছিল প্রথম। '৯৬ এর এই নির্বাচনে বিএনপি প্রায় শতকরা ৩৩.৫০ ভাগ ভোট পেয়েছে। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা (যারা নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিল ভোট পেয়েছিল ৩৩.৭৩ ভাগ। আর এবার আওয়ামী লীগ পেয়েছে শতকরা ৩৭.৫৩ ভাগ ভোট। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকেও বিএনপি ৯১ সালের তুলনায় ভাল করেছে। সে নির্বাচনে বিএনপি ১৪০ আসনে বিজয়ী হয়েছে এবং ৫৭টি স্থানে দ্বিতীয় হয়েছিল। অর্থাৎ তারা মোট ১৯৭ টি আসনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এবার বিএনপি ১১৬ আসনে বিজয়ী এবং ১১৪ আসনে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ বিনপি '৯১ সালের তুলনায় এবার ৩৩টি বেশী আসনে প্রর্ভাব বৃদ্ধি করেছে এবার '৯১ সালের তুলনায় জামায়াত এবার আসন ও ভোট দুটোই কম পেয়েছে। আসলে এবার নির্বাচনে জামায়াতের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। জামায়াতের বিপর্যয়ের পিছনে নানাবিধ কারণ কাজ করেছে। আমরা এখানে '৯৬ সালের নির্বাচনে ৪ দলের অবস্থান তুলে ধরলাম।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিভাগ

পঞ্চগড় -১

ভোটের সংখ্যা- ২০০৪৬৭, মোট বৈধ ভোট- ১৬২১৬১

আবদুল খালেক (জামায়াত)	১৬৩৫৬
নূরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৮০৯২
জমির উদ্দিন সরকার (বিএনপি)	৫৭৪৩৩
শফিউল আলম প্রধান (জাতীয় পার্টি)	৩৮০৮৫

পঞ্চগড়-২

ভোটার সংখ্যা- ১৭৬৪৫৬ মোট বৈধ ভোট- ১৩৫৩৪২

মওলানা সাইদুর রহমান (জামায়াত)	১২৫৫৭
সিরাজুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৬৮১৫
মোজাহার হোসেন (বিএনপি)	৪৮৫৩৪
কামিজ উদ্দিন (জাপা)	২৫৬৩০

ঠাকুরগাঁও-১

ভোটার সংখ্যা- ২৩৫৭৫০ মোট বৈধ ভোট- ১৮২৬৫৮

রফিকুল ইসলাম (জামায়াত)	১৭২৪২
খাদেমুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৬২৭০৯
মির্জা ফখরুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৮৩৬৯
নূরুল হক (জাপা)	৪২৬০৯

ঠাকুরগাঁ-২

ভোটার সংখ্যা- ১৫১৮৪৪ মোট বৈধ ভোট- ১১৪৪০৯

আব্দুল হাকিম (জামায়াত)	১৪৯৩৩
দবিরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৮৩৪৪
জুলফিকার মর্তুজা (বিএনপি)	২১৩১৪
আসাদুজ্জামান (জাপা)	২৮৭৫৭

ঠাকুরগাঁও-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৬৪৮৭৯ মোট বৈধ ভোট- ১২৭৬২৩

মিজানুর রহমান (জামায়াত)	৮০৮১
ইমদাদুল হক(আঃ লীগ)	৫৫৯৫৩
আব্দুল মালেক (বিএনপি)	৯০৬০
ইকরামুলহক (জাপা)	৫২৩৪২

দিনাজপুর-১

ভোটার সংখ্যা- ১৮৯৮১৯ মোট বৈধ ভোট- ১৪৩৮৯৩

মাহবুব আলম (জামায়াত)	১৩৬৬৩
সতীশ চন্দ্র রায় (আঃ লীগ))	৫৫৫৫১
এম, এ, জলিল (বিএনপি)	২৪০৪৪
রিয়াজুল হক (জাপা)	৪৭৬১১

দিনাজপুর- ২

ভোটার সংখ্যা- ১৭৬৪৩০ মোট বৈধ ভোট- ১৪৩০১৬

আবদুল্লা আল কাফী (জামায়াত)-	১৯৪৬৩
আবদুর রউফ (আ' লীগ)-	৬০৬৮১
সৈয়দ আহমদ রেজা হোসেন (বিএনপি)-	৩২৪৩৭
মনোরঞ্জন শীল গোপাল (জাপা)-	২৯৫৮৩

দিনাজপুর- ৩

ভোটার সংখ্যা- ১৯৩৩১৫ মেন্ট বৈধ ভোট- ১৫২২৮৫

মওঃ মুজিবুর রহমান (জামায়াত)	১৩৩৯৬
আবদুর রহীম (আঃ লীগ)	৪৯৮৫৭
খুরশীদ জাহান হক (বিএনপি)	৫১৮০২
মোখলেছুর রহমান (জাপা)	৩৪৯৩১

দিনাজপুর-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৯৩৫৮৩ মোট বৈধ ভোট-১৪৫২৫৪

আফতাব উদ্দিন মোল্লা (জামায়াত)	৩০০৪০
মিজানুর রহমান মানু (আঃ লীগ)	৫৯৭৪৬
আব্দুল হালিম (বিএনপি)	৪৪৩৯৪
মির্জা সামছুল ওয়াজেদ (জাপা)	১০৭০০

দিনাজপুর-৫

ভোটার সংখ্যা- ২২৮৯৭৮ মোট বৈধ ভোট-১৭৭২৮৫

ডাঃ এম, এ, কাইয়ুম (জামায়াত)	১২৮২৭
মোস্তাফিজুর রহমান (আঃ লীগ)	৭১৩৬৩
রেদওয়ানুল হক (বিএনপি)	৪২৮১১
আব্দুল ওয়াহাব (জাপা)	৪৯১৫৩

দিনাজপুর- ৬

ভোটার সংখ্যা- ২৬৫২৩৭ মোট বৈধ ভোট- ২০৬৬১৯

মওঃ আজিজুর রহমান (জামায়াত)	৩৩৯৩৪
মোস্তাফিজুর রহমান (আঃ লীগ)	৭৫২৬৮
আতিউর রহমান (বিএনপি)	৬২৪৯৫
মনছের আলী (জাপা)	৩২৩৫২

নিলফামারী-১

ভোটার সংখ্যা- ২০৩৬৫১ মোট বৈধ ভোট- ১৫০৫৫৮

ইসহাক আলী (জামায়াত)	১৯১৩৭

www.pathagar.com

আবদুর রউফ (আঃ লীগ)	৪৭৮৩৬
শাহরিন ইসলাম (বিএনপি)	২০৬৭২
এস কে, আলম (জাপা)	৬০৪৪০

নিলফামারী-২

ভোটার সংখ্যা- ১৭৫৩০৭ মোট বৈধ ভোট- ১৩৫০৪২

আবদুল লতিফ (জামায়াত)	৩২২৭৮
জয়নাল আবেদীন (আঃ লীগ)	৪৪৫৬০
দেওয়ান নুরুন্নবী (বিএনপি)	১১৬১৫
আহসান আহমদ (জাপা)	৪৪৯৯৯

নিলফামারী-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৬৩৯৫৪ মোট বৈধ ভোট- ১১৯৮৫০

মিজানুর রহমান চৌধুরী (জামায়াত)	৩৭৫৪৬
আজাহারুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৩৪৪৩৯
আনোয়ারুল কবির (বিএনপি)	৮৭০২
রশিদুল আলম (জাপা)	৩৫৬০০

নিলফামারী-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৮০১৭৩ মোট বৈধ ভোট- ১৩৬০৬২

মোজাম্মেল হক শাহ (জামায়াত)	১৪০৪৩
মোখলেছুর রহমান (আঃ লীগ)	৪১০৫৩
আমজাদ হোসেন (বিএনপি)	২০৭৮০
ডঃ আসাদুর রহমান (জাপা)	৫৭২৬৫

লালমনির হাট-১

ভোটার সংখ্যা- ১৮৩১৯০ মোট বৈধ ভোট- ১৩৮৭৮২

ইউনুস আলী (জামায়াত)	১৭৭১০
মোতাহার হোসেন (আঃ লীগ)	৫৩১৮৯
হাসানুজ্জামান (বিএনপি)	৮৩৮৪
জয়নুল আবেদীন (জাপা)	৫৮৪৭৮

লালমনির হাট-২

ভোটার সংখ্যা- ১৯৫৩৮৮ মোট বৈধ ভোট- ১৩৭০২২

শামসুল হক (জামায়াত)	১১৭১৩
নুরুজ্জামান (আঃ লীগ)	৪৯৬৮৩
আব্দুল মান্নান (বিএনপি)	১৪৩৯৯
মজিবুর রহমান (জাপা)	৫৭৮০৪

লালমনির হাট-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৪৬৫৬৯ মোট বৈধ ভোট- ১১০৭৩৪

মোশাররফ হোসেন খঃ (জামায়াত)	১৮২৯
আবু সালেহ (আঃ লীগ)	৩০৯৯৫
আসাদুল হাবিব (বিএনপি)	৩৬৮৮১
গোলাম মোহাম্মদ (জাপা)	৩৯৭৫৫

রংপুর-১

ভোটার সংখ্যা- ১৭৬৫১১ মোট বৈধ ভোট- ১২১২৯৪

শাহ রুহুল ইসলাম (জামায়াত)	২৫৯২৩
মেজবাহ উদ্দিন (আঃ লীগ)	২৮৩৭৩
মোঃ জাফর (বিএনপি)	৩৬১০
সরফুদ্দিন আহমদ (জাপা)	৬১৩৭৩

রংপুর-২

ভোটার সংখ্যা- ১৮১৬৫৫ মোট বৈধ ভোট- ১৪০৩৩৩

এ, টি, এম,আজাহারুল ইসলাম (জামায়াত)	৮২৭৩
আনিছুল হক (আঃ লীগ)	৫৫৮০০
পরিতোষ চক্রবর্তী (বিএনপি)	৪০২৫
এইচ এম এরশাদ (জাপা)	৬৬৯২৯

রংপুর-৩

ভোটার সংখ্যা- ২১৮৫৫৭ মোট বৈধ ভোট- ১৫২৩৯০

মাহবুবুর রহমান বেলাল (জামায়াত)	৭৮৯০
সিদ্দিক হোসেন (আঃ লীগ	২৮৩০৫
কাজী তারেক (বিএনপি)	৬০১০
এইচ এম এরশাদ (জাপা)	১০৫৫৯০

রংপুর-৪

ভোটার সংখ্যা- ২২৫৬৪৮ মোট বৈধ ভোট- ১৮২২৫১

মওঃ মমতাজ উদ্দিন (জামায়াত)	২৩৬২৩
মহসীন আলী (আঃ লীগ)	৪০০৭৬
করিম উদ্দিন (বিএনপি)	৩০৯০৮
রহিম উদ্দিন (জাপা)	৮৪৩৭৭

রংপুর-৫

ভোটার সংখ্যা- ২২৮৮৩৪ মোট বৈধ ভোট- ১৬৯৫৭০

আবু মোজাফফর আহমদ (জামায়াত)	২৪৫৪১
আশিকুর রহমান (আঃ লীগ)	৫০৮৩৯
নূরুল হুদা (বিএনপি)	৩৩০৫
এইচ এম এরশাদ (জাপা)	৮৭৩৮৭

রংপুর-৬

ভোটার সংখ্যা- ১৭০৬৮৯ মোট বৈধ ভোট- ১১৬৫৬৯

আব্দুল সালাম প্রধান (জামায়াত)	৭৫৭৭

www.pathagar.com

মতিয়ার রহমান চৌঃ (আঃ লীগ)	৩৭৬৬১
মতিউর রহমান (বিএনপি)	৯০৬৭
এইচএম এরশাদ (জাপা)	৬০৬৬৫

কুড়িগ্রাম-১

ভোটার সংখ্যা- ২৫০০০৩ মোট বৈধ ভোট- ১৬৭৩২০

কামরুদ্দিন (জামায়াত)	১৬৪০১
মোজাম্মেল হক (আঃ লীগ)	৪২১২৫
সাইফুর রহমান (বিএনপি)	৩৯০৭৮
মোস্তাফিজুর রহমান (জাপা)	৬৪০৬৪

কুড়িগ্রাম-২

ভোটার সংখ্যা- ২৬৩৪৪৩ মোট বৈধ ভোট- ১৯১২৩৪

আ.ন.ম. সোলায়মান (জামায়াত)	৭৭১৯
জাফর আলী (আঃ লীগ)	৭২৯৬২
মাঈদুল ইসলাম (বিএনপি)	২০০১৭
তাজুল ইসলাম (জাপা)	৮২১৫৮

কুড়িগ্রাম-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৮০৭৬৬ মোট বৈধ ভোট- ১১২১৯৪

মওঃ আব্দুল কুদ্দুস (জামায়াত)	৩৪৭৫
আমজাদ হোসেন (আঃ লীগ)	২০৪০৮
মাঈদুল ইসলাম (বিএনপি)	১৮৬৬২
এইচএম এরশাদ (জাপা)	৬৭২৬২

কুড়িগ্রাম-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৬১৯৭৬ মোট বৈধ ভোট- ১০৫৬২১

সিরাজুল হক (জামায়াত)	১৭০৬৪
শওকত আলী (আঃ লীগ)	২১৫১৪
আব্দুল বারী (বিএনপি)	১২৬৯৮
গোলাম হোসেন (জাপা)	৪২৭৯০

গাইবান্ধা-১

ভোটার সংখ্যা- ১৯২১৩৫ মোট বৈধ ভোট- ১২৯৫৬৪

মওঃ আব্দুল আজিজ (জামায়াত)	৩৮১৪৫
মোসলেম আলী (আঃ লীগ)	২৮৩৭৪
জাকারিয়া হোসেন (বিএনপি)	২৯১৪
ওয়াহেদুজ্জামান (জাপা)	৫৭৩১৮

গাইবান্ধা-২

ভোটার সংখ্যা- ১৯৫৩১৬ মোট বৈধ ভোট- ১৪১২৭১

আমিনুল হক (জামায়াত)	১৫২৯৯
লুৎফর রহমান (আঃ লীগ)	৩৯৮৬০
আজগর আলী(বিএনপি)	১২৭৬০
আঃ রশীদ (জাপা)	৬৯৩৭০

গাইবান্ধা-৩

ভোটার সংখ্যা- ২৪৬৮০৫ মোট বৈধ ভোট- ১৭৬০৯০

মওঃ নজরুল ইসলাম (জামায়াত)	৩০২৬৪
নজরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৭৯৩৭
বদরুল ইসলাম (বিএনপি)	৯১২১
ফজলে রাব্বী (জাপা)	৮৫০২৭

গাইবান্ধা-৪

ভোটার সংখ্যা- ২৩২৫২২ মোট বৈধ ভোট- ১৭৩২২০

আফাজ উদ্দিন আহমদ (জামায়াত)	২৫২৭৮
তোজাম্মেল হোসেন (আঃ লীগ)	৪৮৯১৯
আঃ মান্নান (বিএনপি)	১৯৮৬০
লুৎফর চৌধুরী (জাপা)	৬৭৪১৯

গাইবান্ধা -৫

ভোটার সংখ্যা- ১৮৫৩০৫ মোট বৈধ ভোট- ১৩৪১০৫

সলিম উদ্দিন বেপারী (জামায়াত)	১০০৭৭
হাবিবুর রহমান (আঃ লীগ)	৪০৪৭৮
মতিয়ুর রহমান (বিএনপি)	১৩১৮৮
ফজলে রাব্বী (জাপা)	৬৯০৯৪

জয়পুর হাট- ১

ভোটার সংখ্যা- ২৫১৫৭৫ মোট বৈধ ভোট- ২১১২৯৪

আব্বাস আলী খান (জামায়াত)	৩৭৭১৩
আব্বাস আলী মণ্ডল (আঃ লীগ)	৬০৭৬৮
আবদুল আলীম (বিএনপি)	৯০৭১৩
আঃ হাকিম (জাপা)	২০৪১৫

জয়পুর হাট- ২

ভোটার সংখ্যা- ১৯২৬৮৩ মোট বৈধ ভোট- ১৬০৪৫৫

অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন (জামায়াত)	১৪৮৫০
মির জালালুর রহমান (আঃ লীগ)	৩৯২৬৭
খলিলুর রহমান (বিএনপি)	৭৬৮৫৭
রাব্বিউল হাসান (জাপা)	২৮৭৫৪

বগুড়া- ১

ভোটার সংখ্যা- ২০৩২৩৯ মোট বৈধ ভোট- ১৪৬৩৯৪

শাহাবুদ্দিন (জামায়াত)	১৩০০৭

www.pathagar.com

আবদুল হান্নান (আঃ লীগ) ৩৫৮৮৯
হাবিবুর রহমান (বিএনপি) ৯২৫৪৩
আবদুল মোমেন (জাপা) ৪৪৫৬

বগুড়া-২

ভোটার সংখ্যা- ১৭৮৮৬৮ মোট বৈধ ভোট- ১৪৪১২২
মওঃ শাহদাতুজ্জামান (জামায়াত) ২৪৫৯৩
মাহমুদর রহমান মোল্লা (আঃ লীগ) ১৯৮৭১
হাফিজুর রহমান (বিএনপি) ৭৪৩৪৫
শরিফুল ইসলাম (জাপা) ২১৫১৮

বগুড়া-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৭৩৪১৯ মোট বৈধ ভোট- ১৪৮৮৫৫
মোফাজ্জল হক (জামায়াত) ২৪৬২৪
সোলায়মান আলী (আঃ লীগ) ৩৫৯২৩
আঃ মজিদ (বিএনপি) ৬৫১৪০
এ,বি, এম শাহজাহান (জাপা) ২২২৭৬

বগুড়া-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৮১৭০০ মোট বৈধ ভোট- ১৪৯৯৫১
নাজির আহমদ মন্ডল (জামায়াত) ৩২৬২৫
শহীদুল আলম (আঃ লীগ) ৩৮৩৯৫
জিয়াউল হক (বিএনপি) ৬৪১৪১
মামদুদুর রহমান (জাপা) ১২৮৫০

বগুড়া-৫

ভোটার সংখ্যা- ২৮৩২৬৬ মোট বৈধ ভোট- ২২৮৮৭৯
মঞ্জুরুল হক (জামায়াত) ২৩৫৪২
ফেরদৌস জামান মুকুল (আঃ লীগ) ৮৮০৫৯
মোঃ সিরাজ (বিএনপি) ১১৪৮৪৩
ফেরদৌস আলম (জাপা) ৭৭৮

বগুড়া- ৬

ভোটার সংখ্যা- ২৯৬৮১৭ মোট বৈধ ভোট- ২৩২০৭৫
গোলাম রব্বানী (জামায়াত) ৪৬৯১৭
মাহমুদুল হাসান (আঃ লীগ) ৩৬৭৪৭
খালেদা জিয়া (বিএনপি) ১৩৬৬৬৯
জাকারিয়া খান (জাপা) ১০১৮৫

বগুড়া-৭

ভোটার সংখ্যা- ১৮৭৪৪২ মোট বৈধ ভোট- ১৪৯০২১
ফজলে রাব্বী (জামায়াত) ১৫৬৭৮
ওয়ালিউল হক (আঃ লীগ) ২৫২৭৮
খালেদা জিয়া (বিএনপি) ১০৭৪১৭

নবাবগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা- ২৩৩০৪৬ মোট বৈধ ভোট- ২০০৭৩০
নজরুল ইসলাম (জামায়াত) ৭৪১৪৪
কাইয়ুম রেজা (আঃ লীগ) ২৯৫৬৮
শাজাহান মিঞা (বিএনপি) ৯৩১১৯
মাইনুল হক (জাপা) ১৩১৭

নবাবগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা- ২০৩৭৮৮ মোট বৈধ ভোট- ১৮০৪২৩
মওঃ মীম ওবায়দুল্লাহ (জামায়াত) ৩৩৩৫৬
আবদুল খালেক (আঃ লীগ) ৫৭৩৫৮
মঞ্জুর হোসেন (বিএনপি) ৭৭৬৭৩
আঃ মালেক (জাপা) ১০৪৫৬

নবাবগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা- ২১৬৩৬৩ মোট বৈধ ভোট- ১৮৫৬৯৬
লতিফুর রহমান (জামায়াত) ৪৭০৪৮
নাসিরুদ্দিন (আঃ লীগ) ৩৫৮৩৬
হারুনুর রশিদ (বিএনপি) ৭৭৯২৯
রুহুল আমীন (জাপা) ১৬১৯০

নওগাঁ-১

ভোটার সংখ্যা- ২২০৩৫৪ মোট বৈধ ভোট- ১৭৮০০৮
সালেকুর রহমান (জামায়াত) ২৭৮৬০
সাধন মজুমদার (আঃ লীগ) ৫৯৯৭৫
সালেক চৌধুরী (বিএনপি) ৭০০৪১
রুস্তম আলী (জাপা) ১৬০০৪

নওগাঁ-২

ভোটার সংখ্যা- ১৯১৩৫৪ মোট বৈধ ভোট- ১৫৯৯৫৪
মঈনুদ্দীন (জামায়াত) ২৩৭৯০
শহিদুজ্জামান সরদার (আঃ লীগ) ৫৫১৯৯
আখতার হামিদ (বিএনপি) ১০৫২২৫
তৈয়ব উদ্দিন (জাপা) ৭৯৭৩

নওগাঁ-৩

ভোটার সংখ্যা- ২৩৮০৮৭ মোট বৈধ ভোট- ২০৩২২৩
ডাঃ আজিজুর রহমান (জাপা) ১৭১৭০

www.pathagar.com

মোঃ সামছুজ্জোহা খান (বিএনপি)	৬২৫৯০
দেওয়ান আমজাদ হোসেন (আ' লীগ)	৮০৫৩৬
আবুল কালাম আজাদ (জামায়াত)	৭৯১৪

নওগাঁ- ৪

ভোটার সংখ্যা- ১৭৩১১০ মোট বৈধ ভোট- ১৪৬৯৮৬

মওঃ মোঃ নাছির উদ্দিন (জামায়াত)	২২৩৮৯
ইমাজ উদ্দিন প্রমানিক (আঃ লীগ)	৫২৫৯৬
শামসুল আলম প্রাঃ (বিএনপি)	৬৯৯১৯
মোঃ এনামুল হক (জাপা)	১৭৫৮

নওগাঁ-৫

ভোটার সংখ্যা- ১৮৫৭১৩ মোট বৈধ ভোট- ১৫৯১৬৮

এডঃ ইউনুছ আলী (জামায়াত)	৩৯৪২
মোঃ আবদুল জলিল (আঃ লীগ)	৬৬৪২৩
শামস উদ্দিন আহমদ (বিএনপি)	৮৪৪৮১
এ. কে. এম.মোরশেদ (জাপা)	৩২৬৫

নওগাঁ- ৬

ভোটার সংখ্যা- ১৭৬০৭৩ মোট বৈধ ভোট- ১৫০০৩৯

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন (জামায়াত)	৭৬৭৮
শহিদুর রহমান (আঃ লীগ)	৫৬০৫৩
আলমগীর কবির (বিএনপি)	৭৭৩০৪
বিধিদ্র নাথ সাহা (জাপা)	৮৪৬৭

রাজশাহী- ১

ভোটার সংখ্যা- ২০২০৯৬ মোট বৈধ ভোট- ১৭৬১০২

মোঃ মজিবুর রহমান (জামায়াত)	২৮৪৫৩
আলাল উদ্দিন (আঃ লীগ)	৫৫০০৩
আমিনুল হক (বিএনপি)	৮৩৯৩৩
রাবেয়া ভূইয়া (জাপা)	৬৯১৫

রাজশাহী-২

ভোটার সংখ্যা- ২৯৩৩৭২ মোট বৈধ ভোট- ২৪৬৬০৬

আতাউর রহমান (জামায়াত)	৪১৭৭৪
খায়েরুজ্জামান (আঃ লীগ)	৭৫৮০৩
মতিন খান(জাপা)	১৩৭৪৭
মোঃ কবির হোসেন (বিএনপি)	১০৮৪৭১

রাজশাহী-৩

ভোটার সংখ্যা- ২৩৬৫২০ মোট বৈধ ভোট- ১৯৮১৪১

আবদুল আহাদ কবিরাজ (জামায়াত)	৩৩৮২৪
ইব্রাহিম হোসেন (আঃ লীগ)	৫৪১২১
আবু হেনা (বিএনপি)	৬৮৮৬৩
সরদার আমজাদ (জাপা)	৪১৮৩৬

রাজশাহী-৪

ভোটার সংখ্যা- ১১৭৫৭১ মোট বৈধ ভোট- ১৫০১৭৮

মোকসেদ আলী (জামায়াত)	১৭৯৯৬
তাজুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৫২৯৩
নাদিম মোস্তফা (বিএনপি)	৫০৮২৭
আয়েন উদ্দিন (জাপা)	২৩৭০১

রাজশাহী-৫

ভোটার সংখ্যা- ১৮১২৩৯ মোট বৈধ ভোট- ১৫৮৬৭৫

আবদুল মান্নাফ (জামায়াত)	১৪৬৬৮
আনিসুর রহমান (আঃ লীগ)	৫৮৬১৪
আলাউদ্দিন (বিএনপি)	৬৫৫৯৪
আজিজুল আলম (জাপা)	১৯৩৬৬

নাটোর-১

ভোটার সংখ্যা- ১৭৮৮৮৪ মোট বৈধ ভোট- ১৬১২০৭

তাসনীম আলম (জামায়াত)	১১৪৩৩
মমতাজ উদ্দিন (আঃ লীগ)	৬২১৮৪
ফজলুর রহমান (বিএনপি)	৭৮৮৯৭
মনিরুজ্জামান (জাপা)	৩৯৩৭

নাটোর-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৫০৩৩৬ মোট বৈধ ভোট- ১২১০৫৯

আফসার আলী (জামায়াত)	৬৩১৪
শাহজাহান আলী (আঃ লীগ)	৪১৭১৮
গোলাম মোরশেদ (বিএনপি)	৪৩১৬২
আবুল হাসান (জাপা)	১৫৪২০

নাটোর-৪

ভোটার সংখ্যা- ২১১৮১৯ মোট বৈধ ভোট- ১৭৮২৮৫

আবদুল হাই সরকার (জামায়াত)	১২৭৩৬
আবদুল কুদ্দুস (আঃ লীগ)	৬৭০১৩
মোজাম্মেল হক (বিএনপি)	৬১৩৭৮
আবুল কাশেম (জাপা)	৩৫৪১৪

সিরাজগঞ্জ- ১

ভোটার সংখ্যা- ১৩৬৯৪৬ মোট বৈধ ভোট- ৯১৮০৭

আহসান হাবিব (জামায়াত)	১৮৬৯

www.pathagar.com

মোঃ নাসিম (আঃ লীগ)	৬২৩৮৩
আব্দুল মজিদ (বিএনপি)	২৩৯২৭
মোজাম্মেল হক (জাপা)	৩১৭৫

সিরাজগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা- ২২২৫০৩ মোট বৈধ ভোট- ১৭৭৬৩৭

আবদুল লতিফ (জামায়াত)	২২৭৯৫
মোঃ নাসিম (আঃ লীগ)	৬৮৫৯৮
শামসুল আলামিন (বিএনপি)	৫২৭০৯
আবদুল মতিন (জাপা)	৩২৫১৫

সিরাজগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা- ২১১২৭৮ মোট বৈধ ভোট- ১৬৬৮৭৯

এবিএম আবদুস সত্তার (জামায়াত)	১৭৮৪৫
ইসহাক হোসেন (আঃ লীগ)	৭০৯৭৫
আব্দুল মান্নান (বিএনপি)	৭৪১৯২
আবদুল জব্বার (জাপা)	২৩৫৭

সিরাজগঞ্জ -৪

ভোটার সংখ্যা- ২১৬৩৫৯ মোট বৈধ ভোট- ১৬১৭৯৯

আবু বকর সিদ্দিক (জামায়াত)	৩৪৮২৬
নতিফ মীর্জা (আঃ লীগ)	৮০৪৭৭
মোঃ কামাল (বিএনপি)	৩৮৬২৬
রওশন আলী (জাপা)	৭৮৭০

নিরাজগঞ্জ-৫

ভোটার সংখ্যা- ১৮৬৭৬৫ মোট বৈধ ভোট- ১৪০৬৯৫

আলী আলম (জামায়াত)	২৩৮১৫
লতিফ বিশ্বাস (আঃ লীগ)	৫১৬৮১
শহিদুল্লাহ খান (বিএনপি)	৪৮,৩৬০
ওমর ফারুক (জাপা)	১৬,৩০১

সিরাজগঞ্জ-৬

ভোটার সংখ্যা- ১২৪১৫৬ মোট বৈধ ভোট- ৭৮৭৭৭

মোঃ শাহজাহান (আ' লীগ)	২৯৫৯২
মাহবুবুল ইসলাম (বিএনপি)	২৬৮৫৫
নুরুল ইসলাম (জাপা)	৩০১৮
আব্দুস সালাম (জামায়াত)	৭০৭৩

সিরাজগঞ্জ-৭

ভোটার সংখ্যা- ১৬৯৪৩৬ মোট বৈধ ভোট- ১৩১৪০১

হাসিবুর রহমান (বিএনপি) -	৫৪০২৩
ডঃ মাজহারুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৫৩০৭২
ডাঃ ফয়েজ উদ্দিন (জাপা)	২৪৮০
রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত)	১৫৮৪৪

পাবনা-১

ভোটার সংখ্যা- ২০৯৭৫৮ মোট বৈধ ভোট- ১৭৬৬৮২

মওঃ মতিউর রহমান নিজামী (জামায়াত)	৪২২৬৫
আবু সাঈদ (আঃ লীগ)	৭৩৩৩৫
মঞ্জুর কাদের (বিএনপি)	৫৮৬৫২
আনোয়ার হোসেন (জাপা)	১২০১

পাবনা -২

ভোটার সংখ্যা- ১৬৯৪৩৬ মোট বৈধ ভোট- ১৪০৭৮৩

হাতেম আলী (জামায়াত)	৩৯৭৯
তফিজ উদ্দিন (আঃ লীগ)	৬৭২৫০
সেলিম রেজা (বিএনপি)	৬৫৭৪৫
মকবুল হোসেন (জাপা)	২৪৫১

পাবনা- ৩

ভোটার সংখ্যা- ২২২১৬৬ মোট বৈধ ভোট- ১৮৫৮৭৪

আফজাল হোসেন (জামায়াত)	১৪৯৩৬
ওয়াজিউদ্দিন খান (আঃ লীগ)	৮৫৬৪৪
আনোয়ারুল ইসলাম (বিএনপি)	৭১৪৩৫
আবদুর রহিম (জাপা)	১০৭৫২

পাবনা-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৯৮৪০৪ মোট বৈধ ভোট- ১৬৪২১৫

মওঃ নাসিরুদ্দিন (জামায়াত)	৩৫৫৯৬
শামসুর রহমান (আঃ লীগ)	৬৬৪২৪
সিরাজুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৫৯৪৪
আনোয়ার হোসেন (জাপা)	৫০২২

পাবনা-৫

ভোটার সংখ্যা- ২৪৪১৭৪ মোট বৈধ ভোট- ১৯০১৬৪

মুঃ আবদুস সুবহান(জামায়াত)	৩৭৩৩৬
এ কে খন্দকার (আঃ লীগ)	৬৯১১৯
রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)	৭৮১৬৫
মোঃ ইকবাল (জাপা)	৪৩৭৭

www.pathagar.com

খুলনা বিভাগ

মেহেরপুর-১

ভোটার সংখ্যা- ১৫৮৫৮৯ মোট বৈধ ভোট- ১৩৮০৮৮

ছমির উদ্দিন (জামায়াত)	২৩৯২৯
জোহরা তাজউদ্দিন (আঃ লীগ)	৫১৩৬৬
আহমদ আলী (বিএনপি)	৬০৬২১
রমজান আলী (জাপা)	১৬৫৯

মেহেরপুর-২

ভোটার সংখ্যা- ১৩৯৪৩৪ মোট বৈধ ভোট- ১২০৩২১

আব্দুল কাদের (জামায়াত)	২২৫৯০
হিসাব উদ্দিন (আঃ লীগ)	১৭৭১
আব্দুল গণি (বিএনপি)	৩৩৮৬১
মহসীন আলী (জাপা)	৩৪৩১
স্বতন্ত্র	৪৫৮২০

কুষ্টিয়া-১

ভোটার সংখ্যা- ১৯১৪৭৯ মোট বৈধ ভোট- ১৩৯৮৯৩

নূর কুতুবুল আলম (জামায়াত)	৪৫৫১
আফাজ উদ্দিন (আঃ লীগ)	৪৭০৫৩
আহসানুল হক মোল্লা(বিএনপি)	৬৪৬৯২
কোরবান আলী (জাপা)	৩৬৭৯৭

কুষ্টিয়া -২

ভোটার সংখ্যা- ২২৯২৫৮ মোট বৈধ ভোট- ১৯৪৭৪০

আব্দুল ওয়াহিদ (জামায়াত)	৩০৬৩২
মাহবুবুল আলম (আঃ লীগ)	২৮৫৪৪
শহিদুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৪৩৮৯
আহসান হাবিব (জাপা)	৪০১০৪

কুষ্টিয়া ৩

ভোটার সংখ্যা- ২১৭৫০৪ মোট বৈধ ভোট- ১৮৩২৬২

ডাঃ আনিসুর রহমান (জামায়াত)	৩০৯৮৩
আনোয়ার আলী (আঃলীগ)	৫৫৮৮১
আব্দুল খালেক চন্টু (বিএনপি)	৭২২৬০
জাফরুল্লাহ খান (জাপা)	২০৪১২

কুষ্টিয়া-৪

ভোটার সংখ্যা- ২০২৩৫৩ মোট বৈধ ভোট- ১৭০৮৫২

ফরহাদ হোসেন (জামায়াত)	২৬৩৪০
আবুল হোসেন (আঃ লীগ)	৫৫৫১০
মেহদী আহমদ (বিএনপি)	৫৫৮৭১
আমজাদ আলী (জাপা)	১০৯৯৭

চুয়াডাংগা-১

ভোটার সংখ্যা- ২৫৫০৩৬ মোট বৈধ ভোট- ২১৫৬৮৪

আবদুল খালেক (জামায়াত)	৩৫৩৬৫
সোলায়মান হক (আঃ লীগ)	৭৭৪৮৯
শামসুজ্জামান দুদু (বিএনপি)	৮৯৭৮৬
সাইফুল ইসলাম (জাপা)	৫২১২

চুয়াডাংগা-২

ভোটার সংখ্যা- ২২৭৬৫৮ মোট বৈধ ভোট- ১৯৪২১১

মওঃ হাবিবুর রহমান (জামায়াত)	৪৮৯৪৪
মীর্জা সুলতান রাজা (আঃ লীগ)	৬৩৭৩২
মোজাম্মেল হক (বিএনপি)	৬৪৭৫৫
হাবিবুর রহমান (জাপা)	১১১৮৭

ঝিনাইদহ-১

ভোটার সংখ্যা- ১৭৪৯৯৮ মোট বৈধ ভোট- ১৫৩৩৪০

আবু তৈয়ব (জামায়াত)	৫৯৪৫
কামরুজ্জামান (আঃলীগ)	৬৮৫১৪
আঃ ওয়াহাব (বিএনপি)	৭৫১০৫
গোলাম মোস্তফা (জাপা)	২৩০৯

ঝিনাইদহ-২

ভোটার সংখ্যা- ২৪৩১৪৯ মোট বৈধ ভোট- ২০৫২৮২

নূর মোহাম্মদ (জামায়াত)	৪১২৪৭
নূরে আলম সিদ্দিকী (আঃ লীগ)	৬৯৩৫৩
মশিউর রহমান (বিএনপি)	৮৩৯৬৭
মোশাররফ হোসেন (জাপা)	৮৪১১

ঝিনাইদহ- ৩

ভোটার সংখ্যা- মোট বৈধ ভোট- ১৭৬৬৫৫

মোজাম্মেল হক (জামায়াত)	৫৬৪৫৮
সাজ্জাতুজ জুম্মা(আঃ লীগ)	৫০৮৮২
শহিদুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৫৭২৫
খালেকুজ্জামান (জাপা)	২৪৯৬

ঝিনাইদহ- ৪

ভোটার সংখ্যা- ১৬৪১৪২ মোট বৈধ ভোট- ১৩২৫৬৯

আবু তলেব (জামায়াত)	২০১০৬

www.pathagar.com

আঃ মান্নান (আঃ লীগ)	৪৯৬০৫
শহীদুজ্জামান (বিএনপি)	৬০৬৯৬
জাহিদুল ইসলাম (জাপা)	১৩১১

যশোর-১

ভোটার সংখ্যা- ১৪৩৬৭৯ মোট বৈধ ভোট- ১২৩১৬৭

নূর হোসেইন (জামায়াত)	৩২২৯৪
তবিবুর রহমান (আঃ লীগ)	৪৬১১৪
আলী কদর (বিএনপি)	৪০৬৩৩
আঃ কাদের (জাপা)	২৬০৯

যশোর-২

ভোটার সংখ্যা- ২৩০৯৪৬ মোট বৈধ ভোট- ২০৩১৫৯

আবু সাঈদ মো শাহাদত হোসেন (জামায়াত)	৪৮৩৯৩
রফিকুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৮৬৭৫২
মোঃ ইসহাক (বিএনপি)	৫৮৪০৫
সেলিম রেজা (জাপা)	৪৭৭৪

যশোর- ৩

ভোটার সংখ্যা- ২৮৬৫৩৮ মোট বৈধ ভোট- ২৩৩২৩০

রুহুল কদ্দুস খান (জামায়াত)	১৯৩৬৩
আলী রেজা রাজু (আঃ লীগ)	৭৫৭৬৯
তরিকুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৫৬৩৪
খালেদুর রহমান টিটো (জাপা)	৬৩৪৩৮

যশোর- ৪

ভোটার সংখ্যা- ২২৬৭৬৮ মোট বৈধ ভোট- ১৯০৫৬৫

আব্দুল আজীজ (জামায়াত)	২৫১১২
শাহ হাদিউজ্জামান (আঃ লীগ)	৬৯১৯৪
নাজিমুদ্দিন আল আজাদ (বিএনপি)	৪৩৬১১
আমিন উদ্দীন (জাপা)	৪৪২৬৩

যশোর-৫

ভোটার সংখ্যা- ১৯৪৩৬৪ মোট বৈধ ভোট- ১৩৫৪০৭

মওঃ হাবিবুর রহমান (জামায়াত)	৩০৮৮২
খান টিপু সুলতান (আঃলীগ)	৬৪৫৮৬
ইকবাল হোসেন (বিএনপি)	৪৫২৩৪
মুফতি ওয়াক্কাস (জাপা)	২৩৯৩০

যশোর-৬

ভোটার সংখ্যা- মোট বৈধ ভোট- ১০০৭২০

মুখতার আলী (জামায়াত)	১৬৩৯০
এইচ কে সাদেক (আঃ লীগ)	৩৫২৯৩
শাখাওয়াত হোসেন (বিএনপি)	৩০৬০৯
জিঃ এম এরশাদ (জাপা)	১৮১৮০

মাগুরা-১

ভোটার সংখ্যা- ১৯৭৭৬২ মোট বৈধ ভোট- ১৬৫২০০

লিয়াকত আলী খান (জামায়াত)	৫৭০৬
এম, এস, আকবর (আঃ লীগ)	৭৩৫৪৩
মাজিদুল হক (বিএনপি)	৩২৬২১
ইকবাল আখতার (জাপা)	৪৯৫৯৪

মাগুরা-২

ভোটার সংখ্যা- ১৯০৮৯১ মোট বৈধ ভোট- ১৬১০১৬

গোলাম আকবর (জামায়াত)	১০৫৭৮
ধীরেন সিকদার (আঃ লীগ)	৬৪২১৮
সালিমুল হক (বিএনপি)	৫৫২০৪
নিতাই রায় চৌঃ(জাপা)	২৬৮৮

নড়াইল-১

ভোটার সংখ্যা- ১৪৮৫৬৬ মোট বৈধ ভোট- ১১১০২৪

বাহ-উদ্দীন (জামায়াত)	৭৩৮৯
ধীরেন্দ্রনাথ (আঃ লীগ)	৫১১৬৭
জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)	২৬৯৪৮
আশরাফুল আলম (জাপা)	১৮৬২২

নড়াইল-২

ভোটার সংখ্যা- ১৮১৮২৯ মোট বৈধ ভোট- ১৪২১৯৪

মওঃ নূরুন্নবী জেহাদী (জামায়াত)	২২০৯৩
শরিফ খসরুজ্জামান (আঃ লীগ)	৬৩৯১৩
আবদুল কাদের সিকদার (বিএনপি)	৪২৭১৮
হাফিজুর রহমান (জাপা)	৭৪৭৪

বাগেরহাট-১

ভোটার সংখ্যা- ১৮১৯৮৬ মোট বৈধ ভোট- ১৫০৬১৭

আহাদ আলী (জামায়াত)	৮৪৬৩
শেখ হাসিনা (আঃ লীগ)	৭৭৩৪২
শেখ মজিবুর রহমান (বিএনপি)	৪৭২৯৯
শফিকুল ইসলাম (জাপা)	৫৯৭৭

বাগেরহাট-২

ভোটার সংখ্যা- ১৭৮৪৪৯ মোট বৈধ ভোট- ১৪৬৩০৯

শেখ কামরুল আলম (জামায়াত)	২৬৮০৫

www.pathagar.com

শাখাওয়াত আলী (আঃ লীগ)	৫৭৩৭৭
মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)	৫১৪৪৮
শেখ আতিয়ার রহমান (জাপা)	৮৪৫০

বাগেরহাট-৩

ভোটার সংখ্যা- ১৫৪৭৭১ মোট বৈধ ভোট- ১১৮৮৮৮

মওঃ গাজী আবুবকর(জামায়াত)	৩৪৩২১
আবদুল খালেক (আঃ লীগ)	৫২৪৪৫
এ. ইউ. আহমেদ (বিএনপি)	২১৫৫০
খান আমজাদ (জাপা)	৪৮০৯

বাগের হাট-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৯১০৮০ মোট বৈধ ভোট- ১৩৪২৮৩

মুফতি আব্দুস সাত্তার (জামায়াত)	২১৫৫৭
ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন (আঃলীগ)	৫৫২২৭
আলতাফ হোসেন(বিএনপি)	২৯৪২৯
কবির আহমেদ (জাপা)	১৩০২৬

খুলনা-১

ভোটার সংখ্যা- ১৪৪৭১৯ মোট বৈধ ভোট-১১৫৪২৬

শেখ মোহাঃ আবু ইউসুফ (জামায়াত)	২৩০৮
শেখ হাসিনা (আঃ লীগ)	৬২২৪৭
প্রফুল্ল কুমার মন্ডল (বিএনপি)	১১৯১০
বিনয়কৃষ্ণ রায় (জাপা)	৮০৪৮

খুলনা-২

ভোটার সংখ্যা- ১৬৯৭২১ মোট বৈধ ভোট- ১৩০২৮৯

আনসার উদ্দীন (জামায়াত)	৮৪২৬
মনজুরুল ইমাম(আঃলীগ)	৫৪৭৭৮
শেখ রাজ্জাক আলী (বিএনপি)	৫৬৩০৬
মিয়া মুসা হোসেন (জাপা)	৭৩৩৩

খুলনা- ৩

ভোটার সংখ্যা- ১৫২০৬৯ মোট বৈধ ভোট- ১১৮৫৫৫

মিয়া গোলাম পরোয়ার (জামায়াত)	৭৮৯৮
সিকান্দার আলী (আঃ লীগ)	৩৯৩৩২
আশরাফ হোসেন (বিএনপি)	৩৭৭৮০
এস. এম. এ রব (জাপা)	২৮৬৯৩

খুলনা-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৮৮৫৬৪ মোট বৈধ ভোট- ১৪৮৫৪০

মওঃ আঃ হামিদ (জামায়াত)	১২৬৫৫
মোস্তাফা রশিদী সুজা (আঃ লীগ)	৫৯৫৬৬
নূরুল ইসলাম (বিএনপি)	৫৭২২১
মমিন উদ্দিন (জাপা)	১০৪৮৫

খুলনা- ৫

ভোটার সংখ্যা- ২০০২৬৯ মোট বৈধ ভোট- ১৬৯৫০৪

গাওসুল আজম হাদী (জামায়াত)	১৫৯৬০
সালাউদ্দিন ইউসুফ (আঃ লীগ)	৭০১৮৪
মাজিদুল ইসলাম (বিএনপি)	৪৫৫৮৪
এম এ. গাফফার (জাপা)	৩১৩৪৯

খুলনা-৬

ভোটার সংখ্যা- ২০৯১৯৮ মোট বৈধ ভোট- ১৭৩৩৩৯

শাহ মোঃ রুহুল কুদ্দুস (জামায়াত)	৪৯০২৩
নূরুল হক (আঃ লীগ)	৬৬০৩৩
জি.এ. সবুর (বিএনপি)	১৬৮৩৫
বাবর আলী (জাপা)	৩৮৪৬৭

সাতক্ষীরা- ১

ভোটার সংখ্যা- ২৫৪৩৮১ মোট বৈধ ভোট- ২২০৫১০

শেখ আনসার আলী (জামায়াত)	৫১০৫৪
কামাল বখত (আঃ লীগ)	৭৬৭১৮
হাবিবুল ইসলাম (বিএনপি)	৩৯৬১২
দিদার বখত (জাপা)	৫০৬৩০

সাতক্ষীরা-২

ভোটার সংখ্যা- ১৯৭১১৮ মোট বৈধ ভোট- ১৬৯৩৩৫

কাজী শামসুর রহমান (জামায়াত)	৫৪০৯৬
এম মনসুর আলী (বিএনপি)	১৪৬৮২
নজরুল ইসলাম (আ' লীগ)	৪৫৪৫০
সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ (জাপা)	৫৩৭৮৭

সাতক্ষীরা-৩

ভোটার সংখ্যা- ১২৫৯৪৯ মোট বৈধ ভোট- ১০২৫৪৯

মওঃ রিয়াসত আলী (জামায়াত)	২৩৪৬২
মোখলেসুর রহমান (আঃ লীগ)	৩৯৭২২
আলী আহমদ (বিএনপি)	৬৪৫৯
সালাউদ্দিন (জাপা)	৩২০৮৭

সাতক্ষীরা-৪

ভোটার সংখ্যা- ১৭৯৩৮০ মোট বৈধ ভোট- ১৫৪৭৩২

জি. এম. আব্দুল গফফার (জামায়াত)	৩০১৫১

www.pathagar.com

মনসুর আহমদ (আঃ লীগ)	৪৪২৭২
ওয়াজেদ আলী (বিএনপি)	৩২৬৩৫
শাহাদত হোসেন (জাপা)	৪৬৭৩০

সাতক্ষীরা-৫

ভোটার সংখ্যা- ১৪৮৫১২ মোট বৈধ ভোট- ১১৫৭১৭

গাজী নজরুল ইসলাম (জামায়াত)	৩১১৭২
ফজলুল হক (আঃ লীগ)	৪০৭২৫
আব্দুল হক (বিএনপি)	১৩৮০১
শেখ আবুল হোসেন (জাপা)	২৫৬১৬

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা-১

ভোটার সংখ্যা ১৭৪৯৬৯ বৈধ ভোট ১১৫২৪৬

সুলতান আহমদ (জামায়াত)	২৬৫৯
ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (আঃ লীগ)	৫৪৯৫৩
আবদুর রহমান (বিএনপি)	১৮৭০৩
জাফরুল হাসান (জাপা)	৭৮৯০

বরগুনা-২

ভোটার সংখ্যা ১০৭২৭৫ বৈধ ভোট ৮০৩৩৫

অধ্যাঃ তৈয়বুর রহমান (জামায়াত)	১৫৮৩
গোলাম সরওয়ার হীরু (ই-ঐক্য)	২১৮৪৮
গোলাম কবির (আঃ লীগ)	১৮১৮৩
নূরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)	২০৫৫
খন্দকার মাহবুব হোসেন (জাপা)	১৭২৩৪

বরগুনা-৩

ভোটার সংখ্যা ১১৩৭১৭ বৈধ ভোট ৭০৯২০

আবদুর রব বিশ্বাস (জামায়াত)	৪৮০
মজিবুর রহমান (আঃ লীগ)	৩০৭১৪
আনসারুল আলম (বিএনপি)	৭২৬৭
মতিয়ার রহমান (জাপা)	১৮৯৪৪

পটুয়াখালী-১

ভোটার সংখ্যা ২১৭৯২৩ বৈধ ভোট ১৩৫১৪১

আঃ জব্বার আজাদী (জামায়াত)	২০৪৩
শাহজাহান মিঞা (আঃ লীগ)	৬৩৯৫১
কেরামত আলী (বিএনপি)	৫২৩৬৯
রুহুল আমিন হাং (জাপা)	৫৩৩২

পটুয়াখালী -২

ভোটার সংখ্যা ১৪২৪২৮ বৈধ ভোট ৯৮৯০৭

আসম ফিরোজ (আঃ লীগ)	৪৫৯৩৭
শহীদুল আলম (বিএনপি)	৪৫৯১৩
ফখরুদ্দীন খান রাযী (???)	১৬৮০
রুহুল আমীন (???)	৩৯৩

পটুয়াখালী -৩

ভোটার সংখ্যা ১৫৬০৭৮ বৈধ ভোট ৯৬১১৩

মওঃ আশরাফ আলী খান (জামায়াত)	৩২৫৭
আ.খ.ম. জাহাঙ্গীর হোসাইন (আঃ লীগ)	৫০৬৩৯
মোঃ শাহজাহান খান (বিএনপি)	৩১২৮১
মোঃ ইয়াকুব আলী চৌঃ (জাপা)	৩৯৭৭

পটুয়াখালী-৪

ভোটার সংখ্যা ১২৭৪৫৮ বৈধ ভোট ৮৯৪৮৮

মাঃ আঃ খালেক ফারুকী (জামায়াত)	১৮৭৬
আনোয়ারুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৩১০৯২
মোস্তাফিজুর রহমান(বিএনপি)	২৩৩৪৮
আঃ রাজ্জাক খান (জাপা)	১০৮৪৪

ভোলা-১

ভোটার সংখ্যা ১৬৮৭৯৮ বৈধ ভোট ১১১৭৯৩

আবু বকর ছিদ্দিক (জামায়াত)	১৬০৭১
তোফায়েল আহমেদ (আঃ লীগ)	৫০০৯৯
মোশারফ হোসেন শাহজাহান (বিএনপি)	৪৭৭৫৯
মাকসুদুর রহমান (জাপা)	৪০২৪

ভোলা-২

ভোটার সংখ্যা ১৫৫০৮৩ বৈধ ভোট ৯৬৪৭৭

মোহাম্মদ ফজলুল করিম (জামায়াত)	৪৫৬২
তোফায়েল আহমেদ (আঃ লীগ)	৪৮৯২৪
হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি)	৪০৬৪৩
কায়কোবাদ মিয়া (জাপা)	৫৮৩

ভোলা -৩

ভোটার সংখ্যা ১৬৯৬৪৪ বৈধ ভোট ১২০২২০

মাওঃ শিহাব উদ্দীন (জামায়াত)	২৭৪৩
নজরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৪০০৭
মেজর অবঃ হাফিজ উদ্দীন (বিএনপি)	৭০৮৪৩
আঃ সাত্তার আলমগীর (জাপা)	৮৩৫

www.pathagar.com

ভোলা -৪

ভোটার সংখ্যা ১৭৪৭৬৯ বৈধ ভোট ১১৫৬২৭

অধ্যাপক জিয়াউল মোরশেদ (জামায়াত)	৩২৪২
জাফর উল্লাহ চৌধুরী (আঃ লীগ)	৪৩২১৩
নাজিম উদ্দিন আলম (বিএনপি)	৬৪৩২৮
মোতহার হোসেন আলমগীর (জাপা)	২০৯৫

বরিশাল -১

ভোটার সংখ্যা ১৫০৪২৯ বৈধ ভোট ১১৬১৭৫

সরদার আবদুস সালাম (জামায়াত)	৫৩৯৫
আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ (আঃ লীগ)	৫২৪১৮
কাজী গোলাম মাহবুব (বিএনপি)	৫০১২৫
সুনীল গুপ্ত (জাপা)	৬০৫৪

বরিশাল-২

ভোটার সংখ্যা ১৭২৯০৮ বৈধ ভোট ১২০০৩৫

বজলুর রশীদ (জামায়াত)	৫২৬৮
গোলাম ফারুক অভি (জাপা)	৩৩৫৫৬
সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (বিএনপি)	৩১৮৪৪
সৈয়দ মাইনুল হক (আঃ লীগ)	২৫৪০৩
রাশেদ খান মেনন (ওয়ার্কার্স পার্টি)	১৪১২৪

বরিশাল ৩

ভোটার সংখ্যা ১৩৫৩৭৬ বৈধ ভোট ৯৭০০৮

সাইয়েদ নূরুল হক (জামায়াত)	৫৬৭২
আব্দুল বারী (আঃ লীগ	৩০৬৬৫
মোশাররফ হোসেন মঙ্গু (বিএনপি)	৪৮০৪১
আনোয়ার হোসেন দুলাল (জাপা)	৫১৭১

বরিশাল- ৪

ভোটার সংখ্যা ১২৯৯৯৭ বৈধ ভোট ৯৩৯৫২

মাহমুদ আল মামুন (জামায়াত)	৯৫৭৭
মহিউদ্দিন আহমদ (আঃ লীগ)	২২৫৫৬
আবুল হোসাইন (বিএনপি)	৫০৮৩০
আবদুল জব্বার তালুকদার (জাপা)	১০৪১৪

বরিশাল -৫

ভোটার সংখ্যা ২১০০০০ বৈধ ভোট ১৫৪৭৪৯

মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলাল (জামায়াত)	৪৬৬৭
মাহবুব উদ্দিন (আঃ লীগ)	৪২৯২২
নাসিম বিশ্বাস (বিএনপি)	৭০৮০৪
শওকত হোসেন হীরু (জাপা)	৩১১১১

বরিশাল-৬

ভোটার সংখ্যা ১৪৭৪৭৩ বৈধ ভোট ১০০৫১৯

মাহমুদুন নবী (জামায়াত)	২০১০
সৈয়দ মাসুদ রেজা (আঃ লীগ)	৪১৮৬৪
আবদুর রশীদ খান (বিএনপি)	৩৪০৩৮
রুহুল আমীন হাওঃ (জাপা)	১৫৬৬১

ঝালকাঠি-১

ভোটার সংখ্যা ১১২৫৩৮ বৈধ ভোট ৮২০৭১

মওঃ মোজাম্মেল হোসাইন (জামায়াত)	৯২৫
আমির হোসেন আমু (আঃ লীগ)	২৩৭৯২
শাহজাহান ওমর (বিএনপি)	২৬০১৭
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (জাপা)	২৭৮১২

ঝালকাঠি-২

ভোটার সংখ্যা ১৬৯৯১৬ বৈধ ভোট ১২৭০৩৮

হায়দার হোসেন (জামায়াত)	১৬৮৪
আনোয়ার হোসেন (আঃ লীগ)	৩২২৪৫
আজিজ ফেরদৌস (বিএনপি)	৩৮৫২৩
জুলফিকার আলী ভুট্টো (জাপা)	৪৭০৫০

পিরোজপুর- ১

ভোটার সংখ্যা ১৯৪৯১১ বৈধ ভোট ১৫০৭৬১

মওঃ দেঃ হোসাইন সাইদী (জামায়াত)	৫৫৭১৭
সুধাংশু শেখর হালদার (আঃ লীগ)	৫৫৪৩৭
নুরুজ্জামান বাবুল (বিএনপি)	৫৯১২
মোস্তফা জামাল হায়দার (জাপা)	৩০০০৯

পিরোজপুর -২

ভোটার সংখ্যা ১০০০৪৫ বৈধ ভোট ৬৪৫০৭

খায়রুল ইসলাম (জামায়াত)	৬৩৪৬
আলতাফ হোসাইন (আঃ লীগ)	১৩৮১১
নূরুল ইসলাম মঞ্জু (বিএনপি)	৭৩৮৫
আনোয়ার হোসেন (জাপা)	৩৩৫১৯

পিরোজপুর- ৩

ভোটার সংখ্যা ১১৪৬১২ বৈধ ভোট ৭৯৯৬৮

নূর মোহাম্মদ আকন (জামায়াত)	৪৯১৫

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন আহম্মদ (আঃ লীগ) ২৪২৬৩
জব্বার ইঞ্জিঃ (বিএনপি) ২০৩২৬
রুস্তম আলী ফারাজী (জাপা) ২৯৮৩৭

বরিশাল+পিরোজপুর

ভোটার সংখ্যা ১৬৬২২৬ বৈধ ভোট ১২৬৭৮৬
নূর মোহাম্মদ মিয়া (জামায়াত) ৩৩৪৪
ফয়জুল হক (আঃ লীগ) ৫৭২৫৭
শহিদুল হক জামাল (বিএনপি) ৫০৯৮৩
মনিরুল ইসলাম (জাপা) ১৩৯৮৯

ঢাকা বিভাগ

টাংগাইল -১

ভোটার সংখ্যা ১৯৮৩৫৬ বৈধ ভোট ১৫২০২৮
মুজিবুর রহমান খান (জামায়াত) ৪১৭০
আবুল হাসান চৌঃ (আঃ লীগ) ৭৭৭৩৮
আবদুস সালাম তালুকদার (বিএনপি) ৬৫৮৩৪
আবু সাঈদ খান (জাপা) ৪২৮৬

টাংগাইল-২

ভোটার সংখ্যা ২২১০২৯ বৈধ ভোট ১৬৭১০৯
আঃ সালাম খান (জামায়াত) ৫৮০১
আসাদুজ্জামান (আঃ লীগ) ৭৭০৮৬
আঃ সালাম পিন্টু (বিএনপি) ৬৮৪১৬
শামীম আল মামুন (জাপা) ১৫১৮৮

টাংগাইল-৩

ভোটার সংখ্যা ১৮৪৯৫১ বৈধ ভোট ১৪৬৮৬৫
অধ্যাঃ আঃ হামিদ (জামায়াত) ১৭৩২
শামসুর রহমান খান (আঃ লীগ) ৬৩৫৩৮
লুৎফর রহমান খান (বিএনপি) ৭৩৮১৫
মোঃ জাকারিয়া (জাপা) ৬৩৮১

টাংগাইল-৪

ভোটার সংখ্যা ১৯১৬৩৬ বৈধ ভোট ১৫৪৪৯৫
আমজাদ হোসেন (জামায়াত) ২৩৯৪
লতিফ সিদ্দিকী (আঃ লীগ) ৭৫৫৮১
শাহাজান সিরাজ (বিএনপি) ৬৩৭২০
আবুল কাশেম (জাপা) ১২৮০৮

টাংগাইল ৫

ভোটার সংখ্যা ৩০৮৪৭৩ বৈধ ভোট ২৩৯৮৮১
ডাঃ শফিকুর রহমান (জামায়াত) ৩৯৯৭
আঃ মান্নান (আঃ লীগ) ৯৫৯০৩
মাহমুদুল হাসান (বিএনপি) ৬৮০৪২
আবুল কাশেম (জাপা) ৬৯৪৩০

টাংগাইল-৬

ভোটার সংখ্যা ১২৯৮৪৫ বৈধ ভোট ৯০৯২৭
ডাঃ আবদুল হামিদ (জামায়াত) ১৬৭৬
আবদুল বাতেন (আঃ লীগ) ৩২৩২৯
গৌতম চক্রবর্তী (বিএনপি) ৩৪২৭৯
নূর মোহাম্মদ খান (জাপা) ২২১৩৮

টাংগাইল -৭

ভোটার সংখ্যা ১৮৩০১২ বৈধ ভোট ১৪৫৬২৪
ডাঃ আবদুল হালিম (জামায়াত) ২৩৮৩
একাব্বর হোসেন (আঃ লীগ) ৫৪৩০৩
আবুল কালাম আজাদ (বিএনপি) ৫৯৮৪৮
জহিরুল ইসলাম (জাপা) ২৭৯৪২

টাংগাইল -৮

ভোটার সংখ্যা ২০৪২৬৩ বৈধ ভোট ১৫৯৯১৯
খন্দঃ আঃ রাজ্জাক (জামায়াত) ২৫৮২
কাদের সিদ্দিকী (আঃ লীগ) ১০০৩০৩
কামরুজ্জামান খান (বিএনপি) ৩৫৪৪৩
শাহ খালেদ রেজা (জাপা) ২০৪৮৫

জামালপুর - ১

ভোটার সংখ্যা ১৯৩১৬১ বৈধ ভোট ১৩২৪৭৫
ওসমান গনি (জামায়াত) ১৩০৫৪
আঃ কাঃ আজাদ (আঃ লীগ) ৪৬৭২২
মাঈনুল হক (বিএনপি) ১৩৫৭৪
এম. এ. সাত্তার (জাপা) ২৯৩৪১

জামালপুর- ২

ভোটার সংখ্যা ১৪২১৮৪ বৈধ ভোট ৯৬০১৮
মওঃ সামিউল হক ফারুকী (জামায়াত) ৭০৮৮
রাশেদ মোশাররফ (আঃ লীগ) ৪১৮১৬
সুলতান মাহমুদ (বিএনপি) ৩৬৩৪০
কামরুজ্জামান (জাপা) ৩৫৫৫

www.pathagar.com

জামালপুর -৩

ভোটার সংখ্যা ২৫১৯৬৩ বৈধ ভোট ১৬১০৩৮

অধ্যাঃ নুরুদ্দিন মিয়া (জামায়াত)	৪৭২৫
মীর্জা আজম (আঃ লীগ)	৮০০৫৬
আঃ হাই (বিএনপি)	৪৪৬৬৬
শফিকুল ইসলাম খোকা (জাপা)	২৮৬৯২

জামালপুর- ৪

ভোটার সংখ্যা ১৬৪৫১২ বৈধ ভোট ১২৩১১২

মওঃ আঃ আউয়াল (জামায়াত)	১১৮২
মওঃ নুরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৬৩৩৭৯
আঃ সালাম তালুকদার (বিএনপি)	৫৫৬৬৯
মোজাম্মেল হক (জাপা)	২৪৫০

জামালপুর -৫

ভোটার সংখ্যা ২৮৪০১৬ বৈধ ভোট ২১৬৩৭১

মজিবুর রহমান (জামায়াত)	৫৮৪৭
রেজাউল করিম (আঃ লীগ)	১৩০৮০৬
সিরাজুল হক (বিএনপি)	৭৭৮৬৫

শেরপুর- ১

ভোটার সংখ্যা ২০৩৬৪৯ বৈধ ভোট ১৩৬২৩৮

মোঃ কামারুজ্জামান (জামায়াত)	২১৭১৮
আতিউর রহমান (আঃ লীগ)	৫১৭৮৭
নজরুল ইসলাম (বিএনপি)	২১৪০৪
রওশন এরশাদ (জাপা)	৩৫৮৫১

শেরপুর -২

ভোটার সংখ্যা ২১১০৬১ বৈধ ভোট ১৫৫০০৩

ডাঃ আঃ জলিল (জামায়াত)	৪৩১৪
মতিয়া চৌধুরী (আঃ লীগ)	৬৩৫৭৪
জাহেদ আলী (বিএনপি)	৪৫৬৫৯
অধ্যাঃ আঃ সালাম (জাপা)	৪১৪৫৬

শেরপুর-৩

ভোটার সংখ্যা ১৯৫৭০৪ বৈধ ভোট ১১৯৪৫০

অধ্যাঃ মাযহরুল ইসলাম (জামায়াত)	৬২০২
এম, এ, বারি (আঃ লীগ)	৪২৯৯৪
মাহমুদুল হক(বিএনপি)	৩৬০৮৬
খন্দঃমোঃ খুররম (জাপা)	২৩৬১৩

মোমেনশাহী-১

ভোটার সংখ্যা ১৪০৪৪৯ বৈধ ভোট ৯৮১২০

হাফিজুর রহমান (জামায়াত)	২০১৫
প্রমোদ মানকিন (আঃ লীগ)	৩০৪১০
আফজাল এইচ খান (বিএনপি)	৪২৩৪৯
এমদাদুল হক(জাপা)	২২২৫৯

মোমেনশাহী- ২

ভোটার সংখ্যা ২৪৫৪০৮ বৈধ ভোট ১৪২৪৫১

আনিসুজ্জামান (জামায়াত)	৪২১৯
শামসুল হক (আঃ লীগ)	৫০৪৯৭
আশরাফ উদ্দীন সরকার (বিএনপি)	৩০৩৭
শহীদ সরোয়ার (জাপা)	৪২৬৭৮

মোমেনশাহী-৩

ভোটার সংখ্যা ১৩৮৯৫৫ বৈধ ভোট ৯৭৭২৭

সৈয়দ গোঃ সরোয়ার (জামায়াত)	৫৮৩৫
মজিবর রহমান ফকির (আঃ লীগ)	২৯০১০
নজমুল হুদা (বিএনপি)	৩৪৪৯৩
নূরুল আমিন খান পাঠান (জাপা)	২৭৫৪৬

মোমেনশাহী -৪

ভোটার সংখ্যা ৩০২২৬৬ বৈধ ভোট ১৯৭৯২০

গোলাম রব্বানী (জামায়াত)	৪২০৩
আমির আহমদ চৌধুরী (আঃ লীগ)	৬১৮৩১
ফজলুল হক (বিএনপি)	৫৫৮৩৮
রওশন এরশাদ (জাপা)	৭২১৩০

মোমেনশাহী-৫

ভোটার সংখ্যা ১৭৯০৭৯ বৈধ ভোট ১২০৬৭০

মওঃ সিরাজুল ইসলাম খান (জামায়াত)	৪৭০২
শামসুল হুদা চৌধুরী (আঃ লীগ)	৪৫৭০৬
মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)	৪৮৩৩০
আবদুল বারি (জাপা)	১৯১৬৯

মোমেনশাহী-৬

ভোটার সংখ্যা ১৭৫৫৩২ বৈধ ভোট ১০৭৮২৫

অধ্যাঃ জসিমউদ্দিন (জামায়াত)	১৭৩৭৮
মোসলেম উদ্দীন (আঃ লীগ)	৪৭৮২৭
শামস উদ্দীন আহমদ (বিএনপি)	৩২১৩৮
ডাঃ কে আর ইসলাম (জাপা)	৮৫৮৩

www.pathagar.com

মোমেনশাহী- ৭

ভোটার সংখ্যা ১৭৩৩৭৯ বৈধ ভোট ১০৯১০৪

ফজলুল হক (জামায়াত)	৪৯৩৭
রুহুল আমীন মাদানী (আঃ লীগ)	৪৬৭৭২
আবদুল খালেক (বিএনপি)	২৭০৯০
আবদুল হান্নান (জাপা)	২৯৪৫৬

মোমেনশাহী-৮

ভোটার সংখ্যা ১৫৮৫৪৮ বৈধ ভোট ৯১৪৩৪

ডাঃ ওয়ালি উল্লাহ (জামায়াত)	৫৪৩৮
আবদুস সাত্তার (আঃ লীগ)	৩৪০২৯
খুররম খান চৌঃ (বিএনপি)	১৮১৯০
রওশন এরশাদ (জাপা)	৩২৯০৮

মোমেনশাহী-৯

ভোটার সংখ্যা ১৭৭৯২৯ বৈধ ভোট ১০৫০৫৯

শামসুদ্দীন আহমদ(জামায়াত)	১৭৮৬
মেঃ জেঃ আঃ সালাম (আঃ লীগ)	৪১১৮২
খুররম খান চৌঃ (বিএনপি)	২৮৯২৩
জহুরুল ইসলাম খান (জাপা)	২৯৫২২

মোমেনশাহী -১০

ভোটার সংখ্যা ২০৬৬১৯ বৈধ ভোট ১৪৪৭৪৯

মওঃ নূরুল ইসলাম (জামায়াত)	১৮৩৯
আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ (আঃ লীগ)	৭০৬৬৫
ফজলুর রহমান (বিএনপি)	৪৫৪৪৬
হাবিবুল্লাহ বেলালী (জাপা)	২৫০৮১

মোমোনশাহী- ১১

ভোটার সংখ্যা ১৪৯৯৭২ বৈধ ভোট ১০৯৯৬০

শেখ আঃ রহমান (জামায়াত)	২১০৭
আমানুল্লাহ (আঃ লীগ)	৫৭১৩১
আমানুল্লাহ চৌঃ (বিএনপি)	২৬২০৯
রওশন এরশাদ (জাপা)	২৩৭১৫

মোমেনশাহী+ নেত্রকোনা

ভোটার সংখ্যা ..... বৈধ ভোট ১৪৫৬০১

হানিফ উদ্দিন খান (জামায়াত)	১৯১৪
ওয়ারেসাত হোসেন (আঃ লীগ)	৫২০২৮
ডাঃ মোহাম্মদ আলী (বিএনপি)	৫৬৯২৪
সিরাজুল ইসলাম (জাপা)	৩৩৫৬৬

নেত্রকোনা -১

ভোটার সংখ্যা ২০৭০৭৪ বৈধ ভোট ১৪৯০৭৩

আবদুল কাদির (জামায়াত)	২৭৭২
জালাল উদ্দীন (আঃ লীগ)	৫৯৫৭৪
আবদুল করিম (বিএনপি)	৫৫০২৭
গোলাম রব্বানী (জাপা)	২৯১১৫

নেত্রকোনা-২

ভোটার সংখ্যা ২২৩৬৬১ বৈধ ভোট ১৬৪৭৩১

এনামুল হক (জামায়াত)	৩৯৩৩
ফজলুর রহমান খান (আঃ লীগ)	৭৫৫৯৫
আবু আব্বাস (বিএনপি)	৫২২৫৩
ফকির আশরাফ (জাপা)	৩০৮৬৯

নেত্রকোনা- ৩

ভোটার সংখ্যা ২০৯৩১৬ বৈধ ভোট ১৫৪৮৩৩

আবদুল আজীজ ভূইয়া (জামায়াত)	৩৭৪৮
জুবেদ আলী (আঃ লীগ)	৬২৮১০
নূরুল আমিন (বিএনপি)	৭০৯৪৩
আবদুল মান্নান (জাপা)	১৫৬৫২

নেত্রকোনা -৪

ভোটার সংখ্যা ১৭৪৬৯৪ বৈধ ভোট ১৩৮৫৭৫

শাহজাহান আবদুল্লাহ (জামায়াত)	৩৪৫০
আবদুল মোমিন (আঃ লীগ)	৭০৬৩০
লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)	৫৪৭৯৫
সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু (জাপা)	৮১৬০

কিশোরগঞ্জ- ১

ভোটার সংখ্যা ১৮৭৫৩০ বৈধ ভোট ১৩৫২৮৮

নূরুল হক (জামায়াত)	৫৫৫৬
শামসুল হক (আঃ লীগ)	৫৮২৩৩
ইদ্রিস আলী (বিএনপি)	৩৮২১৬
সোহরাব উদ্দীন (জাপা)	২৯৮৪৮

কিশোরগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা ১৩৮০৪১ বৈধ ভোট ১০৪৩৭৮

রুহুল আমিন (জামায়াত)	৪০৭৯
এম, এ, আফজাল (আঃ লীগ)	২১৫৫০
মেজর আকতারুজ্জামান (বিএনপি)	৪১১২১
মাহমুদুল ইসলাম (জাপা)	২০৯০৩

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা ১৬০৯৯১ বৈধ ভোট ১২১৯১১

মোসাদ্দেক ভূঁইয়া (জামায়াত)	৪৬৮০
আশরাফুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৫১৯১১
মাসুদ হিলালী (বিএনপি)	৩৯৫৯১
নাসিরুদ্দিন (জাপা)	২৫০৭৬

কিশোরগঞ্জ-৪

ভোটার সংখ্যা ১৯৫০৫২ বৈধ ভোট ১৪০৩১৪

আবদুল হাই (জামায়াত)	৫৬৪৯
ডঃ মিজানুল হক (আঃ লীগ)	৫২২২০
কবিরুদ্দিন (বিএনপি)	৩১৫৮৮
মজিবুল হক চুনু(জাপা)	৫০৩৯৩

কিশোরগঞ্জ -৫

ভোটার সংখ্যা ১৯৪১৮৫ বৈধ ভোট ১৪৬২৭২

আবদুস সালাম খান পাঠান (জামায়াত)	২২১১
মোঃ আঃ হামিদ এডঃ (আঃ লীগ)	৫৪০৭৩
ইঞ্জিঃ ইমাদ উল হক (বিএনপি)	২৭২৫১
এরশাদ উদ্দীন আহমদ খান মিন্টি (জাপা)	৮০৪৫
ফজলুর রহমান (স্বতন্ত্র)	৫২০২৪

কিশোরগঞ্জ-৬

ভোটার সংখ্যা ১৬১৪২৯ বৈধ ভোট ১২৩৮৫১

মোঃ রমজান আলী (জামায়াত)	৫২৭৪
মোঃ আলাউল হক (আঃ লীগ)	৪৪২৬১
মোঃ মজিবুর রহমান মঞ্জু (বিএনপি)	৪৭১৭৬
এডঃ নূরুল ইসলাম (জাপা)	২৪২৯২

কিশোরগঞ্জ -৭

ভোটার সংখ্যা ১৮৫১৮৮ বৈধ ভোট ১৫৭৩২৯

মুহাঃ শফিউজ্জামান (জামায়াত)	১৭৪৪
মোঃ জিল্লুর রহমান (আঃ লীগ)	৮৪৭৮২
মোঃ গিয়াস উদ্দিন (বিএনপি)	৬৭৮০৫
মোঃ হারুন (জাপা)	১৯৮২

মানিকগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা ১৪৮২৫৮ বৈধ ভোট ১১৫৫৮৯

মোঃ তাজুল ইসলাম (জামায়াত)	১৯৮১
সায়েদুর রহমান (আঃ লীগ)	৩৩১৬১
খন্দকার দেলোয়ার হোসেন (বিএনপি)	৪৪৫০২
কর্নেল (অঃ) আবদুল মালেক (জাপা)	২৯৯২৯

মানিকগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা ১৫৯০২৩ বৈধ ভোট ১২৭৯৮৩

মোঃ শফিউল্লাহ (জামায়াত)	১৬২১
বিচারপতি নূরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	২৭৭৫০
হারুনুর রশীদ খান (বিএনপি)	৬৪০৮৫
আঃ রউফ খান (জাপা)	২৬৮০৭

মানিকগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা ১৭৮৮৯১ বৈধ ভোট ১৪৫১৫৮

আনোয়ার হোসেন (জামায়াত)	১৯৪৫
জালাল উদ্দিন (আঃ লীগ)	৩০১২৬
নিজাম উদ্দিন (বিএনপি)	৬৪৭১৫
কর্ণেল আঃ মলেক (জাপা)	৪১৫৩২

মানিকগঞ্জ-৪

ভোটার সংখ্যা ১৬৩৮৪৫ বৈধ ভোট ১৩০৮৩২

জাকিরুল ইসলাম খান (জামায়াত)	৯৯৪
মওঃ আলী জিলকত (আঃ লীগ)	৩৮৭৯৬
শামসুল ইসলাম খান (বিএনপি)	৬১৮১৬
গোলাম সরোয়ার মিলন(জাপা)	২৬৮২৩

মুন্সীগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা ১৫৭৮৩৮ বৈধ ভোট ১২৪২৮৮

ডাঃ এ লতিফ (জামায়াত)	৬৩২
কে এম নবী (আঃ লীগ)	৩৬৪৭৩
অধ্যাঃ বি চৌধুরী (বিএনপি)	৬২৭৮৭
শাহ মোয়জ্জেম হোসেন (জাপা)	২০১২০

মুন্সীগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা ১৪৭৪৫৮ বৈধ ভোট ১১৬১০০

অধ্যাঃ ফজলুল করিম (জামায়াত)	৭০১
নজরুল ইসলাম খান (আঃ লীগ)	৩৯০০৩
মিজানুর রহমান সিনহা (বিএনপি)	৫৮৪৫৫
আবুল বাশার (জাপা)	১৪১১৬

মুন্সীগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা ১৪৪৩৬৬ বৈধ ভোট ১১৫৪৩১

ইদ্রিস আলী (জামায়াত)	৭৭৩

www.pathagar.com

লুৎফর রহমান (আঃ লীগ)	৩৪৬৭০
শামসুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৮৭৯১
জামাল হোসেন (জাপা)	৬৭১০

মুন্সীগঞ্জ-৪

ভোটার সংখ্যা ১৬৮১৮৮ বৈধ ভোট ১৩৫৯৫৫

নূরুল হক মাদবর (জামায়াত)	১৩১৪
মহিউদ্দিন (আঃ লীগ)	৫১৪৩০
আবদুল হাই (বিএনপি)	৫৮৭০৪
কলিমুল্লাহ (জাপা)	২১৫৯৭

ঢাকা -১

ভোটার সংখ্যা ৮৬৭৪৬ বৈধ ভোট ৬৯৪২০

মোহাম্মদ উল্লাহ (জামায়াত)	১০৩৭
হাশেম আলী (আঃ লীগ)	২০০০৫
নাজমুল হুদা (বিএনপি)	৩৮১৭২
শহিদ আহমদ (জাপা)	৬১৩৩

ঢাকা-২

ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮২৬ বৈধ ভোট ১০৮১৮২

মিনহাজ উদ্দিন (জামায়াত)	১৫৬৫
আবদুল বাতেন (আঃ লীগ)	৩৪৩৪৪
আবদুল মান্নান (বিএনপি)	৫০৮১৮
আবদুল আলিম (জাপা)	২০৪৯২

ঢাকা-৩

ভোটার সংখ্যা ২৭৫১০৯ বৈধ ভোট ২৩৭১২৭

আবুল হাসেম (জামায়াত)	১৮৫৯
মোঃ শাহজাহান (আঃ লীগ)	৫২৬৬২
আমান উল্লাহ আমান (বিএনপি)	১২৪০৯৬
সাইফুর রহমান (জাপা)	২২০৯৩

ঢাকা- ৪

ভোটার সংখ্যা ৩৩১৬৪১ বৈধ ভোট ২১৮৫০২

শাহজালাল (জামায়াত)	৭৩৬৮
হাবিবুর রহমান মোল্লা (আঃ লীগ)	১০২৯৩৯
সালাহ উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)	৮১৫২২
কাজী জাফর (জাপা)	১৮৩১৭

ঢাকা-৫

ভোটার সংখ্যা ৪০৭৭৩৫ বৈধ ভোট ২৭৮৯৩৯

আশরাফুল হক(জামায়াত)	৭৩৬৬
রহমত উল্লাহ (আঃ লীগ)	১৩২৪৪৩
মেজর কামরুল (বিএনপি)	১০৯৩৭০
মেজর জেঃ দস্তগীর (জাপা)	২৪৫৫৭

ঢাকা-৬

ভোটার সংখ্যা ৩৪৫৪০৯ বৈধ ভোট ২৩১৩১৭

আহমদ উল্লাহ ভূঁইয়া (জামায়াত)	৬৯৭৭
সাবের হোসেন চৌধুরী (আঃ লীগ)	১০৪৬৯৪
মীর্জা আব্বাস (বিএনপি)	৯৫৬৭৩
আবদুস সালাম (জাপা)	১৮৭৯৭

ঢাকা- ৭

ভোটার সংখ্যা ২৬৭০১৪ বৈধ ভোট ১৯৩৭৬০

আবদুস সালাম রেজা (জামায়াত)	৩৪৯৪
ফজলুল করিম (আঃ লীগ)	৮৪৯৪০
সাদেক হোসেন খোকা (বিএনপি)	৮৭২৫৫
জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল (জাপা)	১৩২৮৭

ঢাকা-৮

ভোটার সংখ্যা ২২৫১৪৭ বৈধ ভোট ১৫৭১০৬

সাব্বির আহমদ (জামায়াত)	৩৪৮৬
হাজী সেলিম (আঃ লীগ)	৭৭৬৪২
ব্যরিঃ আবুল হাসানাত (বিএনপি)	৫৮৩৬৭
সাইফুদ্দিন আহমদ (জাপা)	১৪০২২

ঢাকা-৯

ভোটার সংখ্যা ২৮৫৬৫৭ বৈধ ভোট ১৯০০১১

নজরুল ইসলাম (জামায়াত)	৫৬২৬
মকবুল হেসেন (আঃ লীগ)	৮৪১৫০
মীর শওকত আলী (বিএনপি)	৭৫৮৫৫
কাজী ফিরোজ রশিদ (জাপা)	৮৭৩৮
ড; কামাল হোসেন (গণফোরাম)	৫১৮৫
সালমান এফ রহমান (স্ব;বাং আ:)	৬০৬১

ঢাকা-১০

ভোটার সংখ্যা ২৩৯১২৩ বৈধ ভোট ১৫৭০১৫

ডাঃ আবদুস সালাম (জামায়াত)	৪৯৭৩
ডাঃ এইচ বি এম ইকবাল (আঃ লীগ)	৭৪২১৪
মেঃ অবঃ আঃ মান্নান (বিএনপি)	৬৩৬৩১
ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল (জাপা)	১১১১৪

www.pathagar.com

ঢাকা- ১১

ভোটার সংখ্যা ৪০৫৬৬০বৈধ ভোট ২৭০৫০৭

খন্দঃ আঃ মান্নান (জামায়াত)	৮৯৪৬
কামাল আহমেদ মজুঃ (আঃ লীগ)	১২৮৭৬৬
এখলাস উদ্দীন মোল্লা (বিএনপি)	১০২৩০৭
তৈয়বুর রহমান (জাপা)	২৪৯৫৮

ঢাকা- ১২

ভোটার সংখ্যা ২১২৫৭০ বৈধ ভোট ১৫৯২০৩

হাসান মাহবুব (জামায়াত)	৪৪৫০
আশরাফ উদ্দীন ইমু (আঃ লীগ)	৪৭৩৪৩
দেওয়ান মোঃ সালাহউদ্দিন (বিএনপি)	৭১২৪৩
ফিরোজ কবির (জাপা)	৩৩৩৬১

ঢাকা-১৩

ভোটার সংখ্যা ১৬৮৭২২ বৈধ ভোট ১৩৯৬০৭

আবদুর রউফ (জামায়াত)	২৩৮৪
জিয়াউর রহমান খান (বিএনপি)	৭৬৪২৭
শরফুদ্দীন খান (জাপা)	৪৬২৪
খান মোঃ ইকবাল (আঃ লী)	৪৫১৬৪

গাজীপুর-১

ভোটার সংখ্যা ২৭৫৮০৮ বৈধ ভোট ২৩৭৪৫৫

এমদাদুল হক (জামায়াত)	৪৪৯৮
রহমত আলী (আঃ লীগ)	৯৫১২১
তানভীর সিদ্দিকী (বিএনপি)	৮১৮৫৪
মতিউর রহমান (জাপা)	৫৩৬৯৬

গাজীপুর- ২

ভোটার সংখ্যা ৩৩৭৬১০ বৈধ ভোট ২৫৬১৮৭

আবুল হাসেম খান (জামায়াত)	৫৫৪৩
আহসান উল্লাহ (আঃ লীগ)	৯৪৭৩২
এম এ মান্নান (বিএনপি)	৭৯১৬৮
হাসান উদ্দীন সরকার (জাপা)	৭১৫২৮

গাজীপুর -৩

ভোটার সংখ্যা ১১৩৭২৫ বৈধ ভোট ৯৪৬২৭

মোঃ ইউসুফ আলী (জামায়াত)	৫৬০১
আকতারুজ্জামান (আঃ লীগ)	৩৫৫০২
ফজলুল হক মিলন (বিএনপি)	৩০৮৩৪
খান মোঃ আজম (জাপা)	১৯৭০৭

গাজীপুর-৪

ভোটার সংখ্যা ১৪৯২৪১ বৈধ ভোট ১১৭৭৪৯

আবদুর রশিদ (জামায়াত)	৩৪৮৬
আফসার উদ্দীন (আঃ লীগ)	৫৬৫০৪
ব্রিগেঃ হান্নান শাহ (বিএনপি)	৪৯৬২৭
আবদুল মজিদ (জাপা)	৫৮৩৮

নরসিংদী- ১

ভোটার সংখ্যা ১৯৭৩৩৪ বৈধ ভোট ১৪৬৫৮১

মওঃ কামাল উদ্দীন জাফরী (জামায়াত)	৭৯৬৮
আসাদুজ্জামান (আঃ লীগ)	৪৫৩৫৩
সামসুদ্দিন ইসহাক (বিএনপি)	৫৮৩৪২
মেজবাহ উদ্দীন (জাপা)	২৭৪৬৮

নরসিংদী-২

ভোটার সংখ্যা ১২৯৭৯২ বৈধ ভোট ১০৫৪৩১

হেলাল উদ্দীন (জামায়াত)	৪২২৭
হাসানুল হক (আঃ লীগ)	২৩৬০৫
ডঃ মঈন খান (বিএনপি)	৪৫২৪৩
আজমল কবির (জাপা)	২৩৪৪৭

নরসিংদী -৩

ভোটার সংখ্যা ১২১১৯৪ বৈধ ভোট ১০১৩০০

মওঃ এ কে মুসলেউদ্দীন নোমানী (জামায়াত)	১৩৮২
মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া (আঃ লীগ)	২৬৪৪৮
আঃ মান্নান ভূঁইয়া (বিএনপি)	৪৮৯০৬
জাকি উদ্দিন আহমেদ (জাপা)	২১৬৮৮

নরসিংদী-৪

ভোটার সংখ্যা ২০৪২৩২ বৈধ ভোট ১৬৯২০৮

আবু তৈয়ব মোঃ রফিউদ্দিন (জামায়াত)	৩৩৯৫
লেঃ জেঃ অবঃ মোঃ নূর উদ্দীন খান (আঃ লীগ)	৭৮৭২৩
সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল (বিএনপি)	৭৭৬২০
কর্নেল অবঃ আব্দুর রউফ (জাপা)	৬৪৫৪

নরসিংদী -৫

ভোটার সংখ্যা ২১৯৮২৭ বৈধ ভোট ১৬৮১৯৮

মাওঃ মোঃ সোলায়মান মৃধা (জামায়াত)	৩৬৪৫
রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু (আঃ লীগ)	৭৫৬৭২

www.pathagar.com

আবদুল আলী মৃধা (বিএনপি)	৬১৮৬২
মাইন উদ্দীন ভূঁইয়া (জাপা)	২১৭৫৯

নারায়ণগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা ১৬৭৭৬০ বৈধ ভোট ১৩৬৩৪৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন (জামায়াত)	২৫৫৬
কে এম শফিউল্লাহ (আঃ লীগ)	৬৪৮৭৮
আঃ মতিন চৌঃ (বিএনপি)	৫৩৯৭১
মীর ওবায়দুল করিম (জাপা)	১১৮৩৫

নারায়ণগঞ্জ -২

ভোটার সংখ্যা ১৫২০৬৩ বৈধ ভোট ১২৫৯৬৬

অধ্যাঃ ইনিয়াস মোল্লা (জামায়াত)	৩২৫১
এমদাদুল হক ভূঁইয়া (আঃ লীগ)	৫৮৯৪৭
আতাউর রহমান খান (বিএনপি)	৫৮৩৮৮
আলমগীর শিকদার লোটন (জাপা)	৪২৩৮

নারায়ণগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা ১৪১৬৪৫ বৈধ ভোট ১১৬২৭৯

আবু জাফর আতাউল্লাহ (জামায়াত)	১৫৩৬
আবুল হাসানাত (আঃ লীগ)	৩৮৫২৯
রেজ্জাউল করিম (বিএনপি)	৫০৭৯১
বাহাউল হক (জাপা)	২৪৩৯৯

নারায়ণগঞ্জ-৪

ভোটার সংখ্যা ২৬৫৩৩৪ বৈধ ভোট ১৮৯১৬২

নূরুল ইসলাম (জামায়াত)	৩৮৬২
শামীম ওসমান (আঃ লীগ)	৭৩৩৪৯
সিরাজুল ইসলাম (বিএনপি)	৬৩৮৬৬
সফর আলী ভূঁইয়া (জাপা)	৩৮৬৫৩

নারায়ণগঞ্জ- ৫

ভোটার সংখ্যা ১৮০৫৮৭ বৈধ ভোট ১৪৩৯৭৩

আবদুল কাদের (জামায়াত)	৩২৯৯
আবুল কালাম (আঃ লীগ)	৪৩৫৬২
এস এম আকরাম (বিএনপি)	৫৮৪৮৩
নাসিম ওসমান (জাপা)	৩৫৫১০

বাজবাড়ী -১

ভোটার সংখ্যা ১৮৫৩৫৫ বৈধ ভোট ১৪৭৫৫৮

আবদুর রব মোল্লা (জামায়াত)	৫৩৮৫
কাশ্রী কেরামত আলী (আঃ লীগ)	৫১৯৬৫
জাহানারা বেগম (বিএনপি)	৩৬২২২
গোলাম মোস্তফা (জাপা)	৪২৮৮১

রাজবাড়ী-২

ভোটার সংখ্যা ২৫৯২৬০ বৈধ ভোট ২১৯১১১

ডাঃ এ কে এম আসজাদ (জামায়াত)	৪৩০৪
জিল্লুল হাকিম (আঃ লীগ)	৮৮৬৬২
নাসিরুল হক সাবু (বিএনপি)	৬১০৬৩
এ বি এম নুরুল ইসলাম (জাপা)	৬১৬৫৩

ফরিদপুর-১

ভোটার সংখ্যা ২৩৮০৯৩ বৈধ ভোট ১৯৬৭৩৫

মৌঃ হাবিবুর রহমান (জামায়াত)	১২২৯৬
কাজী সিরাজুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৯৩৮৬৪
নাসিরুল ইসলাম (বিএনপি)	৩৯৮৪
শাহ মোঃ জাফর (জাপা)	৮৪৯৮৫

ফরিদপুর-২

ভোটার সংখ্যা ১৫৫৫১২ বৈধ ভোট ১১৯৩৬৬

গোলাম রসুল মিয়া (জামায়াত)	১৯০৯
সাজেদা চৌঃ (আঃ লীগ)	৫৪৫৭২
কে এম ওবাদুর রহমান (বিএনপি)	৫৫১১৮
সাইফুজ্জামান চৌধুরী (জাপা)	২৩২৩

ফরিদপুর-৩

ভোটার সংখ্যা ১৮৬৩৭৯ বৈধ ভোট ১৫৪৩৩৫

আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ (জামায়াত)	১২৩৩৪
ইমরান চৌধুরী (জাপা)	২৫৫৪৭
কামাল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি)	৬০৭৭৯
ডাঃ মশাররফ হোসেন (আঃ লীগ)	৪৪৫১১

ফরিদপুর-৪

ভোটার সংখ্যা ১২৭৩০৯ বৈধ ভোট ৯৪১৯৬

আঃ কাদের মোল্লা (জামায়াত)	৪৯০৬
মোসাররফ হোসেন (আঃ লীগ)	৪৫৫৮০
আকমল ইবনে ইউসুফ (বিএনপি)	৩২৬৩০
আজহারুল হক (জাপা)	৭৫৬২

ফরিদপুর -৫

ভোটার সংখ্যা ১১৮০৮০ বৈধ ভোট ৮৬৫৫৬

শাহেদ আলী (জামায়াত)	২৫৪০

www.pathagar.com

কাজী আবু ইউসুফ (আঃ লীগ) ৫৪৩৫৫
আঃ রউফ খান (বিএনপি) ২১৪৯
লুৎফর রহমান (জাপা) ১৬৬৬৮

গোপালগঞ্জ- ১

ভোটার সংখ্যা ১৮৭৩৫০ বৈধ ভোট ১৩৭৫৫৩
ইমদাদুল হক (জামায়াত) ৫২৩৬
ফারুক খান (আঃ লীগ) ১১৯৫৩৬
খায়রুল বাকী (বিএনপি) ৪৯১৪
জুলফিকার আলী (জাপা) ৩৫০২

গোপালগঞ্জ- ২

ভোটার সংখ্যা ১৭৭৫৪৪ বৈধ ভোট ১৩৩২৭৪
আজমল হোসাইন (জামায়াত) ২৪৪৫
শেখ ফজলুল করিম সেলিম (আঃ লীগ) ১১৫০৩২
শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর (বিএনপি) ৭৮২৫
আবদুস সালাম (জাপা) ৩৯৭৫

গোপালগঞ্জ- ৩

ভোটার সংখ্যা ১৩৯৫৩৯ বৈধ ভোট ১১১৩৯৭
আবদুল মান্নান শেখ (জামায়াত) ২৫১২
শেখ হাসিনা (আঃ লীগ) ১০২৬৮৯
বিষ্ণুপদ হালদার (বিএনপি) ২৫৬৮
কাজী ফিরোজ রশিদ (জাপা) ৪৫৩

মাদারীপুর- ১

ভোটার সংখ্যা ১৩৮৪৫৬ বৈধ ভোট ৯৫১৬৯
মোশাররফ হোসাইন (জামায়াত) ১৭২৪
নূরে আলম চৌঃ (আঃ লীগ) ৬১০১২
আবুল খায়ের চৌঃ (বিএনপি) ২৯৩১২

মাদারীপুর-২

ভোটার সংখ্যা ২০০০৪৬ বৈধ ভোট ১৪৫৬৭৭
সোবহান খান (জামায়াত) ২৮০৩
শাহাজাহান খান(আঃ লীগ) ৯২৪৯২
মাহবুব আহমেদ (বিএনপি) ২৫৩৯৭
গোলাম মওলা (জাপা) ১৭০৩১

মাদারীপুর-৩

ভোটার সংখ্যা ১৭৪৮৬৪ বৈধ ভোট ১২২৬৬৯
ডাঃ ফরিদ উদ্দীন খান (জামায়াত) ৯৩১৭
সৈয়দ আবুল হোসেন (আঃ লীগ) ৭১৯২২
মাসুকুর রহমান (বিএনপি) ২৩৭২০
শেখ শহিদুল ইসলাম (জাপা) ১২১২১

শরীয়তপুর- ১

ভোটার সংখ্যা ১৭৬৬৬৬ বৈধ ভোট ১৩০৯৯৪
সাইফুল আলম খান (জামায়াত) ৪৯৫৩
আব্দুর রাজ্জাক (আঃ লীগ) ৬৮৯৩৭
আমজাদ হোসেন (বিএনপি) ৩২২৬৬
গিয়াস উদ্দীন (জাপা) ৯৩৮

শরীয়তপুর-২

ভোটার সংখ্যা ১১২৭৭৮ বৈধ ভোট ৮২৩৩৯
সৈয়দ হাবিবুর রহমান (জামায়াত) ১৭৪৪
জাকির হোসেন (জাপা ৮১৯১
জি. এম. গিয়াস উদ্দীন (বিএনপি) ২০৬২৬
কর্ণেল শওকত আলী (আঃ লীগ) ৪৮৭৫৩

শরীয়তপুর-৩

ভোটার সংখ্যা ২২১৬৩১ বৈধ ভোট ১৭২৪৩২
মোস্তফা সরওয়ার (জামায়াত) ৬০০৫
আবদুল মতিন মিয়া (জাপা) ১৬৫০
শফিকুর রহমান (বিএনপি) ৭৭৩৩৯
আবদুর রাজ্জাক (আঃ লীগ) ৮২৫৪৩

সিলেট বিভাগ

সুনামগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা ২২৪৪৮২ বৈধ ভোট ১৬৪৪১৪
মুসলেহ উদ্দিন (জামায়াত) ৬৩৪৫
সৈয়দ রফিকুল হক (আঃ লীগ) ৬৮৭৮৭
নাজির হোসেন (বিএনপি) ৬৭৩১২
আলী আমজাদ (জাপা) ১৬৬৬৮

সুনামগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা ১৪৫৩৯৬ বৈধ ভোট ১২১১৯২
মোঃ আবদুল মান্নান (জামায়াত) ১১০৪
সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (আঃ লীগ) ৫৮৪৯৬
জহির আহমেদ চৌঃ (বিএনপি) ১৮৬৮
নাছির উদ্দীন চৌঃ (জাপা) ৫৯০০০

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ-৩

ভোটার সংখ্যা ১৫৮২৭৭ বৈধ ভোট ১০৮০০৭

সৈয়দ সালেহ আহমেদ (জামায়াত)	৩১০৭
আবদুস সামাদ আজাদ (আঃ লীগ)	৪২৮৫১
দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন (বিএনপি)	১৭৪৫১
ফারুক রশীদ চৌধুরী (জাপা)	৩২৩২৮

সুনামগঞ্জ -৪

ভোটার সংখ্যা ১৫৩৬৬৮ বৈধ ভোট ১০৯১৮৬

মোঃ হাতিমুর রহমান (জামায়াত)	৬৯৪০
আবদুজ জহুর (আঃ লীগ)	৩৪৩৬০
ফজলুল হক (বিএনপি)	৩৬১৫৫
মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌঃ (জাপা)	৩১২০৯

সুনামগঞ্জ- ৫

ভোটার সংখ্যা ২১৯৭৯০ বৈধ ভোট ১৪৭৭৮২

আবদুল্লাহ মোহাঃ সালেহ (জামায়াত)	১০০৬৭
মহিবুর রহমান (আঃ লীগ)	৪২৭২০
করিম উদ্দীন (বিএনপি)	৩৩৮৭৫
ব্যারিঃ ইয়াহিয়া (জাপা)	৪১১২০

সিলট-১

ভোটার সংখ্যা ২৭৫১২৫ বৈধ ভোট ১৮৩২৮০

ডাঃ শফিকুর রহমান (জামায়াত)	১৮০২৯
হুমায়ুন রশীদ চৌঃ (আঃ লীগ)	৫৯৭১০
সাইফুর রহমান (বিএনপি)	৫৮৯৯০
বাবরুল হোসেন (জাপা)	৪০১৭৫

সিলেট - ২

ভোটার সংখ্যা ২০২৪১১ বৈধ ভোট ১৩১৪৯৭

আবদুল হান্নান (জামায়াত)	৬৩৮২
শাহ আজিজুর রহমান (আঃ লীগ)	৪২২৬৬
ইলিয়াস আলী (বিএনপি)	৩৮৪৭৩
মকসুদ ইবনে আজীজ (জাপা)	৩৯০৪৪

সিলেট-৩

ভোটার সংখ্যা ১২৯৮৪৭ বৈধ ভোট ৯০৮৭৯

আবদুল বাছিত (জামায়াত)	৬৭৫৫
মাহমুদুস সামাদ (আঃ লীগ)	২৬১৬৮
শফিউদ্দিন আহমদ (বিএনপি)	২৫৯৫৪
আবদুল মুকিত খান (জাপা)	২৬৬৫৯

সিলেট ৪

ভোটার সংখ্যা ১৫০২১৩ বৈধ ভোট ৯২৯২৮

আবদুল মান্নান (জামায়াত)	৩০৯৫
ইমরান আহমেদ (আঃ লীগ)	২২৭২৫
সাইফুর রহমান (বিএনপি)	২৩৯৪৬
সিরাজ উদ্দীন (জাপা)	১০৫৭৮

সিলেট -৫

ভোটার সংখ্যা ১৮৭৩০৩ বৈধ ভোট ১১৬৮৯১

মওঃ ফরিদ উদ্দীন চৌঃ (জামায়াত)	২৮১২০
হাফিজ আহমদ (আঃ লীগ)	২৯৪৮৩
এম এ মতিন (বিএনপি)	৪৮৬০
আবদুর রকিব (জাপা)	১৫০৫৪

সিলেট -৬

ভোটার সংখ্যা ২২৩৮৩১ বৈধ ভোট ১৫২০৭৬

মওঃ হাবিবুর রহমান (জামায়াত)	১৪১৬৩
নূরুল ইসলাম নাহিদ (আঃ লীগ)	৫৩৯৬৫
ডঃ মকবুল হোসেন (বিএনপি)	৩১৯৭০
মোজাম্মিল আলী (জাপা)	৩৪৬৯১

মৌলভী বাজার-১

ভোটার সংখ্যা ১০৭৪১১ বৈধ ভোট ৮৩৭৫৭

আবদুল মালিক (জামায়াত)	৮৯৫৮
শাহাবুদ্দিন (আঃ লীগ)	৩৩১৭৯
এবাদুর রহমান চৌঃ (বিএনপি)	২০০৪৭
মাওক আহমেদ (জাপা)	১৫৩৩৫

মৌলভী বাজার-২

ভোটার সংখ্যা ১৭৭০৩৫ বৈধ ভোট ১৩৩৬৩৫

খন্দঃ আঃ সোবহান (জামায়াত)	৫১১০
সুলতান মনসুর আহমদ (আঃ লীগ)	৫২৫৮২
মাকসুদ শাহীন (বিএনপি)	৩১৩০৪
নবাব আলী আব্বাস (জাপা)	৩৯৯৯২

মৌলভী বাজার -৩

ভোটার সংখ্যা ১২৫৩৬৪ বৈধ ভোট ১৭০০৮২

সিরাজুল ইসলাম মতলিব (জামায়াত)	৩৫৩০
আজিজুর রহমান (আঃ লীগ)	৬৩১৭৭
সাইফুর রহমান (বিএনপি)	৮৪২৯২
গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী (জাপা)	১৫১৭০

www.pathagar.com

মৌলভীবাজার-৪

ভোটার সংখ্যা ২৩৭৬৬৬ বৈধ ভোট ১৭৯৯২১

আবদুল গনি তরফদার (জামায়াত)	২৬৮৪
আবদুস শহীদ (আঃ লীগ)	৯১৮১১
শফিকুর রহমান (বিএনপি)	২৪৪৮৮
আহমদ মিয়া (জাপা)	৫৯৮২৫

হবিগঞ্জ-১

ভোটার সংখ্যা ২০৩৩০৬ বৈধ ভোট ১৩৮২৭০

গোলাম রহমান চৌঃ (জামায়াত)	৩৩৯৩
দেওয়ান ফরিদ গাজী (আঃ লীগ)	৫২৯৪০
শেখ সুজাত মিয়া (বিএনপি)	২৭২৪৮
খলিলুর রহমান চৌঃ (জাপা)	৪৪১১৩

হবিগঞ্জ-২

ভোটার সংখ্যা ১৭৬৪০৭ বৈধ ভোট ১২৮৫৫৫

মওঃ আশরাফ উদ্দিন (জামায়াত)	৪৯১৯
শরিফ উদ্দিন (আঃ লীগ)	৫১৩৬৯
জাকারিয়া খান (বিএনপি)	৩৪৫৩০
সিরাজুল হোসেন খান (জাপা)	৩২৩৬১

হবিগঞ্জ -৩

ভোটার সংখ্যা ১৮১৬০৫ বৈধ ভোট ১২৯৩৭৯

শাহ আলম হোসাইন (জামায়াত)	২৬৭০
শহিদ উদ্দিন চৌঃ (আঃ লীগ)	৪৫৪৯৩
আতিকুল্লাহ (বিএনপি)	৫৫০৫
আবু লেইস মোঃ মুবিন (জাপা)	৫৫৭৯৫

হবিগঞ্জ -৪

ভোটার সংখ্যা ২৫১৩০৬ বৈধ ভোট ১৮৯৩১২

মুখলেসুর রহমান(জামায়াত)	২৬১১
এনামুল হক (আঃ লীগ)	৭০২৪০
সৈয়দ মোঃ ফয়সাল (বিএনপি)	৫৯৬৬৬
মেসবাহুল রব চৌঃ (জাপা)	৪৯৪০৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

বিঃ বাড়ীয়া -১

ভোটার সংখ্যা ১২১১০৫ বৈধ ভোট ৯১৫৫৬

আলী আজম (জামায়াত)	১০৮৯
ছায়েদুল হক (আঃ লীগ)	৩৩৩৭৯
সফি মাহমুদ (বিএনপি)	২৬৭১৪
আহসানুল হক (জাপা)	২৮২৮০

বিঃ বাড়ীয়া -২

ভোটার সংখ্যা ১৮৩৫৪১ বৈধ ভোট ১৪১৭৪০

শেখ মোঃ সহিদুল ইসলাম (জামায়াত)	১০৭৪
আবদুল হালিম (আঃ লীগ)	৪৬৬৮২
আবদুস সাত্তার ভূইয়া (বিএনপি)	৫৩৯৩২
মোবারক হোসেন (জাপা)	১৬৮২৯
মুফতী ফজলুল হক আমিনী	১২৫৬৭

বিঃ বাড়ীয়া -৩

ভোটার সংখ্যা ২৮৭৭১৯ বৈধ ভোট ২২১৬৩৭

রোস্তম আলী সরকার (জামায়াত)	৪৮৪২
লুৎফুল হাই সাচ্চু (আঃ লীগ)	৭২৫২৫
হারুন আল রশিদ (বিএনপি)	৭৭২০৪
হুমায়ূন কবির (জাপা)	৬৪৩৪৭

বিঃ বাড়ীয়া-৪

ভোটার সংখ্যা ১৭৪৩০১ বৈধ ভোট ১৩২৪০০

নজরুল ইসলাম খাদেম (জামায়াত)	৭৯১৩
শাহ আলম (আঃ লীগ)	৪১৬১৫
আবদুল্লাহ ওয়াজেদ (বিএনপি)	৩৮৮৫
শহিদুল হোসেন (জাপা)	৪০৯৮৯

বিঃ বাড়ীয়া-৫

ভোটার সংখ্যা ১৯২০১০ বৈধ ভোট ১৩১৯৯২

মোঃ ইদ্রিস (জামায়াত)	৪৫৩৬
আবদুল লতিফ (আঃ লীগ)	৬০৪৭৪
তকদির হোঃ মোঃ জসিম (বিএনপি)	৩৯৩৭১
জিয়াউল হক (জাপা)	২৫০৭১

বিঃ বাড়ীয়া- ৬

ভোটার সংখ্যা ১৩১৮২২ বৈধ ভোট ১০০২৯৮

দেওয়ান মোঃ নকিবুল হুদা (জামায়াত)	১১৯৬
তাজুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৮৮৭২
রৌশন আলম (বিএনপি)	৩৯৫৩১
নূর মোহাম্মদ (জাপা)	৭৬৩৭

কুমিল্লা -১

ভোটার সংখ্যা ১৬৩৬০৪ বৈধ ভোট ১০১৩৫১

আঃ আজিজ মোল্লা (জামায়াত)	৫৪৪

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর আলম (আঃ লীগ)	২৯৫৯৪
এম কে আনোয়ার (বিএনপি)	৬৯৩৫৬
মাহাবুবুল হক দোলন (জাপা)	৮৪৩

কুমিল্লা- ২

ভোটার সংখ্যা ২৩২৬৮৪ বৈধ ভোট ১৫৭২৩৭

আঃ মমিন সরকার (জামায়াত)	৪৪৬১
আবদুর রশিদ ইঞ্জিয়ার (আঃ লীগ)	১৬৭৯২
ডঃ মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)	৬৯১৭৫
হাসান জামিল সাত্তার (জাপা)	৬৪৪৬১

কুমিল্লা-৩

ভোটার সংখ্যা ২০৮৩১৯ বৈধ ভোট ১৫৭৪২৩

জসিম উদ্দীন সরকার (জামায়াত)	৩৫৭৯
ইউসুফ আঃ হারুন (আঃ লীগ)	৫০০৬৩
রফিকুল ইসলাম মিয়া (বিএনপি)	৪৭৭৬৩
কাজী কায়কোবাদ (জাপা)	৫৩৮৯২

কুমিল্লা-৪

ভোটার সংখ্যা ১৭৩৩১৩ বৈধ ভোট ১২৬৮৭৩

মোস্তফা হোসাইন (জামায়াত)	৭২৪৭
ফখরুল ইসরাম মুন্সী (আঃ লীগ)	৩৩৬১১
মঈনুল আহসান মুন্সী (বিএনপি)	৪৬১৩৫
গোলাম মোস্তফা (জাপা)	৩৯২০৯

কুমিল্ল-৫

ভোটার সংখ্যা ১৮৫৬২৩ বৈধ ভোট ১৩১৪১৭

মেজর অবঃ আবদুর রউফ (জায়াত)	১০০৩৮
আবদুল মতিন খসরু (আঃ লীগ)	৫১১৮৪
আবুল কাশেম (বিএনপি)	৩৮৩৭৮
ওহিদুন্নবী (জাপা)	৩০২৯৫

কুমিল্লা-৬

ভোটার সংখ্যা ১৩৩২৯৪ বৈধ ভোট ৯৭৪২১

ইসমাইল মিয়া (জামায়াত)	২১৫৭
আলী আশরাফ (আঃ লীগ)	৩৭০৯০
রেদোয়ান আহমেদ (বিএনপি)	৩৬৭২৪
লুৎফর রেজা (জাপা)	৬৩৬
কর্ণেল অবঃ রশিদ (ফ্রিডম)	২০০৯৭

কুমিল্লা- ৭

ভোটার সংখ্যা ১৫৩৩৭২ বৈধ ভোট ১১১৩৯১

দেলোয়ার হোসেন (জামায়াত)	২৭৯৭
আবদুল হাকিম (আঃ লীগ)	৪৪,৮৩২
আবু তাহের (বিএনপি)	৪১২২৪
নূরুল ইসলাম মিলন (জাপা)	২০৭৫১

কুমিল্লা-৮

ভোটার সংখ্যা ১৬৯৮৭৪ বৈধ ভোট ১১৬৬৯৯

আমিনুল হক (জামায়াত)	৫৪৮১
সামছুল হক (আঃ লীগ)	৩৮৫৫৭
কর্ণেল আকবর হোসেন (বিএনপি)	৫১০৮০
আনসার আহমেদ (জাপা)	২০৬৯৭

কুমিল্লা-৯

ভোটার সংখ্যা ১৪৬৬২১ বৈধ ভোট ১১১৫৩৫

ইঞ্জিঃ মোস্তফা কামাল (জামায়াত)	২৬০২
মোস্তফা কামাল (আঃ লীগ)	৫৭১৯৫
মতিউল ইসলম (বিএনপি)	৩০১০
মনিরুল হক চৌঃ (জাপা)	৪৭৫৭০

কুমিল্লা-১০

ভোটার সংখ্যা ১৮৫০৬১ বৈধ ভোট ১৩৪৪৯৫

রেজাউল করিম (জামায়াত)	১৩২৮৫
তাজুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৪৯২৯৮
এটি এম আলমগীর (বিএনপি)	৪৬৪৭৯
মোকছেদ আলী (জাপা)	২৩৬০৫

কুমিল্লা-১১

ভোটার সংখ্যা ১৩০৮৮৫ বৈধ ভোট ৭৬৮৮৭

সালেহ উদ্দীন (জামায়াত)	৪৮৮৪
জয়নাল আবেদীন (আঃ লীগ)	৩৮৩৮২
ডাঃ কামরুজ্জামান (বিএনপি)	২৭৯১৫
মঈনুদ্দীন (জাপা)	৪৬৯০

কুমিল্লা-১২

ভোটার সংখ্যা ১৬১৭৬৯ বৈধ ভোট ১০৭০৫২

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের (জামায়াত)	২৫৯৮৪
মজিবুল হক (আঃ লীগ)	৪৯৭৬৭

www.pathagar.com

আবদুল গফুর (বিএনপি) ৭২৫৫
কাজী জাফর আহমদ (জাপা) ২২৪৭৮

চাঁদপুর-১

ভোটার সংখ্যা ১৪১৪৩৪ বৈধ ভোট ৯৮৩৭৮
মৌঃ হারুনর রশিদ (জামায়াত) ২৯৫৮
মেসবাহ উদ্দীন (আঃ লীগ) ৩১২১৪
এহসানুল হক মিলন (বিএনপি) ৩৪২৪০
ওয়াহিদুর রহমান (জাপা) ১২৫৫৫

চাঁদপুর- ২

ভোটার সংখ্যা ১৫৫৯২৭ বৈধ ভোট ১২২২৯৬
আবুল বাশার (জামায়াত) ১০৮০
মোফাজ্জাল হোঃ চৌঃ মায়া (আঃ লীগ) ৭৫৩৮৪
নুরুল হুদা (বিএনপি) ২৪০৯৬
মঈনুদ্দীন (জাপা) ১০২৮১

চাঁদপুর - ৩

ভোটার সংখ্যা ১৪৬০৫৪ বৈধ ভোট ৯৯৪৮১
অধ্যক্ষ আ: রব (জামায়াত) ৬২৮৫
হারুন অর রশীদ খান (জাপা) ১৫৯৭৭
এম ফজলুল হক (বিএনপি) ৩৯৪১৫
এস বি সিদ্দিকী (আঃ লীগ) ৩২৪১৯

চাঁদপুর- ৪

ভোটার সংখ্যা ১৯২১৮৯ বৈধ ভোট ১২৭৯৯৩
মৌঃ হাবিবুল্লাহ (জামায়াত) ৪১১৪
ফজলুল হক সরকার (আঃ লীগ) ৪৮৫৮১
অধ্যাঃ আবদুল্লাহ (বিএনপি) ৬৩০৫০
সালেহ আহমেদ (জাপা) ৮৪০১

চাঁদপুর-৫

ভোটার সংখ্যা ২১০৮৮৩ বৈধ ভোট ১৫১৫৮৪
মাহবুবুর রহমান (জামায়াত) ৬৩১৯
রফিকুল ইসলাম (আঃ লীগ) ৬২৩০৯
এম এম মতিন (বিএনপি) ৬১৮৯৫
তফাজ্জাল হায়দার (জাপা) ১৮৭০০

চাঁদপুর -৬

ভোটার সংখ্যা ১৬৬৬৫১ বৈধ ভোট ৯৭৬৭০
আহমদ উল্লাহ মিয়া (জামায়াত) ৫০২২
মোঃ শফিউল্লাহ (আঃ লীগ) ২৯৯২৪
আলমগীর হায়দার খান (বিএনপি) ৪৮৪৮২
মওলানা এম এ মান্নান (জাপা) ১৩০৫৮

ফেনী-১

ভোটার সংখ্যা ১৫৭২৪৮ বৈধ ভোট ১১৭১৫১
মোহাঃ ইউনুছ (জামায়াত) ৮৪৮০
ওয়াজি উল্লাহ ভূঞা (আঃ লীগ) ২৪১২৮
খালেদা জিয়া (বিএনপি) ৬৫০৮৬
জাফর ইমাম (জাপা) ১৫৮৯৭

ফেনী-২

ভোটার সংখ্যা ২১২৪৪৬ বৈধ ভোট ১৫৩৩৫৯
লিয়াকত আলী (জামায়াত) ১১৯৩৩
জয়নাল হাজারী (আঃ লীগ) ৬৮৫৬৬
ফেরদৌস কোরেশী (বিএনপি) ৬২৬৪৭
জাফর ইমাম (জাপা) ১৫০৭

ফেনী- ৩

ভোটার সংখ্যা ১৬৬৬৫১ বৈধ ভোট ১২২২৩২
শামসুদ্দীন (জামায়াত) ৮৪০৩
জয়নাল হাজারী (আঃ লীগ) ৪২১৮২
মোশাররফ হোসেন (বিএনপি) ৫৮৪৩৯
মজিবুল হক (জাপা) ১৫৭৮

নোয়াখালী-১

ভোটার সংখ্যা ১০১৭১২ বৈধ ভোট ৬৭৩৭৭
শাহ আবু শাকের জাকারিয়া (জামায়াত) ৪৬৮২
ডি ভি মোস্তফা (আঃ লীগ) ১৫৪৪০
জয়নাল আবেদনী ফারুক (বিএনপি) ৩১১৮৭
মওদুদ আহমদ (জাপা) ১৫১৮১

নোয়াখালী-২

ভোটার সংখ্যা ৩০১৭০৯ বৈধ ভোট ১৮৪০৫৫
মৌঃ নূরুল্লাহ (জামায়াত) ১৪৮৯৪
এম এ সাত্তার (আঃ লীগ) ৫৩৯৮৭
বরকতুল্লাহ ভুলু (বিএনপি) ৮৪৩০৭
মোরশেদ আলম (জাপা) ২৭৩৭৫

নোয়াখালী-৩

ভোটার সংখ্যা ৮৯৮৪৮ বৈধ ভোট ৫৬৩২১
মোহাম্মদ উল্লাহ (জামায়াত) ৬০৩৮

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমান কেনায়েত (আঃ লীগ)	১৬৪৫৮
মাহবুবুর রহমান (বিএনপি)	২৫৫৭০
আবু সুফিয়ান (জাপা)	৫৮৯৫

নোয়াখালী-৪

ভোটার সংখ্যা ২২৬৮৬১ বৈধ ভোট ১৩৪৩২৪

বোরহান উদ্দীন (জামায়াত)	১০৯২৭
খায়রুল আনাম (আঃলীগ)	৫৩৪১৩
মোঃ শাহজাহান (বিএনপি)	৬১৬৩২
ফজলে এলাহী (জাপা)	৬৮২৩

নোয়াখালী-৫

ভোটার সংখ্যা ১৭২০২৯বৈধ ভোট ১০৯৬৭৮

আ.ন.ম. আবদুহু জাহের (জামায়াত)	১৭৪৪৫
ওবায়দুল কাদের (আঃ লীগ)	৪০২৮০
এনামুল হক (বিএনপি)	২১৯২৯
মওদুদ আহমেদ (জাপা)	২৮৭৪৪

নোয়াখালী -৬

ভোটার সংখ্যা ১৩৫২৭০ বৈধ ভোট ৮৫০৯৭

আবুল হোসেন (জামায়াত)	১২৯৫
ওয়ালিউল্লাহ (আঃ লীগ)	২৭৩৫৮
ফজলুল আজিম (বিএনপি)	৩০১৪৮
মোহাম্মদ আলী (জাপা)	২৫৩৬০

লক্ষীপুর-১

ভোটার সংখ্যা ১০৯৪৪৫ বৈধ ভোট ৬৫০৬৩

লুৎফর রহমান (জামায়াত)	৮৮৪৩
শফিকুল ইসলাম (আঃ লীগ)	১৭২৪৪
জিয়াউল হক (বিএনপি)	২৮৫৭৭
মুনির আহমেদ (জাপা)	৯৩৪৫

লক্ষীপুর-২

ভোটার সংখ্যা ১৮৩৮৪৫ বৈধ ভোট ১১৪৩২৭

আঃ জব্বার (জামায়াত)	১৯৬৭৭
তোজাম্মেল হোসেন (আঃ লীগ)	২৬৯৩৭
বালেদা জিয়া (বিএনপি)	৫৯০৫৪
খুরশীদ আলম (জাপা)	৬২৯৪

লক্ষীপুর-৩

ভোটার সংখ্যা ১৬৪০৭০ বৈধ ভোট ৯৬৬২৯

শফিকুল্লাহ (জামায়াত)	১৬১২৪
শাহাজাহান কামাল (আঃ লীগ)	২৭৭৮৭
খায়রুল এনাম (বিএনপি)	৪২২৩২
মোহাম্মদদুল্লাহ (জাপা)	৮২২৬

লক্ষীপুর-৪

ভোটার সংখ্যা ১৫৫৩০৯ বৈধ ভোট ৯৫৭৫০

ডাঃ রেদোয়ান উল্লাহ শাহেদী (জামায়াত)	৮৫৭৫
আবদুল ওয়াহেদ (আঃ লীগ)	১৩৪৬৫
আবদুর রব চৌঃ (বিএনপি)	৩৫০৩১
আ.স.ম আবদুর রব (জাসদ)	৩৭২৮২

চট্টগ্রাম-১

ভোটার সংখ্যা ১৭৫৩৪৩ বৈধ ভোট ১৩৭৭০৭

বদিউল আলম (জামায়াত)	৬১০২
মোশাররফ হোসেন (আঃ লীগ)	৬২০৪৩
বেগম খালেদা জিয়া (বিএনপি)	৬৬৩৩৬
আলী আশরাফ (জাপা)	২৩৮২

চট্টগ্রাম-২

ভোটার সংখ্যা ১৩৬৫৮৬ বৈধ ভোট ১০৪৬৩৫

শফিকুল মওলা (জামায়াত)	৭৪৮৮
আবুল কাশেম (আঃ লীগ)	৪৫৪৭৮
এল কে সিদ্দিকী (বিএনপি)	৪৩১২১
দিদারুল কবির (জাপা)	৭৬০২

চট্টগ্রাম-৩

ভোটার সংখ্যা ১২১৮৯৯ বৈধ ভোট ৭৯৬৫৩

নূরুল হুদা ইল্লিঃ (জামায়াত)	৪৬০০
মোস্তাফিজুর রহমান (আঃ লীগ)	৪০৯১১
মোস্তফা কামাল পাশা (বিএনপি)	৩৩৫৫৭
রফিকুল মওলা (জাপা)	২৬৪

চট্টগ্রাম -৪

ভোটার সংখ্যা ১৯৭০৫৩ বৈধ ভোট ১৩৭৯৫৪

জাহাঙ্গীর চৌঃ (জামায়াত)	৮৫২৯
রফিকুল আনোয়ার (আঃ লীগ)	৭২৫৩৬
জামাল উদ্দীন আহমেদ (বিএনপি)	৫৫৭০৩
জহির উদ্দীন চৌঃ (জাপা)	৩৩৮

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম-৫

ভোটার সংখ্যা ১৭০৮৪৩ বৈধ ভোট ১২০২৫৬

ওমর ফারুক (জামায়াত)	৫০৭৫
আবদুস সালাম (আঃ লীগ)	৪২৩১১
ওয়াহিদুল আলম (বিএনপি)	৫৭০১০
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (জাপা)	১২৯৬৪

চট্টগ্রাম -৬

ভোটার সংখ্যা ১৪৩৩৭২ বৈধ ভোট ৯৫৫৯৭

জামাল হোসাইন (জামায়াত)	১৫০৪
ফজল করিম (আঃ লীগ)	৩৫৯৯৩
গিয়াস কাদের চৌঃ (বিএনপি)	৫০০৫৯
জিয়াউদ্দিন বাবলু (জাপা)	৬৪০০

চট্টগ্রাম -৭

ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮৮২ বৈধ ভোট ৯৪৪১৪

আমীরুজ্জামান (জামায়াত)	৩৭০৯
সাদেক চৌঃ (আঃ লীগ)	৩৪৭৫৪
সাঃ কাঃ চৌধুরী (বি.এন.পি)	৩৯২৯৬
নজরুল ইসলাম (জাপা)	৮৯৩

চট্টগ্রাম-৮

ভোটার সংখ্যা ৩৫১৪৭৬ বৈধ ভোট ২৪৭৩৭৭

আবু তাহের (জামায়াত)	১৯৮০৩
আফসারুল আমীন (আঃ লীগ)	১০৬৩৪১
আমীর খসরু মাঃ চৌধুরী (বিএনপি)	১১৬৫৪৭

চট্টগ্রাম-৯

ভোটার সংখ্যা ৩০৪৪৭০ বৈধ ভোট ২০৩৩৭২

আফসার উদ্দীন চৌঃ (জামায়াত)	১০৭২৪
এম এ মান্নান (আঃ লীগ)	৯৯২৪০
আবদুল্লাহ আল নোমান (বিএনপি)	৮৫১৭১
জাহাঙ্গীর আলম (জাপা)	৪৪৫৪

চট্টগ্রাম -১০

ভোটার সংখ্যা ২৩৭৪২....বৈধ ভোট ১৭৪৬৭৬

শওকত ওসমান চৌঃ (জামায়াত)	৬৪৩৩
নূরুল ইসলাম (আঃ লীগ)	৭৭০৮৮
মোরশেদ খান (বিএনপি)	৮১৭১৪
মোহাম্মদ আলম (জাপা)	৬৪৯৩

চট্টগ্রাম -১১

ভোটার সংখ্যা ১৫৭৭৬০ বৈধ ভোট ১১৬৫৭৫

রফিকুল ইসলাম (জামায়াত)	৩৭১২
মোসলেম উদ্দীন (আঃ লীগ)	৪২৭৭৪
গাজী মোঃ শাহজাহান (বিএনপি)	৪৯২৪৮
শামসুল আলম মাষ্টার (জাপা)	১৭১৪৮

চট্টগ্রাম -১২

ভোটার সংখ্যা ১৫৮৫০০ বৈধ ভোট ১১১৬২৩

শামসুদ্দিন আহমদ (জামায়াত)	৪২১২
আতাউর রহমান কায়সার (আঃ লীগ)	৪১৯০১
সরোয়ার জামাল নিজাম (বিএনপি)	৫২৭৯২
সাহাদত হোসেন (জাপা)	৮৯২৬

চট্টগ্রাম -১৩

ভোটার সংখ্যা ১২৯৭৮৩ বৈধ ভোট ১০০৭৯২

শামসুল ইসলাম (জামায়াত)	৬৪৩৩
নজরুল ইসলাম চৌধুরী (আঃ লীগ)	৩০৭২৮
অলি আহমদ (বিএনপি)	৬২৩২৩
মৃদুল গুহ (জাপা)	৬৫১

চট্টগ্রাম- ১৪

ভোটার সংখ্যা ২২৩০৬৪ বৈধ ভোট ১৫৭৩৫৫

শাহজাহান চৌধুরী (জামায়াত)	৪১৮৬০
মইনুদ্দীন হাসান চৌঃ (আঃ লীগ)	৩৫৪৩২
অলি আহমদ (বিএনপি)	৭৫৮৫৫
ইব্রাহীম খলিল (জাপা)	১২০৮

চট্টগ্রাম -১৫

ভোটার সংখ্যা ১৭৬৬৮০ বৈধ ভোট ১১৯৫৭৫

মৌঃ মোমিনুল হক চৌ (জামায়াত)	১৮০৭০
সুলতানুল কবির (আঃ লীগ)	৩৪০৭৬
জাফরুল ইসলাম (বিএনপি)	৪৫৩৯২
মাহমুদুল ইসলাম (জাপা)	১৮৬২২

কক্সবাজার-১

ভোটার সংখ্যা ২১১৫৩৮ বৈধ ভোট ১৫৭০২৬

এনামুল হক মঞ্জু (জামায়াত)	২৭০৫৪
সালাহউদ্দীন (আঃ লীগ)	৭২৫৯৪
সালাহউদ্দীন (বিএনপি)	৫০৮২৯
মনোয়ার আলম (জাপা)	১০৮৩

www.pathagar.com

কক্সবাজার-২

ভোটার সংখ্যা ১৫৬১০৯ বৈধ ভোট ১০৯৮২৫

শফি উল্লাহ কুতুবি (জামায়াত)	২১৮৫৯
সিরাজুল মোস্তফা (আঃ লীগ)	৩২৪৪৩
মাহফুজুল্লাহ ফরিদ (বিএনপি)	৪৪৪৪৫
জহিরুল ইসলাম (জাপা)	৫৭৯৩

কক্সবাজার -৩

ভোটার সংখ্যা ২১৩০৯৮ বৈধ ভোট ১৫৯৪৫১

সালামাতুল্লাহ (জামায়াত)	৩০৯০১
মোসতাক আহমদ (আঃ লীগ)	৪১৪০৫
খালেকুজ্জামান (বিএনপি)	৬৯১১৯
নুরুল আবছার (জাপা)	১৩১২৪

কক্সবাজার -৪

ভোটার সংখ্যা ১৪৫৯৬১ বৈধ ভোট ১০০৯৫৫

শাহজালাল চৌঃ (জামায়াত)	১৭৬০৭
মোহাম্মদ আলী (আঃ লীগ)	৪৪৭০৬
শাহজাহান চৌঃ (বিএনপি)	৩০৫৯৪
শাহ আবুল মঞ্জুর	৮০৪৮

খাগড়াছড়ি

ভোটার সংখ্যা ২১৬৫৩২ বৈধ ভোট ১৩৮৮৪৭

আবদুল মোমেন (জামায়াত)	৩০২৪
কল্পরঞ্জন চাকমা (আঃ লীগ)	৫৮০৫৮
ওয়াদুদ ভূইয়া (বিএনপি)	৪৮০২৩
আলীমুল্লাহ (জাপা)	১০৪৩৩

রাঙ্গামাটিঃ

ভোটার সংখ্যা ২৩৪৯৬২ বৈধ ভোট ১৩৫৪৮৭

শহীদুল্লাহ (জামায়াত)	৬২৪৬
দীপঙ্কর তালুকদার (আঃ লীগ)	৬৩১০১
পারিজাত কুসুম চাকমা (বিএনপি)	৩৮৪০৯
মোঃ শাহজাহান (জাপা)	২৪০৭

বান্দরবান

ভোটার সংখ্যা ১৩৩১১৮ বৈধ ভোট ৭৮৮৬০

আমিনুল হক আজাদ (জামায়াত)	৮৯০৯
বীর বাহাদুর (আঃ লীগ)	৩৯৪৮৮
শচিং ক্রু (বিএনপি)	২৮৪৮২
বদরুল হক চৌঃ (জাপা)	১৫৯৯

www.pathagar.com

নির্বাচন ১২ জুন '৯৬
ভোট কারচুপির দলিল

গ্রন্থনা- তাহ্‌মীদ আল ফারুক

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬। ১২ জুন অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে জাতীয় আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে এটাই ছিল জনগণের প্রত্যাশা। জনগণ চেয়েছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে তারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। তাদের আশার একটি অংশ হয়ত পূরণ হয়েছে- নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে- তবে তারা তাদের ভোটের অধিকার পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। নিরব সন্ত্রাসী তৎপরতা, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বতা ও ভোট কিনার প্রতিযোগিতা, অবাধে সিল মারার দস্যুতা এবং কতিপয় এনজিওর অপতৎপরতা জনগণকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধাগ্রস্ত করেছে। ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। আমরা বিভিন্নপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য এবং পত্রিকার খবরাখবর নিম্নে তুলে ধরলাম।

আওয়ামী লীগের অভিযোগ
বিএনপি বিভিন্ন স্থানে কারচুপি ও জালভোটের আশ্রয় নিয়েছে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বলেছে, নির্বাচনে বিএনপি দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও জাল ভোটের আশ্রয় নিয়েছে। জামালপুর-৪ আসনে ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার আওয়ামী লীগের এজেন্টদের বের করে দিযে ব্যালটে সিল মেরেছে। মির্জা আব্বাস ঢাকা- ৬ আসনের সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ কেন্দ্রটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পরিবর্তন করে ব্যাপক ভোট কারচুপি করেছে। মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে মির্জা আব্বাস সন্ত্রাস করে অসংখ্য জালভোট দিয়েছে। নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার উপদেষ্টা শাহ এ এমএস কিবরিয়া একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, চন্দানাইশ সাতকানিযা, সিলেট-৬ হবিগঞ্জ-১ ঢাকা-৯'র কয়েকটি কেন্দ্রে এবং ঢাকা- ৭ এর ৫৪ নং ওয়ার্ডে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও জালভোটের আশ্রয় নিয়েছে বিএনপি। কিবরিয়া বলেন নির্বাচনের ওপর সামগ্রিক মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি [১৩/৬/৯৬ আজকের কাগজ]

www.pathagar.com

জোহরা তাজউদ্দিনের বিবৃতি ।। মেহেরপুর-১ আসনে প্রশাসনের সহযোগিতায় বিএনপি কারচুপি করেছে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্যা এবং মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য আপামর জনসাধারণ ও শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ একদিকে যেমন নির্বাচনকে অর্থবহ করে তুলেছে, অন্যদিকে শক্তিশালী হয়েছে এ দেশের গণতন্ত্রের ভিত।

এক বিবৃতিতে তিনি নির্বাচনে এই আসনে জালিয়াতি, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে অভিযোগ করেন পতিত বিএনপি সরকারে লালিত সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব লীলা এবং প্রশাসন দলীয়করণের ফলে মেহেরপুর-১ আসনের জনগণ তাদের কাংক্ষিত ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। ভোট জালিয়াতি, সন্ত্রাস, নগ্ন হস্তক্ষেপ, ব্যাপক অনিয়মের প্রেক্ষিতে বেলা ১১ টায় ভোট গ্রহণ বন্ধ করার জন্য লিখিতভাবে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে জেলা প্রশাসক মেহেরপুর সদরের তিনটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করেননি। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার তার অধীনস্থ পুলিশ সার্জেন্ট, দারোগা ও কনস্টেবলকে দিয়ে মেহেরপুর সদরের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিএনপির অস্ত্রধারীদেরকে ভোট জালিয়াতিতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিবৃতিতে জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, অনেক কেন্দ্রে মহিলাদেরকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির ফলে তারা ভোট দিতে না পেরে ফিরে যান বিবৃতিতে তিনি জানান যে, ডিসি কুতুবপুর ইউনিয়নে শোলমারী কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় প্রিজাইডিং অফিসারগণ বিএনপির অস্ত্রধারীদের দ্বারা অনিয়ম ও ভোটারদের ভোটদানে বাধা প্রদানের কথা সরাসরি জানালেও ডিসি তা সুকৌশলে এড়িয়ে যান। পিরোজপুর, আমদহ, দারিয়াপুর, বড়িপুতা ও মহাজনপুরের প্রায় ১৮টি ভোট কেন্দ্রে সাধারণ নিরীহ মানুষকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি।

বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জাল ভোট দিয়ে বাক্স ভর্তি করে নেয়। অস্ত্রধারীদের প্রকাশ্য চলাফেরা ও বিভিন্ন ধরণের হুমকির মুখে আমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ চেয়ে পঠালেও ডিসি সাহেব বিভিন্ন টালবাহানা করে কোন রকম সহযোগিতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেননি। নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই মেহেরপুর সদরে মাইক্রোবাসে করে প্রকাশ্যে বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসহ ঘোরাফেরা করে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আতংকের সৃষ্টি করে। প্রশাসনকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির নম্বরসহ লিখিতভাবে জানালেও রহস্যজনভাবে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, মেহেরপুর আসনের ৪০টি কেন্দ্রই ছিল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত অত্যন্ত স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোর অন্যতম। নির্বাচনের

www.pathagar.com

বহু আগে থেকেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে মেহেরপুরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি বিশেষ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে ও স্বার্থে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কথা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারদের কাছে লিখিতভাবে নির্বাচনের বহুপূর্বেই আমি জানিয়েছি। এত কিছুর পরেও স্থানীয় প্রশাসন কোন রকম কার্যকরী পদক্ষেপ কেন নেয়নি তা আজ মেহেরপুর- ১ আসনের জনমনের জিজ্ঞাসা। [১৮/৬/৯৬ বাংলার বাণী।]

জামায়াতকে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নির্বাচনে হারানো হয়েছে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ১২ই জুনের নির্বাচনে জামায়াতকে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হারানো হয়েছে। জনগণের ভোটে নয় বরং জামায়াত কালো টাকা, এনজিও'র তৎপরতা, ব্যাপক জাল ভোট, ভোট কেন্দ্র দখল, প্রশাসনের পক্ষপাত দুষ্টতা ও পেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। দলের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মকবুল আহমদ, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, কর্মপরিষদ সদস্য ও শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুস এবং মহানগরী জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত ছিলেন এবং মওলানা নিজামীকে সহায়তা করেন।

মওলানা নিজামী বলেন, ১২ ই জুন '৯৬ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদশে-এর আসন সংখ্যা কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে আসন সংখ্যা ও ভোট কম বেশী হতেই পারে। রাজনীতিতে উঠানামা একটি দলের জন্য বিশেষ করে আদর্শিক দলের জন্য অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। তুরস্কের ইসলামী দল প্রথমে ৪৮ আসন পায় পরবর্তী নির্বাচনে ২৪টি আসনে নেমে আসে।তার পরের নির্বাচনে আবার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬২টি এবং সর্বশেষ নির্বাচনে তারা ১৫৮টি আসন পেয়েছে। এবং তারা সরকার গঠন করেছে।

তিনি বলেন জামায়াতের জনসমর্থন কমেছে বা বিপর্যয় হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। জামায়াতকে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হারানো হয়েছে। জনগণের ভোটে নয় বরং জামায়াত কালো টাকা, এনজিও'র তৎপরতা, ব্যাপক জাল ভোট, ভোট কেন্দ্র দখল, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা ও পেশীশক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক এটা যে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কমপক্ষে '৯১ এর মত একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র যে কতটা মারাত্মক ও নগ্ন হতে পারে আমরা তা বুঝে উঠতে পারিনি।

www.pathagar.com

বহুমুখী চক্রান্ত

তিনি বলেন, আমাদের পরাস্ত করার জন্য জামায়াতের সম্ভাবনাময় আসনগুলোকে টার্গেট বানানো হয়েছিল এবং সেখানে কালো টাকার বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছিল। জামায়াত বহুমুখী চক্রান্তের শিকার হয়েছে। তাছাড়াও বিশেষভাবে আমাদের প্রার্থীদের অর্থের কোন যোগান দিতে না পারাটাও ছিল জামায়াতের একটি বড় দুর্বলতা। অর্থের অভাবে আমাদের কর্মীদের আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। ব্যাপকভিত্তিক নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও আমাদের এই প্রথম।

জামায়াতকে নানাভাবে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমীরে জামায়াত যাতে সবিনয় জানতে চাই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পারেন এমনকি জাতির উদ্দেশ্য ভাষণও দিতে না পারেন তার জন্য অযৌক্তিক শর্তারোপ করা হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের নিকট উপর্যুপরি আবেদন জানানোর পরও কোন প্রতিকার করা হয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর পত্রিকা আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের সহায়তায় অব্যাহতভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে এবং সংবাদপত্রের সহযোগিতা আমরা পাইনি। প্রকাশ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লংঘন করে টাকা, শাড়ী,লুঙ্গি বিতরণ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ক্লাবে অনুদান টিভি সেট বিতরণ, একই সাথে ডজন ডজন মাইক ব্যবহার, হুমকি প্রদর্শন করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হয়েছে।

সেনা মোতায়েনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ

মওলানা নিজামী বলেন, যে উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সিভিল প্রশাসনের অনুরোধ ছাড়া সেনাবাহিনী কোন ভূমিকা পালন করেনি। সিভিল প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণ নীরব ও নির্বিকার। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এমন ছিল যার যেখানে শক্তি আছে তারা সেখানকার কেন্দ্র দখল করে নিক এবং হয়েছেও তাই। ফলে ভোট প্রদনের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে যা সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই ঘটে না। অনেক কেন্দ্রে ৯০% ভাগের বেশী ভোট পড়েছে যা অবাস্তব। গত নির্বাচনের চাইতে ভোটার উপস্থিতির হার বেশী ছিল। অবশ্য তার মানে এই নয় যে যত ভোট বেশী পড়েছে তার সবই কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন। খুব কম সংখ্যক কেন্দ্রেই স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে মাত্র একজন পুলিশ ও কয়েকজন লাঠিধারী আনসার বড় অসহায় ছিল পেশীশক্তির মোকাবিলায়। অন্যান্য বার নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক দলসমূহ। আর এবার ভোট গ্রহণে নিয়োজিত পুরো মেশিনারীটাই রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যা নির্বাচনের নিরপেক্ষতাকে দারুণভাবে ক্ষুন্ন করেছে। জামায়াতের আসন

www.pathagar.com

সংখ্যা কমায় জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যে জামায়াতের প্রতি সমবেদনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় জনগণের এক বিপুল অংশের জামায়াতের প্রতি দরদ রয়েছে। নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি, ভোট ডাকাতি, কালো টাকা, সন্ত্রাস, জাল ভোট, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন আচরণবিধি লংঘন ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি ছাড়াও আমাদের নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হওয়ার আরও কোন কারণ আছে কিনা আমরা তা অনুসন্ধান করছি।

অনিয়ম ও কারচুপির কিছু চিত্র

প্রেস ব্রিফিংকালে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ভোট কেন্দ্র দখল ও নির্বাচনে অনিয়মের যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তার কিছু চিত্রে তুলে ধরা হয়।

১২ই জুন সকাল সাড়ে ১১ টায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা কুমিল্লা- ১২ নির্বাচনী এলাকার চৌদ্দগ্রাম থানার শুভপুর ইউনিয়নের উনকুর ও গাছবাড়িয়া ভোট কেন্দ্র চিওড়া ইউনিয়নের লোয়াপুর কেন্দ্র, কানকাপৈতা ইউনিয়নের হিংসুল কেন্দ্র, শ্রীপুর ইউনিয়নের পাদুয়া ও লালঘরভোট কেন্দ্র, গুণবতী ইউনিয়নের ছুরিকরা কেন্দ্র, চৌদ্দগ্রাম ইউনিয়নের পেরিয়া কেন্দ্র, আনকরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র, উজিরপুর ইউনিয়নের নয়াগ্রাম ভোট কেন্দ্র দখল করেছে। জাতীয় পার্টিও ২টি কেন্দ্র দখল করেছে। এলাকার ৯টি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ফেনী-২ (সদর আংশিক- দাগণভূইয়া) আসনের পর্যায়ক্রমে ১০/১৫টি ভোট কেন্দ্র আওয়ামী লীগ দখল করে ব্যালটে সিল মেরেছ। এ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার খোলাখুলিভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে।

শেরপুর- (সদর) আসনের কামরিয়া ধলা, রৌহা-বেতামারী ও ভাতশালার ২২টি কেন্দ্র আঃ লীগ দখল করেছে এবং ভোট কেন্দ্র থেকে জামায়াতের পোলিং এজেন্টদের মেরে বের করে দেয়া হয়েছে। প্রশাসন রহস্যজনক নীরবতা পালন করেছে।

নারায়ণগঞ্জ- সদর আসনের তুলারাম কলেজে, মিজমিজি পশ্চিমপাড়া, মিজমিজি বাতেল পাড়া মাদ্রাসা, আদর্শ স্কুল চাষাড়া, মাদ্রাসা ভোট কেন্দ্রগুলো আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয় এবং অন্য দলের পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। প্রশাসন রহস্যজনক নীরবতা পালন করেছে।

চট্টগ্রাম-১৪ (সাতকানিয়া- লোহাগড়া) আসনের দরবেশ হাই প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে জামায়াতে ইসলামীর পোলিং এজেন্টদের বিএনপির সন্ত্রাসীরা বের করে দিয়েছে। কিন্তু প্রশাসন তার কোন প্রতিকার করেনি।

কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনের টেকনাফ হাইস্কুল ভোট কেন্দ্র থেকে জামায়াতে ইসলামীর পোলিং এজেন্টগণকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বের করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রশাসন রহস্যজনক নীরবতা পালন করেছে।

জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনের কান্দিরচর, নাপিতের চর , কোয়ারচর, মহলদীঘি, বাহাদুরপুর, সিরাজাবাদ, ও বামনা ভোট কেন্দ্রগুলো আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়ে নৌকায় সিল মেরেছে। এ ব্যাপারে জামালপুরের ডিসি ও এসপির নিকট অভিযোগ পেশ করা হলে তারা কোন কিছু করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

নোয়াখালী-৩ (চাটখিল) আসনের সাধুরখিল ভোট কেন্দ্রটি আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দখল করে নিয়ে জামায়াতসহ অন্য দলের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়েছে। প্রশাসন রহস্যজনক নীরবতা পালন করেছে।

লক্ষ্মীপুর-২ (সদর-রায়পুর) আসনের সমিতির হাট কেন্দ্র, ও বিজয়নগর কেন্দ্রে বিএনপির সন্ত্রাসীরা জামায়াতের এজেন্টদের জোরপূর্বক বের করে দিয়েছে। প্রশাসনের নিকট অভিযোগ করা সত্ত্বেও তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

যশোর-৩ (সদর) আসনের চুরামনকাঠি ইউনিয়নের দোগাছিয়া ভোট কেন্দ্রে বিএনপির সন্ত্রাসীরা বোমা ফাটিয়ে মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে আসতে বাধা দিয়েছে। পাবনা -১ আসনের বহু কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার প্রকাশ্যে নগ্নভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছে। পোলিং অফিসারদের অনেকেই ভোটারগণের হাত থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে নিজেরা সিল মেরেছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রতীকে ভোট দানকারীদের ব্যালট পেপার নিয়ে তারা ছিঁড়ে ফেলেছে। আবার একজনকে একাধিক বার ভোটদানের সুযোগও তারা দিয়েছে। এসব ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে যাওয়া হলে তাকে তার দফতরে পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া কোন ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মওলানা নিজামী তার নিজ আসনে ভোট কারচুপির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন রাজশাহী বিভাগে যেখানে গড় ভোট পড়েছে ৭০/ ৭৫ শতাংশ সেখানে বেড়া-সাথিয়া আসনে ভোট পড়েছে ৯০ শতাংশ। তাও আবার বেলা ১২টা-১টার মধ্যেই অধিকাংশ আসনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। অনিয়ম ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করে কোন ফল পাওয়া যায়নি। যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করায় প্রত্যন্ত দূরবর্তী কেন্দ্রগুলো থেকে থানা কেন্দ্রে অভিযোগ পর্যন্ত পৌছানো যায়নি। গোড়াতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণকে সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হলেও বাস্তবে এর উদ্দেশ্য ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে ভোট কারচুপির সহায়তা করা। প্রার্থী ও তার সমর্থকদের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অথচ এনজিওদের যানবাহন চলতে দেয়া হয়েছে কি উদ্দেশ্যে?

www.pathagar.com

শেরপুর-১ আসনের প্রার্থী জনাব কামারুজ্জামান জানান, শেরপুরে জামায়াত ও জাপা প্রার্থীর মধ্যেই ছিল মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা। অথচ আওয়ামী লীগ প্রার্থী অবিশ্বাস্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। দুপুরের মধ্যেই ভোট কেন্দ্র দখল করে নিয়ে বাক্স ভরা হয়েছে। তিনি জানান, ২ জন সাংবাদিক জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র দখল করে ভোট কারচুপির কথা জানালে জেলা প্রশাসক আবদুল মোবারক তাদের থানায় নিয়ে আটকে রাখার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল তার কার্যকরী পদক্ষেপ।

ফেনী-১ আসনের প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ জানান, গত নির্বাচনে এই আসনে ভোটার ছিল সোয়া ২ লাখ। এবার ভোটার ছিল ১ লাখ ৫৭ হাজার। অথচ গতবার বিজয়ী প্রার্থী ৩৬ হাজার ভোট পেলেও এবার পেয়েছে ৬৪ হাজার। তিনি জানান, কয়েকজন পোলিং এজেন্টকে ভোট কারচুপি করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলার পরও কোন এ্যাকশন নেয়া হয়নি।

জনাব মকবুল আহমদ জানান, পাল্লায় ভোট দেয়া ব্যালট ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়া যায়নি। ডাঃ তাহের বলেন, চৌদ্দগ্রামের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আওয়ামী লীগের পছন্দসই লোকদের প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করেন। ৪টি ইউনিয়নে ভোট কেন্দ্রগুলো একচেটিয়া দখলে নিয়ে আওয়ামী লীগ কারচুপি করেছে। টিএনও ও ডিসিকে জানানোর পরও কোন প্রতিকার হয়নি। তিনি জানান, জুগিরকান্দি কেন্দ্রে মোট ভোট ১৫২৮টি। অথচ ভোট পড়েছে ১৮২৩টি। এতেই প্রমাণিত হয়, কারচুপির মাত্রা ছিল কতটা ভয়াবহ। চৌদ্দগ্রামে ৮৬'র চেয়েও খারাপ নির্বাচন হয়েছে। [১৬/৬/৯৬, দৈনিক সংগ্রাম]

নির্বাচনে পুকুর চুরি হয়েছে॥ সাংবাদিক সম্মেলনে খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুধবার অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১১টি আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহে বিলম্ব ও ভোট গ্রহণে অহেতুক সময় ক্ষেপন করা হয়েছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের অবাধে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ ও বুথ দখল করা হয়েছে। বিএনপি'র এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে একটি দলের পক্ষে জাল ভোট দেয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে দায়ের করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অভিযোগ দায়ের করা কেন্দ্র ও আসনে তিনি অবিলম্বে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানান।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ঢাকা শেরাটন হোটেলে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বেগম জিয়া বলেনঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। জনগণের রায় মানতে আমরা সব সময়ই প্রস্তুত। জনগণ চাইলে আমরা ক্ষমতায় থেকে তাদের সেবা করতে চাই, তারা চাইলে বিরোধী দলে থেকেও আমরা তাদের সেবা করবো। এ ব্যাপারে আমাদের

www.pathagar.com

কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু বেশকিছু নির্বাচনী এলাকায় নানান কারচুপির মাধ্যমে জনগণের রায় পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশবাসীর আকাঙ্খা পূরণে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ঘটনাকে দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে আখ্যায়িত করে বিএনপি চেয়ারপার্সন বলেনঃ আমরা চাই জনগণকে স্বাধীনভাবে তাদের রায় প্রদানের সুযোগ দেয়া হোক। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক সংসদ উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে দলের চেয়ারপার্সনকে সহযোগিতা করেন। দলেনর মহাসচিব ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মতিন চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়, নির্বাচন পরিচালনা সমন্বয় কমিটির আহবায়ক এএম জহির উদ্দিন খান, সাবেক মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, আনোয়ার জাহিদ, ডঃ এ মঈন খান, দলের দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান, এম মোর্শেদ খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়,আমান উল্লাহ আমান, হারিস চৌধুরী প্রমূখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা-৯ আসনের বিএনপি প্রার্থী দলের মহানগর সভাপতি মীর শওকত আলী বীর উত্তম, ফেনী-২ আসনের প্রার্থী ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং লক্ষীপুর -৪ আসনের প্রার্থী আবদুর রব চৌধুরী, চাঁদপুর -১ আসনের প্রার্থী এহসানুল হক মিলন এবং বিশিষ্ট আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন।

শত প্রতিবন্ধকতা, ভয়ভীতি, সন্ত্রাস ও অনিয়ম সত্ত্বেও জনগণ বিশেষ করে মহিলারা বিপুল সংখ্যায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপি'র প্রতি বিপুল আস্থা ও সমর্থন ব্যক্ত করেছে উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া দলের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জনগণ বিএনপি'র প্রতি রায় দিয়েছে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপি প্রার্থীদের হারিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজধানীর মিরপুর এলাকায় একটি ভোট কেন্দ্রে এমন ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হয়েছে যাতে ধানের শীষ প্রতীক মুদ্রিত ছিল না। রাজধানীর অনেক কেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের হাতে আঙ্গুলে কালি লাগিয়ে ভোট গ্রহণ না করেই ফেরত দেয়া হয়েছে। শাহীন স্কুল সংলগ্ন স্টাফ ওয়েলফেয়ার স্কুল ভোট কেন্দ্রের মহিলা প্রিজাইডিং অফিসারকে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে ভোট কেটে দেয়া হয়েছে। ভোট গ্রহণের দিন সকালে বনানীর একটি কেন্দ্র পরিবর্তন করে বনানী বিদ্যা নিকেতনে নতুন ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের ১ হাজার ৯শ' ৫০ জন ভোটার এবং প্রার্থীরা কেন্দ্র পরিবর্তনের খবর জানেন না।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেনঃ কেউ কেউ ইতিমধ্যে বলে ফেলেছেন এবারের নির্বাচন নাকি '৯১ সালের নির্বাচনের চেয়ে সুষ্ঠু হয়েছে। তিনি বলেন, এ বক্তব্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। '৯১ সালে ১টি কেন্দ্রেও পুনঃ নির্বাচন করতে হয়নি। একজন লোকও মারা যায়নি। এ নির্বাচনে ইতিমধ্যে ১২ জন নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

বেগম জিয়া বলেন, বাইরে থেকে ভোটারদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেলেও অনেক কেন্দ্রেই সীমাহীন অনিয়ম এবং কারচুপির আশ্রয় নিয়ে একটি দলের পক্ষে ব্যাপক হারে জাল ভোট দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চাঁদপুরের মতলব থেকে বিএনপি প্রার্থী প্রাণের ভয়ে সপরিবারে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছেল, এম কে আনোয়ারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, রেড ক্রিসেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান শহীদুল হক জামাল সন্ত্রাসের মুখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমদ ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারেননি। দলের মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদারের আসনে ৯টি কেন্দ্র দখল করে ৩০ হাজার ভোটের মধ্যে ২৭ হাজার ভোট কেটে নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেনঃ লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে ৮টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দখল করে ভোট কেটে নিয়েছে। তিনি বলেন বাইরে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুমিত হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি দল কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পরিকল্পিতভাবে কারচুপি করেছে। তিনি বলেন ২৭ টি আসনের ১শ' ২৩ টি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত থাকার মধ্যদিয়ে প্রমাণিত হয় এ নির্বাচন সুষ্ঠু ছিল না। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আসলে পরিকল্পনা করে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত্রের মাধ্যমে হারিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, রেডিও-টেলিভিশনে ফলাফল ঘোষণার ধরন দেখে দেশের জনগণ হতবাক হয়েছে। টেলিভিশনের এক ঘোষণায় বলা হলো বিএনপি প্রার্থীরা ১০৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। একই সময় রেডিওতে ঘোষণা হলো বিএনপি প্রার্থীরা ১১২ টি আসন পেয়েছে। কিন্তু পরে আকস্মিকভাবে বিএনপি'র আসন সংখ্যা ১০৪-এ নামিয়ে দেয়া হলো। বিএনপি প্রার্থীদের একবার বিজয়ী ঘোষণা করে আবার পরাজয়ের খবর দেয়া হলো। তিনি বলেন, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা, পঞ্চগড় আসনের ফলাফল রাত ১২ টার মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। অথচ রাজধানীর ৮টি আসনের ফলাফল প্রচার করা হলো পরের দিন সকালে। এভাবে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বগুড়া আসন এবং সাবেক সংসদ উপনেতার ঢাকার পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ আসনের ফলাফল প্রকাশ বিলম্বিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এসব অনিয়ম করা হয়েছে। সুপরিকল্পিতভাবে ফলাফল পাল্টে দেয়ার হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচনের অনেক আগেই ৮জন রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে একটি দলের রাজনৈতিক মঞ্চে একাত্মতা প্রকাশের অভিযোগ এনে তাদেরকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেননি। ভোলার জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ সুপারকে নিজ নিজ পদে বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে

www.pathagar.com

তাদের সরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা দাবি করেছি। কিন্তু খুন এবং সন্ত্রাসের পরেও নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেয়নি।

বেগম খালেদা জিয় বলেন, ভোট গ্রহণের দিন অনেক অনিয়মের সুনির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন কমিশন, রিটানির্ং অফিসারদের জানানো হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে এসব বন্ধ করা হয়নি। তিনি জানান, তিনি নিজে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন, পরে খবর নিয়ে জেনেছেন কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। দলের পক্ষ থেকে যারা কারচুপির অভিযোগ করেছেন তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। বেগম জিয়া বলেন, রেডিও-টিভি'র প্রচারণায় দেখা গেছে, যেখানে বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী হচ্ছিলেন সেখানে নির্বাচনী ঘোষণা বন্ধ রেখে অনেক পরে অন্য দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জানান, সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ সকল নির্বাচনী ত্রুটি, অনিয়ম ও অপরাধের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দলের সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরাও অভিযোগ দায়ের করেছেন। যে সব কেন্দ্রে জোর করে কেন্দ্র দখল করা হয়েছে সেসব কেন্দ্রে তিনি অবিলম্বে পুনঃ নির্বাচন দাবি করেন। তিনি বলেন, আমরা ইতিবাচক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা জনেগণের সাথে ছিলাম এবং ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবো।

প্রশ্নের জবাবে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচনের দিন সেনাবাহিনী সদস্যরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনী সম্পর্কে নানা রকম অভিযোগ করেছে। কিন্তু নির্বাচনের পর তাঁরাও সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী সদস্যরা নিজের জায়গায় থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বেগম জিয়া বলেন, আমরা গণতন্ত্র এনেছি, গণতন্ত্রকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়েছি, গণতন্ত্র রক্ষা করেছি এবং ভবিষ্যতেও রক্ষা করবো। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সন্ত্রাস ॥ ভোট কেন্দ্র দখল

ভোট কেন্দ্রগুলোতে সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতি এবং স্বল্প সংখ্যক পুলিশ ও আনসার নিয়োগের সুযোগে আ'লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের জাল ভোট প্রদান কেন্দ্র দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণের মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার ৫টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘর্ষের কারণে নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াই হাজার) আসনের ৪টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। সংঘর্ষে প্রায় ২০ জন গুলীবিদ্ধসহ প্রায় শতাধিক লোক আহত হয়। নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের আদর্শ স্কুল নারায়গঞ্জ, সরকারী গালর্স স্কুল, তোলারাম কলেজ, চাষাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কাশিপুর মাদ্রাসা, ইসমাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিজমিজি পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা, ভাতেমরা মাদ্রাসা, হাজীগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শানারপাড়া কেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা জাল ভোট প্রদান ও পুলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে ব্যাপকভাবে সীল মারে। নারায়ণগঞ্জ- ৫ আসনে সরকারী মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

www.pathagar.com

ক্লাব কেন্দ্র, বন্দরের বিএম হাইস্কুল ও কলাগাছিয়া ইউনিয়নের ছয়টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগারদের একই কায়দায় কেন্দ্র দখল করে সীল মারতে দেখা যায়। নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের রূপগঞ্জে বিএনপি প্রার্থী আবদুলমতিন চৌধুরীর সাথে সাংবাদিকদের আলাপকালে তিনি জানান, গত মঙ্গলবার রাতে তার নিজ বাড়ী ও তার আশে পাশের ২৪টি বাড়ীর টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়। এছাড়া কাজী আঃ হামিদ ও জাহাঙ্গীর বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা কেন্দ্র দখল করে দু'জন পুলিং এজেন্টকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বেলা তিনটা পর্যন্তও তাদেরকোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এছাড়া সন্ত্রাসীরা তাকে ইউসুফগঞ্জ উপশহরে যেতে দেয়নি। তিনি অভিযোগ করেন সেখানে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে (আড়াই হাজার) সন্ত্রাসের কারণে ঝালকান্দি মরিয়ারদী, গাজীপুরা ও বিষ নন্দী কেন্দ্রগুলোতে আ' লীগের ও বিএনপির মধ্যকার সংঘর্ষের কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। এব্যাপারে বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান জানান, তাদের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর সমগ্র এলাকায় হামলা চালিয়ে আ' লীগের সন্ত্রাসীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এবং ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে অবাধে সীল মারে।

নারায়ণগঞ্জ -৩ (সোনারগাঁও) আসনে একই কায়দায় আ' লীগ সশস্ত্র ক্যাডাররা কেন্দ্রগুলো দখলে নিয়ে অবাধে সীল মারে।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও প্রধান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।(১৩/৬/৯৬ সংগ্রাম)

অধ্যাপক গোলাম আযমের অভিযোগ
আওয়ামী লীগ চৌদ্দগ্রাম, ফেনী, ও শেরপুরে ভোট কেন্দ্র দখল করেছে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল বুধবার অভিযোগ করেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মীরা কুমিল্লা, জেলার চৌদ্দগ্রাম থানা, ফেনী ও শেরপুর শহরে বলপূর্বক ভোট কেন্দ্র দখল করেছে। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম টেলিফোনে বাসসকে জানান, আওয়ামী লীগ, ও জাতীয়পার্টির কর্মীরা চৌদ্দগ্রামের ২৭টি নির্বাচন কেন্দ্র দখল করে। এগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগই অধিকাংশ দখল করে।

তিনি বলেন, জামায়াত প্রতিবাদ জানালে ১৫টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ভোট কেন্দ্রগুলোতে আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে প্রশাসন নিরপেক্ষ ছিল না।

তিনি বলেন, ডেপুটি কমিশনারগণ সঠিক সময়ে সেনাবাহিনী তলব করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের মোতায়েনের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

www.pathagar.com

তিনি উল্লেখ করেন, বেসামরিক প্রশাসন ভোট কেন্দ্রগুলো দখল প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ায় প্রয়োজন ছিল সেনাবাহিনী তলব করা। তিনি জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও সিরাজগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্র দখলেরও অভিযোগ করেন।

অধ্যাপক আযম বলেন, অনিয়মের আরো তথ্য আসছে এবং সেগুলো নির্বাচন কমিশনকে জানানো হচ্ছে. (১৩/৬/৯৬ সংগ্রাম)

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মসলিসে শূরার অভিমত
নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক গত ১৯ জুন সকাল ৯টায় জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে শুরু হয়। মজলিসে শূরার ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৭০ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মজলিসে শূরা বিগত ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেঃ

কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতিগত ও বিধি-বিধানগতভাবে যত ঘোষণাই দিয়ে থাকুক বাস্তবে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি।

জামায়াতে ইসলামী মৌলবাদের নামে আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং জামায়াতকে নির্বাচনে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হারানো হয়েছে। উপরন্তু জালভোট, কারচুপি, পরিকল্পিত সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন, দেশের প্রচলিত আইন লংঘন করে নির্বাচনের ব্যাপারে কতিপয় এনজিও'র রাজনৈতিক ভূমিকা, কালো টাকার ছড়াছড়ি ও প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং কেয়ারটেকার সরকারের অনাকাংখিত দুর্বলতা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা দারুনভাবে ব্যাহত করেছে। জামায়াতের মজলিসে শূরা গভীর বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছে যে, কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ '৯১ -এর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সরকারে মত নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিভিন্ন ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শর্তারোপ করে বিটিভির 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বিষয়টি অবহিত করার পর তারা জানিয়েছিলেন যে দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি রেডিও টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন। অথচ দলীয় প্রধান সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী না হলে ভাষণ দিতে পারবেন না এ অযৌক্তিক অযুহাতে আমীরে জামায়াতকে রেডিও টেলিভিশনে

www.pathagar.com

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়া থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হলেও এ ঘটনা ঘটতে পারতো না।

ভোট কেন্দ্রের সন্ত্রাসের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হবে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। অথচ নির্বাচনের দিনে যেসব ভোট কেন্দ্র দখল করা হয়েছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও ঐসব ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়নি। এমনকি নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করেও অভিযোগ করার লোক পাওয়া যায়নি। অথবা অভিযোগ করেও কোন কাজ হয়নি।

ভোটকেন্দ্র দখল করে ভোটার সংখ্যার চাইতে বেশী ব্যালটে সীল মারা হয়েছে এমন কেন্দ্রের ভোট গ্রহণও স্থগিত করা হয়নি। পুলিশ ও বিডিআর যা দেয়া হয়েছিল তা ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু '৯১ -এর মত নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সেনাবাহিনী কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি বা ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়নি। ফলে সেনাবাহিনী মোতায়েনের মুল উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে কালো টাকার খেলা এতটা প্রকাশ্যে চলেছে যে নির্বাচন কমিশন তা রোধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করলে সহজেই তা ঠেকাতে পারতেন। নির্বাচন আচরণবিধি অবাধে লংঘিত হয়েছে। প্রকাশ্যেই শাড়ী, লুঙ্গি, টিভি সেট, নগদ টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়া হয়েছে। অথচ নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন এসব ব্যাপারে ছিল নির্লিপ্ত ও নির্বিকার। যেসব জায়গায় প্রশাসন সন্ত্রাস ও অনিয়ম হতে দেননি সেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছে। কিন্তু অনেক জায়গায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ রয়েছে এবং বহু জায়গায় সন্ত্রাস ও কারচুপির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা সত্ত্বেও মাত্র ২৭টি আসনের ১২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে নির্বাচন ১৯৯১ সালের মতো অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী মনে করে বিগত ১২ই জুনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে কারচুপি, জালভোট, সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন, কালো টাকার খেলা, আচরণ বিধি লংঘন, ভোট কেন্দ্র দখলসহ যেসব অনিয়ম হয়েছে তার প্রতিকারের উপর বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আচরণবিধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা না করার উপরই নির্বাচন অনুষ্ঠানে একটি ভালো ব্যবস্থাপনার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ কারনেই জামায়াতে ইসলামী জোর দাবী জানাচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে নির্বাচনী সন্ত্রাস, কারচুপি, জালভোট, অনিয়ম, কালোটাকার ব্যবহার, আচরণবিধি লংঘন ইত্যাদি সম্পর্কে আশু তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং সেই সাথে নির্বাচনকে সন্ত্রাসমুক্ত ও কালো টাকার খেলা থেকে রক্ষা করতে হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়েও সুপারিশ পেশ করবেন। গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিশ্চিত করা পরবর্তী নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা এবং নির্বাচনের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন এ তদন্ত কমিটি গঠন করা অপরিহার্য।

মজলিসে শূরা মনে করে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্ভুল ভোটার তালিকা এবং ভোটারদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা জরুরী। মজলিসে শূরা দাবী জানাচ্ছে অবিলম্বে পরবর্তী সকল নির্বাচনের জন্য ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হোক।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশী যারা এসেছিলেন তার নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে জোর সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারা যে অল্পসংখ্যক ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছেন সেসব কেন্দ্রে অল্প সময়েই অবস্থান করেছেন এবং তাদের উপস্থিতিতে কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হয়নি। সন্ত্রাসীরা এমন নিবোর্ধ নয় যে, বিদেশীদেরকে সাক্ষী রেখে এ কাজ করবে। হতে পারে যে, তারা যে কয়টি কেন্দ্রে গিয়েছেন তাদের উপস্থিতিতে সেখানে কোন সন্ত্রাস হয়নি। তাই তাদের সার্টিফিকেট গোটা দেশের নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়।

এতসব করে 'ফেমা' নামক সংস্থাটি পর্যবেক্ষণের নামে সুপরিকল্পিতভাবে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল। কয়েকটি পশ্চিমা দেশের অর্থে পরিচালিত এই সংস্থাটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনে যাতে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হতে না পারে সে ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, ৯৫' সালেই জামায়াতের পক্ষ থেকে বিদেশী অর্থে পরিচালিত এ সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল।

এসব অনিয়ম বা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছে এবং যারা সন্ত্রাস, জাল ভোট ও নানা অনিয়মের কারনে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাচ্ছে।

উপরোল্লেখিত দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র যাবতীয় অনিয়ম, বাধা ও হুমকি উপেক্ষা করে যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মহান উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ভোট প্রদান করেছেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে এবং আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যিনি যে দলই করুন না কেন মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত না হলে সমাজে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই মজলিসে শূরা নির্বাচনে

www.pathagar.com

বিজয়ী সকল দলের সংসদ সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে দলমতের উর্ধে উঠে ন্যায় বিচার, শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের স্বার্থে দেশে কুরআন-সুন্নাহর শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন।

ঢাকাসহ দেশের বহু কেন্দ্রে আ'লীগ ব্যাপক অনিয়ম ও ভোট কারচুপি করেছে

ঢাকাসহ দেশের বহু কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপি হয়েছে। বহু কেন্দ্র থেকে বিএনপির এজেন্টদের জোর পূর্বক বের করে দিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালটে সীল দিয়ে বাক্স ভরেছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে জাল ভোটও দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষে। ঢাকায় ভোট প্রদানের সময় ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে বিএনপি জাতীয় নির্বাচন সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়কারী আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিএনপি এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং বিএনপি এজেন্টদের অনুপস্থিতিতে ব্যাপকভাবে জাল ভোট দিয়েছে। তিনি বলেন, '৭৩ স্টাইলে আওয়ামী লীগ কোনো কোনো কেন্দ্র দখল করে নেয় এবং চাঁদপুর দলীয় প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া নির্বাচনের পূর্ব রাতেই ৫০ ভাগ ভোট নৌকায় কাষ্ট করে রাখে। তিনি বলেন, বিএনপি ইতিমধ্যেই এসব অনিয়ম সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে।

গতকাল বুধবার বিএনপি নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি একথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে কমিটির আহবায়ক জহির উদ্দিন খান, বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মাহবুবুল আলম তারা, রেজাউল করিম, আরশাদুজ্জামান ও খায়রুল কবীর খোনক উপস্থিত ছিলেন।

পরিস্থিতির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ঢাকা- ৮ লালবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামবাগ, গণকটুলী, আজিমপুর ও অগ্রণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপির পোলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক আওয়ামী কর্মীরা বের করে দেয় এবং এক নাগাড় দু ঘন্টাধিক জাল ভোট দিতে থাকে। তিনি বলেন, ঢাকা- ৬ সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার সুবিধার্থে ভোটারদের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি পর্যন্ত লাগানো হয়নি। বাবু গয়েশ্বর বলেন, অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে এ কেন্দ্রে পুলিশ এবং প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে মহিলা ভোটাররা এক দরজা দিয়ে ভোট প্রদান শেষে বেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পুনরায় ভোট প্রদানের দৃশ্য সাধারণ মানুষও প্রত্যক্ষ করেছে। বিএনপি কর্মীরা বারবার প্রিজাইডিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বিএনপি কর্মীদের ধমকাতে থাকেন। জনাব গয়েশ্বর পঞ্চগড়- ১, ঠাকুরগাঁও ২/৩, দিনাজপুর ২/৩/৪/৫; নীলফামারী ১/২/৩/৫ ; লালমনির হাট-১; রংপুর ১/ ৬; কুড়িগ্রাম ১/৪; রাজশাহী-৪,

www.pathagar.com

নাটোর ৩/৪ সিরাজগঞ্জ ১/৪; পাবনা ৫; কুষ্টিয়া ২/৪, নড়াইল-১, বাগেরহাট -৪, খুলনা ১/৫/৬, বরগুনা-৩, পটুয়াখালী-৩, বোলা ১/২, বাকেরগঞ্জ-৬, পিরোজপুর ১/২, টাঙ্গাইল ১/৬/৮, জামালপুর -১/২ শেরপুর-১/২, ময়মনসিংহ ৬/৯, কিশোরগঞ্জ ১/৩/৪/৬, ঢাকা-৯, গাজীপুর -৩, নারায়গঞ্জ-৪/৫, রাজশাহী -১,ফরিদপুর ১/৩/৪/৫, গোপালগঞ্জ- ১/২/৩, মাদারীপুর ১/২/৩, শরীয়তপুর- ১/২/৩ সুনামগঞ্জ-২/৪, সিলেট -৫, মৌলভীবাজার ২/৪, হবিগঞ্জ-৩, কুমিল্লা- ১/৩/৯/১২, চাঁদপুর-২, নোয়াখালী-৫ লক্ষীপুর ১/৩, চট্টগ্রাম -৩/৭/৯/১০, কক্সবাজার-১ ও খাগড়াছড়ি ২৯৮/২৯৯ নির্বাচনী আসনে ব্যাপক অনিয়মের উল্লেখ করে বলেন, এসব কেন্দ্রে কেউ ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পূবেই তার ভোট দেয়া হয়েছে বলে জানিয়ে দেয়া হয়। কোনো কোনো আসনে প্রিজাইডিং অফিসার সরাসরি জাল ভোট প্রদানে সহায়তা করেছেন, মহিলা ভোটারদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন, বুকে ধানের শীষের ব্যাজ দেখামাত্র গ্রামের সাধারণ মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে ভোট কেন্দ্র ত্যাগে বাধ্য করেছেন। এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি কর্মীদের সাথে অভিযোগ করা মাত্র অশোভন আচরণও করেছেন। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, নারায়গঞ্জ মোহাম্মদ আলী বিদ্যালয়, ঢাকার বাদশা ফয়সাল ইন্সস্টিটিউট, কুমিল্লার-২ জেলা স্কুলে ২টি বুথ ঢাকা-৭ গোপীবাগ, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা-৯ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, কাকলি স্কুল ঢাকা-৬ শান্তিবাগ এরশাদ হাইস্কুল, আবদুল্লাহ ফারুক ট্রিনিটি হাইস্কুল, বসুন্ধরা ও কুড়িল কেন্দ্র আওয়ামী কর্মীরা নিজেদের দখলে নিয়ে ইচ্ছে মত সীল মেরেছে। (১৩/৬/৯৬ দিনকাল)

জামালপুর- ৪ এলাকায় ভোট কারচুপি হয়েছে

জামালপুর, ১২ জুন জামালপুর- ৪ সরিষাবাড়ি আসনের প্রার্থী বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার তার নির্বাচনী এলাকায় কেন্দ্র দখল ও ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন। এ আসনের ৫৩ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি কেন্দ্র আওয়ামী লীগের কর্মীরা জোরপূর্বক দখল করে ব্যালট পেপারে সিল-ছাপ্পর মারে। ভোটারদের স্বতঃস্ফুর্ততা সত্বেও তাদেরকে নানা কৌশলে ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখা হয়। তিনি সরিষাবাড়ী ডাক বাংলোয় উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট এই অভিযোগ করেন।

ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার বলেন, নির্বাচন কমিশন জামালপুর-৪ আসনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানেও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন ভোট কেন্দ্র দখল ও কারচুপিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রিজাইডিং অফিসাররা নগ্নভাবে সহযোগিতা করেছে। তাদের নীরব সুযোগ বিএনপি'র এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে ব্যালট পেপারে সীল মারে। কয়েকটি কেন্দ্রে পোলিং অফিসারদেরও ব্যালটে সীল মারতে দেখা যায়। তিনি অভিযুক্ত কেন্দ্রগুলোকে স্পর্শকাতর বলে ভোট কারচুপি রোধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে

www.pathagar.com

লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, তারাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাশিনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোগলদিঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নলসন্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাউথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাজালিয়া সরকারি বিদ্যালয়সহ ১৮টি কেন্দ্রে কারচুপি'র অভিযোগ করা হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। উপশহর বাড়ি আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে সুষ্ঠভাবে ভোট গ্রহণ সত্ত্বেও অহেতুক অভিযোগ এনেও কেন্দ্রটি বাতিল করা হয়। পর্যবেক্ষণকালে সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আওয়ামী লীগ কর্মীরা চর দখলের ন্যায় সংঘবদ্ধ কায়দায় ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সীল মারে। শ' শ' লোক লাঠিসোটা নিয়ে বাটিকামারী কেন্দ্র দখল করে নিলে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য পুলিশ ৪ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েও কেন্দ্র রক্ষা করতে পারেনি। [১৩/৬/৯৬, দিনকাল]

চট্টগ্রাম- ৪ আসনে ব্যাপক অনিয়ম ৪০ মিনিটে ১শ' ভোট গ্রহণ!

১২ জুন চট্টগ্রাম-৪ (ফটিকছড়ি) নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমদ সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন ফটিকছড়িতে আজ নির্বাচনের নামে যা হচ্ছে আমার ৬৪ বছর বয়সে দেশে বিদেশে কোথাও এমন অবস্থা দেখিনি। নির্বাচনের নামে এটা ঘৃণ্য প্রহসন মাত্র। তিনি বলেন, যেহেতু সুষ্ঠ নির্বাচন হয়নি, সেহেতু ফটিকছড়ি আসনে আমি পুনঃ নির্বাচন দাবি করছি।

আজ বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে ফটিকছড়ি থানা পরিষদ এলাকায় জামাল উদ্দিন আহমদ দৈনিক 'দিনকাল' সহ কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মীরা বেশির ভাগ ভোট কেন্দ্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করে প্রিজাইডিং অফিসাররে সামনে নিজের ইচ্ছেমত দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করেছে। এ ধরণের বেশিরভাগ কেন্দ্রের একটি হচ্ছে নানপুর হাই স্কুল কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে ৪০ মিনিটে ১শ' ভোট গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে আনা হয়েছে।

জনাব জামাল উদ্দিন আহমদ অভিযোগ করে বলেন, সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবৈধ তৎপরতা ও নির্বাচনী বিধি বহির্ভূত আচরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্মকর্তাদের মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করেও কোন প্রকার ফল পাওয়া যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসাররা অভিযোগ গ্রহণেও অস্বীকৃত জানিয়েছে।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে জনাব জামাল উদ্দিন চট্টগ্রাম- ৪ (ফটিকছড়ি) আসনে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন. (দিনকাল (১৩/৬/ ৯৬)

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের মাস্তান বাহিনীর কাছে হেরে গেছি
২০ কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন চাই ঃ

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষমদদে প্রাইভেট মাস্তান বাহিনী দ্বারা কিশোরগঞ্জ- ৭ (ভৈরব -কুলিয়াচর) আসনের প্রায় ২০টি ভোট কেন্দ্রে ভোট জালিয়াতি করেছে। একই আসনে অপর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ গিয়াসউদ্দিন গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করে উক্ত আসনের পুনঃ নির্বাচন দাবী করেছেন।

তিনি পূর্ব ভেরব থানার নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার বাবু এস আর দেবের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন উক্ত অফিসার আওয়ামী লীগের সরাসরি সমর্থক ও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অফিসার, কলেজ অধ্যাপক , প্রাইমারী শিক্ষকদের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে নিয়োগ করেন। এ বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারসহ অন্যান্য নিয়োগকৃত চিহ্নিত ব্যক্তিদের পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক এবং থানা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত আবেদন জানানো সত্ত্বেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। বলা হয়, প্রিজাইডিং এবং পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে। তাই পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।

জনাব গিয়াস উদ্দিন বলেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কালো টাকা, সীমাহীন প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং নজিরবিহীন পেশী শক্তির মাধ্যমে আমার আকাঙ্খিত বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়। তারা আমার নিয়োজিত পোলিং এজেন্টদের ২০টি কেন্দ্র থেকে মারধর করে বের করে দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দেয়া সত্ত্বেও উল্টো প্রতিপক্ষের উচ্ছৃংখল, কর্মীদের অনিয়মকে বৈধ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু বিএনপি সমর্থক স্থানীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আটাকাদেশসহ হয়রানিমূলক মামলা রুজু করা হয়। তিনি আওয়ামী সন্ত্রাসের বিবরণ তুলে ধরে বলেন, এখনও আমার কর্মী ও সমর্থকদের তারা অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আমি সেখান থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এ ব্যাপারে তিনি নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন বলে জানান। [১৭/৬/৯৬, দিনকাল]

কুমিল্লা- ১২ আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি একটি কেন্দ্রে
ভোটার সংখ্যা ১৫৪৩॥ ভোট কাস্ট হয়েছে ১৮৩২

গতকাল ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহম্মদ তাহের এর পক্ষে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশন- এর বরাবরে কুমিল্লা-১২ চৌদ্দগ্রাম

www.pathagar.com

নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক ভোট কেন্দ্র দখল, ভোট ডাকাতি ও চরম কারচুপির এই নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এর উপস্থিতিতে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা ও নির্বাচন কমিশনার আবিদুর রহমানের নিকট নির্বাচন বাতিল-এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে যুক্তিতর্ক পেশ করেন।

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমার মোয়াক্কেল ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ১০ তারিখেই ৩০টি কেন্দ্রে গোলযোগের আশংকা প্রকাশ করে রিটার্নিং অফিসারের নিকট সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন পেশ করেন। কিন্তু রিটার্নিং অফিসার এ ব্যাপারে কোনো সুব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

নির্বাচনের দিন সকাল ১০ টায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা একযোগে বিভিন্ন মারনাস্ত্র সহকারে সকল ভোট কেন্দ্রে হামলা চালায় এবং ৬৬টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি ভোট কেন্দ্র চর দখলের মত জবর দখল করে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এর মধ্যে ১৭টি ভোট কেন্দ্রে তারা ৯০% থেকে ৯৫% ভাগ ভোট কেটে নেয়। যুগীরকান্দী নামক একটি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫৪৩। কিন্তু সেখানে কাস্ট দেখানো হয় ১৮৩২ যা ভোট কারচুপির এবং জালিয়াতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

১৯৭২ সালের নির্বাচনী আইন অনুচ্ছেদ ২৫ ধারা অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার এ সকল কেন্দ্র স্থগিত করার কথা ছিল। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগের পক্ষ হয়ে এ সকল কেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করেননি যা নির্বাচনী আইন ৮৩ এবং ৮৪ এর সুস্পষ্ট লংঘন। এতে করে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জেল এবং জরিমানা সহ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ব্যারিস্টার রাজ্জাক বলেন, এমতাবস্থায় '৯১ ঘ' ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন চৌদ্দগ্রামের এ ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় পুনঃ নির্বাচন দিতে পারেন।

ব্যারিস্টার রাজ্জাক আরো বলেন, চৌদ্দগ্রামে নির্বাচন কমিশন তাদের সাংবিধানিক দায় দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ন্যায় বিচারের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন- এর নিকট চৌদ্দগ্রামের সব আসনে পুনঃ নির্বাচন ঘোষণার জন্য আবেদন করেন। [১৭/৬/৯৬, দিনকাল]

ঢাকা- ৪ আসনের ৩০টি কেন্দ্র দখল করে নৌকায় সীল দেয়া হয়েছে

ঢাকা-৪ আসনের ৩০টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা পুলিশ, বিডিআর ও আনসারের যোগসাজশে ভোট কেন্দ্র নিজেদের দখলে নিয়ে নৌকা প্রতীকে ঢালাওভাবে সীল মেরেছে। অনেকগুলো কেন্দ্রে প্রিজাইডিং পোলিং অফিসারসহ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। ঢাকা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য

www.pathagar.com

সালাউদ্দিন আহমেদ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ তুলে উক্ত আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি করেছেন।

জনাব সালাউদ্দিন বলেন, আমাকে ভোট কারচুপি করে হারিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালে ৫৪ হাজার ভোট পেয়ে ১৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে ৮৩ হাজার ভোট পেয়েও তিনি পরাজিত হয়েছেন বলে জানান। তিনি স্থানীয় আওয়ামী কর্মীদের নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিবরণ সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ১২ জুনের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকায় অনেক ভূয়া ও কল্পিত নাম অন্তর্ভূক্ত করেছে। এসব ত্রুটির কারনে প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে পারেন নি। পক্ষান্তরে ভাড়া করা লোক দিয়ে ভোট প্রদান করানো হয়েছে।

তিনি ৩০টি ভোট কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেন যে, এসব কেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের হাতে অমোচনীয় কালি মেখে ব্যালট পেপার শীট না কেটে তাদের বের করে দেয়া হয়। [১৭/৬/৯৬, দিনকাল]

ভোলা- ১ আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি

ভোলা- ১ আসেনে বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোশরফ হোসেন শাহজাহান গত শনিবার এক বিবৃতিতে তার আসনের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও কেন্দ্রে ব্যাপক ভোট কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন প্রায় ৮০টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে পুলিশ প্রহরায় ভোট কারচুপির পরও বাকি সবকেন্দ্রে জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। কিন্তু হঠাৎ করেই রাত ৯টার দিকে বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট জেলা শহরে নিয়ে গিয়ে 'ডবল' ছাপ দিয়ে বাতিল করে গোপন দরজার অভ্যন্তরে আমার ভোট পুনরায় গণনা করা হয়। তিনি বলেন, এখনও আমি নিশ্চিত যে আমি পরাজিত হইনি। অনেক ভোটে আমি জয়ী হয়েছি। আমাকে নানারকম কায়দা করে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, নির্বাচনের দিন বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে দেখার জন্য আমি চেয়েও পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট পাইনি। আমাকে দেয়া হয়নি। অথচ তোফায়েল আহমদের সঙ্গে সারাদিন এক ভ্যান বোঝাই পুলিশ দেয়া হয়েছিল। মোশারফ হোসেন শাহাজান তার আসনে পুনঃ নির্বাচন দেয়ার দাবি জানান। [১৭/৬/৯৬, দিনকাল]

বহু কেন্দ্রে পোলিং অফিসার নিজ হাতে নৌকায় সীল মেরেছে

নারায়ণগঞ্জ-১ রূপগঞ্জ আসনে বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেছেন, আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক ভোট কারচুপি, ভোট কেন্দ্র দখল এবং ধানের শীষের এজেন্টদের জোরপূর্বক কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে রেকর্ডসংখ্যক জাল ভোট দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ৫৪ সাল থেকে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে আসছি, কিন্তু এবারের ন্যায় ভোট কারচুপি ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন

www.pathagar.com

কখনও দেখিনি। জনাব মতিন তার নির্বাচনী আসেন ঘোষিত ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানান।

গতকাল রবিবার সিদ্ধেশ্বরীস্থ তার বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। এসময় তার নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন উত্তর প্রতিপক্ষের সন্ত্রাস এবং হুমকির মুখে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা মহিলাসহ শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মতিন চৌধুরী বলেন, প্রশাসন উলঙ্গভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে সহায়তা করেছে। এমনকি বহু কেন্দ্রে পোলিং অফিসার নিজহাতে নৌকার প্রতীকে সীল মেরেছে- যা অতীতের সকল অনিয়ম অন্যায়কে ম্লান করে দিয়েছে। তিনি বলেন নির্বাচনের ২/৩ দিন পূর্ব থেকেই বিএনপি কর্মীকে প্রাণে বাঁচতে হলে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্যে প্রতিপক্ষ শাসাতে থাকে। তিনি বলেন. নির্বাচনের দিন কায়েত পাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিমকে হাত, পা এবং চোখ বেঁধে সারাদিন আটকিয়ে রাখা হয়। নির্বাচনের ২দিন পূর্বে রূপগঞ্জ গ্রামের মামুন মিয়াকে রাস্তা থেকে ধরে নৌকার প্রার্থীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে বেদম মারধর করে কোনো অভিযোগ ছাড়াই থানায় সোপর্দ করা হয়। তনি বলেন, ভোট চলাকালে জোরপূর্বক, স্থান ভেদে অস্ত্রের হুমকি দিয়ে ধানের শীষের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়।

আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন. প্রিজাইডিং অফিসার এবং নির্বাচন কমিশনে এসব অভিযোগ দেয়া হলেও কোন প্রতিকার পাওয় যায়নি। [১৭/৬/৯৬, দিনকাল]

কেন্দ্র দখল করে আসম রব আমার বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে

সপ্তম সংসদ নির্বাচনে লক্ষীপুর-৪ (রামগতি) আসনের বিএনপি প্রার্থী এডভোকেট আব্দুর রব চৌধুরী এই আসনের জাসদ (রব) প্রার্থী আসম আবদুর রবের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ৬০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৯টি কেন্দ্রে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সবকয়টি কেন্দ্রে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ১৪ হাজার ২শ' ৩০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। পরাজয় নিশ্চিত জেনে আসম রবের নেতৃত্বে তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনী ১১টি কেন্দ্র দখল করে এসব কেন্দ্রের শতকরা ৯৩ ভাগ ভোট কেটে নিয়ে তার বিজয় ছিনিয়ে নেয়। তিনি বলেন, এসব কেন্দ্রে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী প্রার্থীর এজেন্টদের অস্ত্রের মুখে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রব চৌধুরী ১১টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানান। নির্বাচন কমিশনে তথ্য প্রমাণসহ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে উল্লেখ করে রব চৌধুরী বলেনঃ কমিশন সিদ্ধান্ত না দিলে তিনি আইনের আশ্রয় নেবেন। [দিনকাল ১৭/৬/৯৬]

www.pathagar.com

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি

নারায়ণগঞ্জ -৪ (ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক এমপি কামান্ডার সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এ আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি করেছেন। তিনি ১২ জুনের এ আসনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি বলে দাবি করেন।

গতকাল দুপুরে তার টানবাজারস্থ নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভোট কারচুপির বাস্তব চিত্রে তুলে ধরে বলেন, সরকারি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে, চাষাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে, পাগলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, করমআলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্র, পানির ট্যাংকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, শাহী বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, মাসদাইর তল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, পশ্চিম মাসদাইর প্রাথমিক বিদ্যলয় কেন্দ্র,মনিনাবন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী একে এম শামীম ওসমান ও তার সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী প্রতিটি কেন্দ্রে আমার মনোনীত পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। তারা জোর করে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে ব্যালট পেপারে ছিনতাই করে এবং অস্ত্রের মুখে ভীতি সঞ্চার করে নির্বাচনের সমস্ত আচরণ বিধি লংঘন করে ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট ।। নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির সাথে এক শ্রেণীর সরকারি ও নির্বাচনী কর্মকর্তা জড়িত

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং অনিয়ম করা হয়েছে বলে কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। অনিয়ম ও কারচুপির সঙ্গে এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার, কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তারা একটি বিশেষ দলের পক্ষ নিয়ে কারচুপিতে সহায়তা করেছেন বলেও রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের কারণে সরকারি মহলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে পোলিং অফিসার ভোটারদের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগায়নি। যার মাধ্যমে একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোট দিতে সহায়তা করা হয়েছে । রাজধানীর ৭টি আসনসহ দেশের উল্লেখযোগ্য আসনে ভোট কেন্দ্র থেকে বিএনপি'র পোলিং এজেন্টদের বল প্রয়োগে বের করে দেয়া হয় অথবা তদেরকে জাল ভোটারদের চ্যালেঞ্জ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়। এসব ব্যাপারে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এতে বলা হয়, ১২ জুনের নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ হয়েছে। তবে গুলিবর্ষণ করা হয়নি। আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে অনেক মহিলা ভোটারকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া পোলিং অফিসারের সামনেই অনেকে বিশেষ একটি মার্কায় সিল

www.pathagar.com

মেরেছে। জামালপুর সিলেট মিরপুরসহ বেশকিছু এলাকায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়েছে এমন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স থেকে সুকৌশলে সরানো হয়েছে। যা রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।

১২ জুন নির্বাচন শেষ হবার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ অংশগ্রহণকারী দলগুলো (আ' লীগ ব্যতীত) ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। নির্বাচন কমিশনকেও এই অভিযোগ লিখিত আকারে জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন আ' লীগ ব্যতীত কোন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ তদন্ত করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। আওয়ামী লীগ যেসব এলাকা থেকে অভিযোগ করেছে সেখানে নির্বাচনী বিধি রহস্যজনকভাবে কার্যকর করেছে। ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী কে এম ওবায়দুর রহমান, চাঁদপুর - ১ আসনে বিএনপি প্রার্থী আবু নসর এহসানুল হক মিলনসহ বেশ ক'জন বিএনপি প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেও ঘোষণা বাতিল এবং কয়েকটি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ১২ জুনের ভোট গ্রহণ সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এবং নির্বাচন কমিশনের তথ্যে কোনো মিল নেই। কমিশন বলেছে, কয়েকটি কেন্দ্র ব্যতীত ভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। অপরদিকে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে ব্যাপক কারচুপির কথা বলা হয়েছে। (১৯/৬/৯৬ দিনকাল)

কারচুপির প্রামাণ্য অভিযোগ

সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট কারচুপির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে ঢাক ১১ , ঢাকা-৬ নরসিংদী-৪, পাবনা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা ঘোষিত ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট দাবি জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ একই সঙ্গে ওই আসন গুলোর বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারগণ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন। তারা বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে পূনঃ নির্বাচন দিতে হবে।

আওয়ামী লীগ পদপ্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ১১/০৬/৯৬ সারা রাত নির্বাচন বিধি লংঘন করে বিভিন্ন এলাকায় ভোটার ও বস্তিবাসীদের বশীভূত করার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে। এ ব্যাপারে অভিযোগও দায়ের করা হয়, যা ফটোকপি দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১২ জুন নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ২নং ওয়ার্ডস্থ উত্তর কালসী সরকার বাড়ী কেন্দ্র, ৪নং ওয়ার্ডস্থ সরকারি ইউনানী আয়ুর্বেদীয় ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্র, ৫নং ওয়ার্ডস্থ ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, সোসাইটি ফর ইকনমিক এন্ড বেসিক এডভান্সমেন্ট কেন্দ্র, ৬ নং ওয়ার্ডস্থ রূপনগর হাউজিং এস্টেট জুনিয়র হাইস্কুল কেন্দ্র,

www.pathagar.com

আলহেরা রুপনগর কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু বিদ্যানিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, কাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি, হরিরামপুর ইউনিয়ন কামারপাড়া হাইস্কুল ২টি কেন্দ্র, ৮নং ওয়ার্ডস্থ নবাবের বাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, হযরত শাহ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৪নং ওয়ার্ডস্থ মিরপুর আদর্শ বিদ্যালয়, সেনপাড়া কেন্দ্রসহ প্রায় ৬০টি কেন্দ্রে (প্রয়োজনে কেন্দ্রগুলোর নাম দেয়া হবে) নৌকা প্রতীক লাগিয়ে শ' শ' অপরিচিত লোক কেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ঘোরাফেরা করতে থাকে।ভোট গ্রহণ শুরু হলে আমরা উপরোক্ত কেন্দ্রগুলোসহ অন্যান্য কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, বহিরাগত অনেক লোককে দেখা যাচ্ছে, যারা এলাকার বাসিন্দা ও ভোটার নয়। তাই তাদের অবিলম্বে কেন্দ্র হতে বের করে দেয়ার জন্য আমার পোলিং এজেন্ট ও প্রতিনিধিরা অনুরোধ করে। এতে প্রিজাইডিং অফিসার ও কর্তব্যরত লোকজন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু দেখা যায়, সেই অপরিচিত ও ভোটার নয় এমন শ' শ' লোক ভুয়া ভোটার পরিচয় দিয়ে ব্যালট পেপারে সীল মারে ও ভোট দিতে আরম্ভ করে। আমার পোলিং এজেন্টরা এতে আপত্তি জানালেও কর্মকর্তাগণ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এ সময়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা জোর করে আমার এজেন্টদের উপরোক্ত কেন্দ্রগুলো হতে বের করে দেয়। ফলে একতরফাভাবে প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিশের সহযোগিতায় অনেক কেন্দ্রের বাইরে ব্যালট পেপার বই নিয়ে নৌকা মার্কায় সীল মেরে কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে।

প্রায় লক্ষাধিক জাল ভোট উপরোক্ত কেন্দ্রসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে হোল্ডিং বিহীন বস্তি যেমন ২নং ওয়ার্ডে বালুর মাঠ বস্তি, উত্তর কালসী বস্তি, ৬নং ওয়ার্ডে ঝিলপাড়া বস্তি দুয়ারী পাড়া পুকুর পাড় বস্তি, ৭নং ওয়ার্ডে হাজী রোড বস্তি, ৮নং ওয়ার্ডে গুদারাঘাট, যুবলীগ নেতা মিয়ার মিয়া বস্তি, উত্তর বিশীল ফকিরবাড়ী বস্তি, বেড়িবাঁধ বস্তি, ১১ নং ওয়ার্ডের কল্যাণপুর পোড়া বস্তি নামে কথিত বস্তিতে ভোটার বানিয়ে জাল ভোট প্রদান করে।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে বার বার উক্ত বিষয়ে অবগত করলে তারা হুমকি দেয় যে, আর এ বিষয়ে বললে আপনাদের গ্রেফতার করা হবে। এভাবেই আওয়ামী সন্ত্রাসী ও বহিরাগত লোকজন সারাক্ষণ ভোট কেন্দ্র দখল করে রাখে এবং প্রকৃত ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা দেয় এবং প্রকৃত ভোটাররা ভোট না দিয়ে চলে যায়। এমনকি অনেক প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে এলে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে জানানো হয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে যা আগে কোন সময় কেউ দেখেনি।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ঢাকা-১১ আসনে ১২ জুন '৯৬-এর নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।
১৫/৬/ ৯৬ দিনকাল

www.pathagar.com

মির্জা আব্বাস সমর্থক গোষ্ঠী

মির্জা আব্বাস সমর্থ গোষ্ঠী ঢাকা- ৬ নির্বাচনী এলাকায় পুনঃনির্বাচনের জোর দাবি জানিয়েছে। গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনির এবং মহাসচিব মির্জা খাইরু হোসেন মনু মতিঝিল সবুজবাগের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে সাবের বাহিনীর গুণ্ডা-পান্ডাদের হুমকি, জাল ভোট প্রদান, কারচুপি ও ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ করেন। তারা বলেন, নির্বাচনের দিন বিকেল ৩টায় রাজারবাগ সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের ভোট কেন্দ্রে শেখ হাসিনার সামনেই বেআইনীভাবে জয়বাংলার মিছিল হয়েছে এবং মির্জা আব্বাসের পোলিং এজেন্টদেরকে হুমকি দেয়াতে ভোট গ্রহণ ব্যাহত হয়েছে। এই কেন্দ্রে বেআইনীভাবে নৌকাওলারা ৪/৫ জন করে পোলিং এজেন্ট রেখে নির্বাচনী আচরণবিধিও লংঘন করেছে। এ ব্যাপারে প্রিজাইডিং অফিসারকে লিখিতবাবে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোন রূপ প্রতিকার হয়নি।

তারা জানান, এছাড়া শান্তিবাগ, গোড়ান, মাদারটেক, বাসবো, মতিঝিল সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল, মুগদাসহ শাতাধিক ভোট কেন্দ্রে সূক্ষ্মভাবে জাল ভোট দেয়া হয়। আওয়ামী প্রার্থী সন্ত্রাসীরা ধানের শীষের পোলিং এজেন্টদেরকে অস্ত্র ঠেকিয়ে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়।

মির্জা আব্বাস সমর্থক গোষ্ঠী এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যায় বিচার দাবি করেছে এবং ঢাকা-৬ নির্বাচনী এলাকায় পুনঃনির্বাচনের আবেদন জানিয়েছে। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

পার্বত্য জেলাসমূহে পুনঃ নির্বাচন

পার্বত্য গণপরিষদ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর মদদে একটি দলের ব্যাপক সন্ত্রাস, জালভোট ও কারচুপির তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অবিলম্বে পার্বত্য জেলাসমূহে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে।

পরিষদের চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন মোঃ আলমগীর, ভাইস চেয়ারম্যান একেএম হারিজ এবং খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি ডাঃ মফিজুর রহমান তালুকদার বলেন, যতদিন পর্যন্ত শান্তিবাহনীর হাতে বেআইনী অস্ত্র থাকবে, ততদিন পার্বত্য জেলাসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা বলেন, প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকার ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ না থাকাতে সে সব ভোট কেন্দ্র শান্তিবাহিনী ও একটি দলের দখলে চলে যায়। কেবল মাত্র খাগড়াছড়ি জেলার ৪৫টি ভোট কেন্দ্রে প্রশাসনের কোনই নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেখানে ইচ্ছামত ব্যালট পেপারে সীল মেরে নৌকাওয়ালাদেরকে বিজয়ী করা হয়েছে। মহালছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা নৌকাছড়া বাবুছড়া লক্ষ্মীছড়িতে জাল ভোট অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

www.pathagar.com

সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের অভিযোগ

সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, ১২ জুনের ৭ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নরসিংদী-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করি। উক্ত নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের দিনে বেলাব থানার গোসালাকান্দা প্রাথমিক কেন্দ্র, পুরাদিয়া হাই স্কুল কেন্দ্র, মনোহরদী থানার কাচিকাটা ইউনিয়নের ৫টি নির্বাচনী কেন্দ্রসহ আরো ৫টি কেন্দ্রের নির্বাচনে নির্বাচন কার্যে নিয়োজিত প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সকাল ৯টা থেকে আমার পোলিং এজেন্টগণকে মারধর করে বলপূর্বক বের করে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত ব্যালট পেপারে সীল মারে।বিভিন্ন কেন্দ্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলী প্রিজাইডিং অফিসার, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট, রিটার্নিং অফিসার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লিখিতভাবে যথাসময়ে জানানো হয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলায় সাধারণ নারী-পুরুষ ভোটারগণ প্রাণভয়ে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করে চালে যায়, যার ফলে উপরোল্লিখিত কেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের প্রভাবে একতরফা নির্বাচন হয়, যা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধারনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ভোট গণনার সময় অনেক কেন্দ্র থেকে আমার পোলিং এজেন্টগণকে বের করে দিয়ে প্রশাসনের সাহায্যে ব্যাপক কারচুপি করা হয়। তিনি এসকল ভোট কেন্দ্রের ভোট বাতিলকরে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানান। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের-এর অভিযোগ

পাবনা- বেড়া- সাঁথিয়া এলাকা বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুর কাদের অভিযোগ করেছেন যে তার এলাকায় সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনসহ পুলিশ প্রশাসন তাদের নিরপেক্ষতা রাখেনি। বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন কর্মকর্তাগণ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সহযোগিতায় ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে বিএনপি এজেন্টদের বেড়া সাথিয়া অনেক ভোট কেন্দ্র থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয় এবং ভোটারদের ভোট প্রদানে বিলম্ব করে। মহিলা ভোটারদের ভোটদানের বিলম্ব সৃষ্টি করে তারা বিলম্ব হওয়ার কারণে বাড়িতে চলে যায়। পরে তারা আবার ভোট দিতে এসে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। এভাবে প্রশাসনের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ জাল ভোট প্রদান করে। এই বিলম্বের কারণের প্রতিকার চাইলে স্থানীয় প্রশাসন নীরব থাকে। তিনি বলেন এমন অনেক ভোট কেন্দ্র দেখা গেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও তার সমর্থকরা নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করে প্রকাশ্যে ভোট কেন্দ্রে নৌকা মার্কার প্রচার করে, যা নির্বাচন বিধিমালা ভঙ্গের সামিল। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রতিকার চাওয়া হলে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে। তিনি জানান, বেড়া থানার পুলিশ প্রশাসন বিএনপি'র ৫৩ জন নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে ডিটেনশন অর্ডার বের করে রাতে বাড়ি বাড় গিয়ে পুলিশী

www.pathagar.com

সন্ত্রাসের মাধ্যমে ধানের শীষে প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। তা ছাড়াও অক্সফাম, সমতা সমাজ কল্যাণ সমিতি ও ব্র্যাকের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মীদের নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে চাকুরি থাকবে না' বলে ভীতি প্রদর্শন করে।

জনাব মঞ্জুর কাদের বলেন, বেড়া, থানার নির্বাহী কর্মকর্তা নৌকা মার্কার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকল ষড়যন্ত্রের কৌশল অবলম্বন করেন। পাবনা- ১ নির্বাচনী এলাকায় সরকারি আমলা ও জনৈক পুলিশ সুপার ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়ে প্রকাশ্যে নৌকা মার্কার প্রচার করেন যা সরকারি চাকরির নিয়ম-নীতর বিরুদ্ধে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রতিকার জানালে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে আমার পাবনা-১ নির্বাচনী এলাকায় কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। আমি আগেই এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, পাবনার রিটার্নিং অফিসার ও পুলিশ প্রশাসনকে জাল ভোট প্রদান নির্বাচন আচরণ বিধি ভঙ্গ সম্পর্কে অভিযোগ করলেও কোন প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। (১৫/৫/৯৬ দিনকাল)

পুলিশ কর্মকর্তা আ' লীগকে জালিয়াতিতে মদদ দিয়েছে

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি জামালপুর- ২ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাজী রাশেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই,, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ভোট গণনার ফলাফল পরিবর্তন স্থগিত ঘোষিত কেন্দ্রের মনগড়া ফলাফল ঘোষণা করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ জানিয়ে বলা হয়, উক্ত নির্বাচনী এলাকার ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মাখলুকুর রহমান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকেও সরকারি পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট জালিয়াতিতে কর্মে মদদ দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পার্টির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতা জেয়াদ আল মাসুম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোর্শেদ আলী, আবদুল খালেক, জামাল হায়দার, মাহবুব আলম, এডভোকেট গোবিন্দ ঠাকুর, রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে কয়েক হাজার বৈধ ব্যালট পেপার প্রদর্শন করে নেতৃবৃন্দ বলেন জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনের ২০টি ভোট কেন্দ্রে নির্বিচারে ভোট ডাকাতি ও নির্বাচনের নামে চরম প্রহসনের প্রমাণ হিসেবে এলাকার পথে- ঘাটে ধান ক্ষেতে ভোটারদের প্রদত্ত কাস্তে মার্কায় সীল দেয়া অসংখ্য বৈধ ব্যালট পেপার গত দু' দিন ঘরে এলাকাবাসী কুড়িয়ে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

সিপিবি নেতৃবৃন্দ ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মাখলুকুর রহমানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে বেআইনীভাবে নির্বাচনী ফলাফল প্রভান্বিত করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিবরণ তুল ধরে বলেন, নির্বাচন প্রচারণার সময় থেকেই উল্লেখিত কর্মকর্তার আচরণ ছিল ওই বিশেষ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচন পরিচালনার স্বাভাবিক আইনসম্মত কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করা, অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্য মামলায় জড়ানো, মিথ্যা মামলার হুমকী দেয়া ইত্যাদি এবং একই সঙ্গে সেই বিশেষ প্রার্থীর কর্মী বাহিনীকে সকল রকম বেআইনী কাজে মদদ দেয়া। নেতৃবৃন্দ জানান এই প্রেক্ষিতে গত ২৭ মে উল্লেখিত পুলিশ কর্মকর্তাকে জরুরী ভিত্তিতে প্রত্যাহারের আবেদন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ সংশ্লিষ্ট ৭টি বিভাগে পাঠানো হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেননি। সিপিবি নেতৃবৃন্দ জামালপুর- ২ আসনের অনিয়ম, বেআইনী কার্যকলাপের বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ঘোষিত ফলাফল বাতিল করে উক্ত আসনে পুনঃনির্বাচনের জন্য দাবি জানান। (১৯/৬/৯৬ দিনকাল)

পুন ভোট গ্রহণের দিনেও ব্যাপক অনিয়ম কারচুপি ও ভোট জালিয়াতি হয়েছে

গতকাল বুধবার সপ্তম জাতীয়সংসদ নির্বাচনের স্থগিত ২৭টি আসনের ১২২টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বুধবার এই নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও ভোট জালিয়াতি এবং কুমিল্লা-২ আসনে ব্রাহ্মচাপিতলা কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা হামলা চলিয়ে ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ এখানে আওয়ামী লীগের ২ জনকে আটক করে। সন্ত্রাসীরা বিএনপি সমর্থক ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ও ব্যবসায়ী এরশাদুর রহমানকে মারধর করে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করে। কুমিল্লা-২ দাউদকান্দির বাউরিয়া ভোট কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি সশস্ত্র কর্মীরা সেখানে কর্মরত সরকারি বাহিনীর সদস্যদের উপর হামলা চালালে তারা পাল্টা জবাব দেয়। এতে জাতীয় পার্টির ৪জন সন্ত্রাসী আহত হয় এরা হলো মোঃ আলম, মাসুম. রোকন, সালাউদ্দিন। মোঃ আলমকে ঢাকায় প্রেরন করা হয়েছে। অপর ৩ জন কুমিল্লা হাসপাতালে।

সকাল ৯টায় এ ঘটনা ঘটে। অপরদিকে দুপুর ১২-৩০ মিঃ ব্রাহ্মণচাপিতলা কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা হামলা চালিয়ে ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিলে সেখানে দেড় ঘন্টা পর ভোট গ্রহণ শুরু করা হয়। পুলিশ এখানে আওয়ামী লীগের ২জনকে আটক করেছে। লাকসামের একটি কেন্দ্রে ভোটারদের যেতে বাধা দিলে পুলিশ এখানে আওয়ামী লীগের ২ জন কে আটক করে। অপরদিকে দেবিদ্বারের বড় মালঘর কেন্দ্রের বাইরে জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীরা বিএনপি সমর্থক ইউপি

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ও ব্যবসায়ী এরশাদুর রহমানকে মারধরে করে এলাকা ত্যাগে বাধ্য করে।

১৯ জুন আজ নারায়নগঞ্জ -২ আসনে (আড়াই হাজার) পুনঃনির্বাচন কালে ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এমদাদুল হক ভূঁইয়া পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৯শ ৪৭ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান খান আঙ্গুর পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৩শ ৮৮ ভোট। বিএনপি প্রার্থী আতাউর রহমান আঙ্গুর অভিযোগ করেছেন বহিরাগত রোকনউদ্দনি মোল্লার সশস্ত্র ক্যাডাররা অধিকাংশ নির্বাচনী কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্টদের জোর করে বের করে দেয় এবং তাদের বিভিন্ন হুমকি ও ভয়- ভীতি প্রদর্শন করে। বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রের বাইরে ও রাস্তায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দেয়। ফলে জনগণ ও ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নগ্ন চিত্র তুলে ধরে বলেন, আ' লীগ নেতা শামীম ওসমান, এস এম আকরা, মেজর জেনারেল (অবঃ) শফিউল্লাহ সশস্ত্র কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার জন্যে ভোটারদের হুমকি দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করবে, আপনাদের নৌকায় ভোট দিতে হবে। সামনে বিপদ কিংবা দুর্যোগ এলে আমরাই আপনাদের রক্ষা করবো।

আতাউর রহমান আঙ্গুর বলেন, সাতগ্রাম প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রে দায়িত্বরত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আলী হায়দার চৌধুরী ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার এক ঘন্টা আগে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন ভোট গ্রহণ শেষ। কষ্ট করে লাইনে দাড়িয়েছেন, এবার আরেকটু কষ্ট করে আপানারা বাড়ি চলে যান। জনাব আঙ্গুর নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভোট গ্রহণে অনিয়ম , ভোট জালিয়াতি ও নিরীহ ভোটারদের প্রকাশ্য হুমকি প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আর যাই হোক একে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যায় না। তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন দাবি জানান। [২০/৬/৯৬, দিনকাল]

সিলেট ৫ আসনে পুনঃনির্বাচন জামায়াত প্রার্থী ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হলো

সিলেট- (জাগঞ্জ- কানাইঘাট) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ মওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরীর নিশ্চিত বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে ঘোষিত ফলাফল উল্টে দেয়া হয়েছে। এলাকার জনগণের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত ১২ জুন নির্বাচনের দিন ঘোষিত প্রাথমিক ফলাফলে ৮৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮৪টিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মওলানা ফরিদ উদ্দীন ২৯ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তার নিকটতম প্রার্থী আওয়ামী লীগের ২৭ হাজার ৫৬৪ ভোট পান। এই ফলাফল রেডিও-টিভিতে এবং পত্র- পত্রিকায় প্রচার করা হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন গত সোমবার পর্যন্ত ৮৪টি কেন্দ্রের এই ফলাফল জানান। কিন্তু গতকালের নির্বাচনকে সামনে রেখে সিলেটের প্রশাসন ফলাফলকে পাল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়। তারা জামায়াত প্রার্থীর ভোট কমিয়ে ২৮ হাজার ৭১ এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ভোট বাড়িয়ে ২৭ হাজার ৬৮৩ করে নির্বাচন কমিশনে সংশোধিত ফল পাঠায়। পূর্বে প্রাপ্ত জামায়াত প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান কমিয়ে ৩৮৮তে নামানো হয়। গতকাল ঐ আসনের ১টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনে জামায়াত প্রার্থী মাত্র ৫০ ভোট লাভ করেন। পূর্বের প্রাপ্ত ভোটের সাথে গতকালের ৫০ ভোট যুক্ত হলেও তিনি যাতে বিজয়ী না হতে পারেন সেজন্য ষড়যন্ত্র সম্পন্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত বুধবার আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে ২৯ হাজার ৪৮৩ ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে জমায়াত প্রার্থীর প্রাপ্ত ২৯ হাজার ৭১৯ ভোট লাভ করতেন। কিন্তু যড়যন্ত্রের কারণে জনতার রায় বাস্তবে মুখ দেখল না।

গত বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনাকে ঢাকায় এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে নির্বাচন কমিশনার আবিদুর রহমানকে বলেন। আবিদুর রহমান জানান, তাদের কাছে পরে সংশোধিত ফলাফল এসেছে। তিনি এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করেননি। [২৩/৬/৯৬, সংগ্রাম]

সোলার্জের সামনেই ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়েছে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নেয়ার পরও তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি। গত ১৯ জুন কুমিল্লা-৩ আসনের চাপিতলা কেন্দ্রে জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে ৫০/৬০ জন আওয়ামী সন্ত্রাসী এ ঘটনা ঘটানোর পরও পুলিশ কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুরাদনগর থানার ব্রাহ্মণচাপিতলা কেন্দ্রে গত ১৯ জুন বিদেশী পর্যবেক্ষক স্টিফেন সোলার্জের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটে। প্রশাসন এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আঃ লতিফ লিখিতভাবে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে রিটার্নিং অফিসারকে (ডিসি) জানালেও তিনি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেননি। ঢাকায় প্রাপ্ত খবরঃ আগামীকাল ২২ জুন এই কেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত কাল থেকে জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ভোটারদের নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। [২১/৬/৯৬, দিনকাল]

কুমিল্লা- ৩ আসনে নজিরবিহীন কারসাজি অবশেষে
'জনতার মঞ্চে'র ডিসি'র গোপন তৎপরতা ফাঁস

নৌকার প্রার্থীকে পাস করানোর জন্য কুমিল্লার রিটার্নিং অফিসার (ডিসি) একটি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফলকে বাতিল করে দিয়ে নজিরবিহীন কারসাজির আশ্রয় নেয়। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কমিশন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কুমিল্লা-৩ আসনের ব্রাহ্মণচাপিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট গ্রহণ শেষে প্রিজাইডিং অফিসার আব্দুল লতিফ ভোট গণনা করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেন।এতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ২ হাজার ৯শ' ৮ ভোটে বিজয়ী হন কিন্তু এই কেন্দ্রে অনুল্লেখযোগ্য একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিটার্নিং অফিসার ভোট বাতিল করে দেন। যা একটি নজিরবিহিন কারসাজি।জানা গেছে, রিটার্নিং অফিসার 'জনতার মঞ্চে' উঠা একজন কর্মকর্তা। নৌকার প্রার্থীকে পাস করানোর জন্যে শুরু থেকেই তিনি সুকৌশলে তৎপরতা চালান। ফলাফলকে বাতিল করে দেয়ার মধ্য দিয়ে তার গোপন তৎপরতার নগ্নভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চাপিতলা কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফল আমাদের কাছে এসেছে।

উল্লেখ্য, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চাপিতলা কেন্দ্রের ঘোষিত বাতিল ফলাফলে দেখা যায়, এই কেন্দ্রে নৌকা পেয়েছিল ৭শ' ভোট, লাঙ্গলের প্রার্থী ৩শ' ৬৬ ভোট ও ধানের শীষের প্রার্থী ৩শ' ৬৬ ভোট। এই ভোটের সাথে পূর্বের ভোট যোগ করে দেখা যায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থী ২ হাজার ৯শ' ভোটে সুনিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে রয়েছিল। নৌকার প্রার্থী আব্দুল্লাহ হারুন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পেয়েছেন ৪৯,৯৯৩ ভোট ও ধানের শীষের প্রার্থী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া পেয়েছেন ৪৭,৭১৬ ভোট। লাঙ্গল প্রার্থী সর্বমোট ভোট পেয়েছেন ৫২,৯০১ ভোট। [২১/৬/৯৬, দিনকাল]

১৪৩ আইনজীবীর বিবৃতি ।। তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতিকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির ১শ' ৪৩ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে ১২ জুনের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কতিপয় রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিং অফিসারের সহযোগিতায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জালভোট ও কারচুপির নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিদাতারা বলেন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত কতিপয় কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশে ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে ১২ জুনের নির্বাচনে কারচুপি করেছে। তারা ভোট কেন্দ্র দখল করে বিএনপি'র পুলিং এজেন্টদের জোরপূর্বক বের করে দিয়ে ইচ্ছামত নৌকা মার্কায় সীল দিয়েছে। তারা বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন শেষে ফলাফল প্রকাশেও সীমাহীন অনিয়ম ও কারচুপি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন জাতিকে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনজীবীরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতা, আওয়ামী লীগর ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু'র তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন এডভোকেট লুৎফর আলম, এডভোকেট ফজলুর রহমান খান, এডভোকেট মোঃ মহসীন মিয়া, এডভোকেট মোঃ হাবিবুর রহমান মণ্ডল, এভোকেট মোহাম্মদ সানাউল্লাহ মিয়া ,

www.pathagar.com

মোহাম্মদ শাহাজাদা, এডভোকেট আনোয়ার জাহীদ ভূইয়া, এডভোকেট মোঃ খোরশেদ আলম, এডভোকেট খাদিজা বেগম হেলেন, এডভোকেট মোঃ নূরুল ইমাম বাবুল, এডভোকেট জাকিয়া আনরকলি, এডভোকেট খন্দকার দিদারুল ইসলাম, এডভোকেট মোঃ হাবিবুর রহমান, এডভোকেট আবদুল কাইয়ুম, এডভোকেট মোঃ নজরুল ইসলাম মণ্ডল, এডভোকেট হারুন অর রশিদ ভুইয়া ও এডভোকেট খালেদা পান্না। (১৯/৬/৯৬ দিনকাল)

সিলেট-২ আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি

সাবেক সংসদ সদস্য ও সিলেট- ২ আসন থেকে বিএনপি প্রার্থী এম ইলিয়াস আলী ভোট কারচুপির নির্বাচন বাতিল করে সিলেট- (বেলাগঞ্জ + বিশ্বনাথ) আসনে পুনঃ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ইলিয়াস আলী বলেন সিলেট-২ আনের সহকারী রিটার্নিং নির্বাচন কর্মকর্তা (এডিসি ল্যান্ড) প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে যাদের নিয়োগ করে তাদের অধিকাংশই ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক। এ সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ উত্থাপন সত্ত্বেও তাদের নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া হয়।

তিনি বলেন, এই কর্মকর্তারা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র থেকে বিএনপি সমর্থকদের ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়াও তাদের হয়রানি করে। তারা নৌকা সমর্থকদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খালি ব্যালট দিয়ে নৌকায় প্রকাশ্য সীল মারার ব্যবস্থা করে দেয়। এসব ব্যাপারে আমার এজেন্টরা প্রতিবাদ জানালে তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়।

তিনি বলেন, এএসপি আব্দুল খালেক এবং বিশ্বনাথ থানার ওসি আব্দুস সালাম যে সব কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করছেন সে সব কেন্দ্রে অহেতুক ভোটারদের লাঠিপেটা ও এজেন্টদের বের করে দেয়। এ দু' কর্মকর্তা নির্বাচনের পূর্ব রাতে কারণ ছাড়াই বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার ২৫/৩০ জন কর্মীকে আটক করে এবং ভোটের পরদিন জামিন ছাড়াই ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন নির্বাচনের দিন অনিয়মের প্রতিবাদ করায় এএসপি খালেক পিস্তল দেখিয়ে আমাকে গ্রেফতারে উদ্যত হয়। কিন্তু ভোটারদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় তিনি ব্যর্থ হন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইলিয়াস আলী বলেন, বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ থানার পৃথক দু'টি কন্ট্রোলরুমে যখন ফলাফল আসছিল তখন আমি ব্যাপক ভোটে এগিয়েছিলাম।আমার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অবস্থান ছিল তৃতীয়। এ অবস্থায় রাত ৯টার পর এএসপি খালেক ও বিশ্বনাথ থানার ওসি কন্ট্রোল রুম থেকে আমাকে বের করে দিয়ে ফলাফল বন্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

একইভাবে বালাগঞ্জ থানায় আমার প্রধান নির্বাচন এজেন্ট আবদাল মিয়াকে কন্ট্রোল রুমে ঢুকতে দেয়া হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন পরে অবশিষ্ট ৩০ টি কেন্দ্রের ফলাফল পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী করা হয়। [১৯/৬/৯৬, দিনকাল]

কুমিল্লা -৫ আসনে ১১টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন দাবি

কুমিল্লা-৫ নির্বাচনী আসনে বিএনপি প্রার্থী আবুল কাশেম ১১টি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়ে বলেছেন, এসব কেন্দ্রে ব্যাপক ভোট কারচুপি, জোর পূর্বক তার এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে পোলিং এজেন্টরা নিজ হাতে সীল মারার মাধ্যমে তাকে হারিয়ে দেয়। তিনি বলেন, এসব কেন্দ্রে ভোটকারচুপি হতে পারে এরূপ আশংকা করে পূর্বাহ্নেই নির্বাচনের দিন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং বড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া থানা টিএনও বরাবরে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেননি। জনাব কাশেম প্রকাশিত ফলাফল বাতিল করে ১১টি কেন্দ্রে অথবা পুরো আসনে পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কাছে নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন অনিয়মের বিশদ বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণপাড়া থানাধীন কান্দুঘর, মাধবপুর, বড়ধসিয়া, ধান্যদৌল , বেড়াখোলা, দীঘির পাড়. শিদলাই, নাগইশ নাইঘর এবং বড়িচং থানাধীন কোরপাই হরিন্ধরা, কেন্দ্রসমূহে আমার পক্ষের পোলিং এজেন্টদেরকে প্রতিপক্ষের দলের সন্ত্রাসীরা কেন্দ্র থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বের করে দিয়ে নোকা মার্কার পক্ষে অবৈধভাবে সীল মেরে বিপুল সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করে। উক্ত কেন্দ্রগুলোর ফলাফল তুলনা করলেই এর সত্যতা বুঝা যাবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পোলিং এজেন্টদের লিখিত অভিযোগ প্রিজাইডিং অফিসাররা রহস্যজনক কারণে গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে উক্ত কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই অনুন্নত যে যন্ত্রচালিত কোন যান বাহন চলাচল করতে পারেনি বিধায় ওই সময় কোন টহল পুলিশ ছিল না। ওই সব কেন্দ্রসমূহে একজন পুলিশ ও ৩/৪ জন আনসার ব্যতীত অন্য কোন রক্ষীদল ছিল না। [১৯/৬/৯৬, দিনকাল]

প্রশাসনের সহায়তায় কাপাসিয়ায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে

বিএনপি'র কেন্দ্রী নেতা ও সাবেক মন্ত্রী বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) এ এস এম হান্নান শাহ গত ১২ জুন নির্বাচনে গাজীপুর- ৪ আসনে ব্যাপক ভোট কারচুপি ও জালিয়াতি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে ওই এলাকায় পুনঃনির্বাচন দাবি করেছেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নির্বাচনের দিন যে অনিয়ম করা হয়েছে এর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের অধীনে এই পুনঃনির্বাচন দাবি করেছেন। গতকাল শনিবার গাজীপুর- ৪ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হান্নান শাহ বিএনপির চেয়ারপার্সন

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার দাবি উত্থাপন করেন। অভিযোগে তিনি বলেন, গত ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন গণতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে ভোট কারচুপি, জালিয়াতি ও সন্ত্রাসী কাজ চালানো হয়েছে তা কাপাসিয়া থানা এলকায় আর কখনও হয়নি। তিনি বলেন এই এলাকায় বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে আওয়ামী সন্ত্রাসীদর হাতে বিএনপি সমর্থিত পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নাজেহাল করা হয়েছে। এমনকি কয়েকজন মহিলা কর্মীকে বিবস্ত্র করারও চেষ্টা করা হয়। খিরটি গ্রামের বেগম মালেকাকে শারীরিক আঘাত করার সময় স্থানীয় লোকজনের প্রতিবাদের মুখে আওয়ামী কর্মীরা পিছু হটে যায়। জনাব হান্নান শাহ অভিযোগে আরো বলেন, গাজীপুর-৪ আসনের ৫৯টি নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টি কেন্দ্রের ভোট গণনায় তিনি এগিয়ে ছিলেন, যা টিভি ও রেডিওতে নির্বাচনের পর মধ্য রাতে প্রচার করা হয়েছিল। বিএনপি প্রার্থী উক্ত এলাকায় নির্বাচন তদারককারী এডিসি ল্যান্ড, টিএনও ও থানা সমাজকল্যাণের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বলেন, এদের সহায়তায় ১৫টি কেন্দ্র হতে বিএনপি'র এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়েছে। ২০টি সেন্টারে গোলযোগ বাঁধিয়ে উপস্থিত ভোটারদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে জাল ভোট ও নৌকা প্রতীকে সীল মারার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। ১টি সেন্টারে কোন ভোট গ্রহণ করা হয়নি। ওই সেন্টারের প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে ফিরে গেছেন। [১৬/৬/৯৬, দিনকাল]

বরিশাল-১ আসনের ১৩টি কেন্দ্রে পুনঃভোট গণনার দাবি

ভোট গণনার কারচুপি, জালভোট প্রদান , সন্ত্রাস সৃষ্টি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোট কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ছিনতাই এর অভিযোগ করেছেন, বরিশাল- (গৌরনদী- আগৈলঝরা) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট কাজী গোলাম মাহাবুব। তিনি নির্বাচনী এলাকার ১৩টি কেন্দ্রে ভোট পুনঃ গণনা অথবা সমগ্র আসনেই পুনঃ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

কাজী গোলাম মাহাবুব ১২ জুনের নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ রিটার্নিং অফিসার এর কাছে পেশ করেছেন।

তিনি ভোট গণনার কারচুপির সুনির্দিষ্ট অভিয়োগ উত্থাপন করে জানান, গৌরনদীসহ এলাকার অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে তিনি বেশী ভোট পেলেও আগৈলঝরা থানার ১৩ ভোট কেন্দ্রে সুপরিকল্পিতভাবে ভোট গণনায় কারচুপি করে তাকে মাত্র দেড় হাজার ভোটে পরাজিত দেখানো হয়।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রবল বৃষ্টিপাতসহ প্রাকৃতিক দুযোর্গের কারণে এলাকার অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে মাত্র শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ ভোট পড়লেও শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পড়ার হিসাব দেখানো হয়।

www.pathagar.com

এলাকার মোট ৩৫টি কেন্দ্রের ২২টিতে ভোট গণনা শেষ হলে ওই রেজাল্টে বিএনপি প্রার্থী এগিয়ে থাকায় পরিকল্পিতভাবে ১৩টি কেন্দ্রের বিএনপি'র সকল এজেন্টদের বের করে দিয়ে রাত ১২ টায় সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসাররা মনগড়াভাবে একটি ফলাফল তৈরি করে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠায়। যাতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রায় দেড় হাজার ভোটে অগ্রগামী দেখানো হয়।

এছাড়াও মহিলাদের ভোট প্রদানে বাধা প্রদান, বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে মন্থরগতিতে ভোটগ্রহণ, ২ ঘণ্টা ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দ্বারা ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যাপক বোমাবাজি, মোটর সাইকেলে সন্ত্রাসী মহড়া সৃষ্টি, আগেলঝড়ায় একটি বিশেষ সম্প্রাদায়ের লোকদের নির্বাচনী দায়িত্ব পদান করা হয়। এ সব নির্বাচনী কর্মকর্তারাই মূলত নির্বাচনী অনিয়মের ঘটনা ঘটায়।

কাজী গোলাম মাহাবুব জানান, সকল অভিযোগের কথা নির্বাচন চলাকালে ও তার আগে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসারসহ প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। [১৯/৬/৯৬, দিনকাল]

দেড়শ' আসনে বামাসপে'র পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা
নির্বাচনে প্রচুর জাল ভোট পড়েছে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ

১২ জুনের নির্বাচনে শ' শ' জাল ভোট দেয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ। মহিলাদের জন্য ভোটার কক্ষ ছিল অপর্যাপ্ত। ব্যালট পেপারে সীল দেয়ার গোপন জায়গাটি গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ অনুকুল ছিলনা।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিমত ব্যক্ত করেন বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ)। নেতৃবৃন্দ জালভোট ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট ব্যাপকভাবে রোধ করার জন্য ব্যক্তিগত পরিচয়সহ ভোটার পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নির্বাচন কালে হাঙ্গামা ও সহিংসতায় সারা দেশে শিশুসহ মোট ১১ ব্যক্তি নিহত , কমপক্ষে ৫শ' আহত এবং নির্বাচনী আচরণ বিধি লংঘনের কারণে ২২৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৭৬টি মানবাধিকার সংগঠকদের সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠান বামাসপের পক্ষ থেকে ৪ হাজার পর্যবেক্ষক দেশের ১৫০টি সংসদীয় আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে নেতৃবৃন্দ জানান। মানাবাধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগরীর ফলাফল বিলম্বে প্রকাশ করা প্রসঙ্গে বলেন, কেন বিলম্ব হলো আমরা জানি না। দ্রুত ফলাফল ঘোষণা হঠাৎ থেমে যাওয়ায় মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের পরিচয়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ এজন্য তাদের অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, মফস্বলের অনেক সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্রের অভাবে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারেনি। [১৫/৬/৯৬, দিনকাল]

www.pathagar.com

৮ ডিসি নিরপেক্ষ নন, বিএনপি'র অভিযোগ
নির্বাচন কমিশন খন্ডাবেন কিভাবে

আমিরুল ইসলাম কাগজী॥ বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ও নির্বাচন কমিশন যে আসলেই নিরপেক্ষ কিংবা নির্দলীয় নয় তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণার মধ্যদিয়ে। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন অজুহাত ও মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের ঢালাওভাবে ধরপাকড় করার এক পর্যায়ে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ড দেখে মনে হচ্ছে তারা একটি বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করছেন। তারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখছেন না। প্রধান উপদেষ্টার অধীনে সংস্থাপন, তথ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলো থাকার করণে তাঁকে এ ব্যাপারে সময় সময় অবহিত করা হয়েছে কিন্তু তিনি কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেননি। এমনকি তিনি নিজেই ৩০ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণকরার পর সচিবালয়ে সচিবদের উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন, নির্বাচিত সরকারের বাইরে কোন দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মকর্তার অবকাশ নেই। উল্লেখ্য প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদের নামে মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও পাট সচিব শফিউর রহমানসহ কতিপয় কর্মকর্তা প্রেসক্লাবের সামনে আওয়ামী লীগ নির্মিত জনতার মঞ্চে ওঠে বক্তব্য দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করার পর সাধারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় প্রধান উপদেষ্টা একথা বলেন। দেশবাসী ভেবেছিল প্রধান উপদেষ্টা তার ওই বক্তব্য দেয়ার পর কোন পদক্ষেপ নেবেন? কিন্তু আসলে তিনি ওই কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলী করে নিরপেক্ষ সরকার তার নিরপেক্ষতা চরমভাবে লংঘন করলো। সভা সমাবেশ ও বিভিন্নভাবে বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন।

বিএনপি নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে বিশষভাবে ফরিদপুরের ডিসি সাইফুল আলম, নীলফামারীর ডিসি শাহজাহান সিদ্দিকী, রাঙামাটির ডিসি শাহ আলম, ভোলার ডিসি আব্দুল মান্নান, কুষ্টিয়ার ডিসি সিরাজুল হক, ময়মনসিংহের ডিসি এনামূল কবীর, কুমিল্লাহর ডিসি খান মুহাম্মদ নুরুল হুদা এবং টাঙ্গাইলের ডিসি আব্দুস সাত্তার খানকে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। তারা রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করলে নির্বাচন কোনো অবস্থাতেই সুষ্ঠু হবে না। বিএনপি যখনই উক্ত ডিসিদের সম্পর্কে অভিযোগ তুললেন নির্বাচন কমিশনের চরিত্র নিরপেক্ষ হলে ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতো। নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করিয়ে বিএনপির সন্দেহ এবং অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করলো। নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই ডিসিদের ছিল একটি দলের প্রতি আনুগত্যশীল। নির্বাচনের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ভোলার ডিসি ও এসপি'র প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রদল নেতা নিহত হবার পরও

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন ওই ডিসি এসপি'র বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এত চাক্ষুস প্রমানের পরও নির্বাচন কমিশন উক্ত রিটার্নিং অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং একটি দলের পক্ষ হয়ে দলীয় ক্যাডারের মতো ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করেছে বলে পর্যবেক্ষক মহল হনে করে। সবশেষে নির্বাচনের দিনে উক্ত রিটার্নিং অফিসারগণ একটি দলের নীল-নকশা বাস্তবায়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন বলে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কুমিল্লার রিটার্নিং অফিসার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফলাফল নিজ হাতে আটকিয়ে রেখে। এ ব্যাপারে গতকাল বৃহস্পতিবার দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় একটি তথ্য ভিত্তিক সংবাদ ও পরিবেশিত হয়েছে। কেবলমাত্র তাঁর জেলাতেই ১২ টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনের ফলাফল স্থগিত রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন এসব রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত বিএনপির অভিযোগ কিভাবে খন্ডাবে? কিভাবে প্রমান করবে তারা বিএনপি/র বিরুদ্ধে কাজ করে নাই? নির্বাচন কমিশন কিভাবে সমাধান দেবে বিএনপি'র বেনিফিট অব ডাউটের? [দিনকাল- ১৫/৬/৯৬]

৪ দিনে নির্বাচনের গেজেট প্রকাশ॥ '৭৩-এর রেকর্ড ভঙ্গ
নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ

মিডিয়া সিন্ডিকেট॥ বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্রুততম সময়ে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল প্রকাশের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বর্তমান নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার আগে আংশিক ফলাফলের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঘটনাও এই প্রথম।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের গতিই ছিল এ পর্যন্ত বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে দ্রুততম। কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগে কলংকিত ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭মার্চ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের ১১ শীর্ষ নেতা। নির্বাচনের ৩শ' আসনের সরকারি ফলাফল গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১২ মার্চ অর্থাৎ ৫দিন পর। অন্যদিকে সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠানের মাত্র চারদিন পর ২৭৩ টি আসনের ফলাফল গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনেরই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে আংশিক ফলাফল প্রকাশের ঘটনা এবারই প্রথম। কমিশন এতদিন ধরে যে কনভেনশন অনুসরণ করছিল, তা হচ্ছে সব আসনের ফলাফল একসঙ্গে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা। কারণ, নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর এক সঙ্গে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পার্লামেন্টের গঠনটি স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এর মাধ্যমে মহিলা সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর আসন প্রাপ্তির বিষয়টিও পরিস্কার হয়। কেননা সংসদ ৩শ' নয় ৩৩০ সদস্য দ্বারা গঠিত। আরেকজন নির্বাচন বিশেষজ্ঞের মতে, মূলত দ্রুত

www.pathagar.com

সরকারি ফলাফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এবং ১৯৭৩ সালের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে।

সংসদ নির্বাচনগুলোর সরকারি ফলাফল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৭৯ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছিল তার ৩শ' আসনের ফলাফল একসঙ্গে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছিল ৭ মার্চ। দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব ঘটায় বাকি আসনগুলোর ফলাফল প্রকাশও ধরে রাখা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচন হয়েছিল ৭মে। আর গেজেটে ৩শ' আসনের ফলাফল বেরিয়েছিল ১২ জুন। ১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট বেরিয়েছিল ৬মার্চ। ২৯৮ টি ফলাফল তখন প্রকাশ করা হয়েছিল এজন্যে যে, প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে দু'টি আসনে উপ-নির্বাচন করতে হয়েছিল পরে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

উল্লেখ্য, শুধু এবারের সংসদ নির্বাচনেই স্থগিত আসনগুলোর পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে আংশিক ফলাফল প্রকাশ করে দেয়া হল (১৮/৬/৯৬ দিনকাল)।

৭৩ শতাংশের কতো শতাংশ জাল ভোট

১২ জুনের সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। এই কারচুপি পূর্বপরিকল্পিত, ষড়যন্ত্রমূলক ও ইতিহাসে বিরল ঘটনা। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ নির্বাচনের পরের দিন ঢাকার কাকরাইলস্থ বিএনপি'র নির্বাচনী কার্যালয়ে জনাকীর্ণ এক প্রেস ব্রিফিং- এ বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

দিন যতই গড়িয়ে যাচ্ছে ১২ জুনের নির্বাচনের কারচুপির নিত্যনতুন খবর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হচ্ছে। এসব খবর পড়ে চমকে যেতে হয়, শিউরে উঠতে হয়। বগুড়ার মালতিনগরে এক অন্ধ বৃদ্ধা কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে প্রিজাইডিং অফিসারকে ধানের শীষে ভোট দিতে বলেন। কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার নৌকায় সীল মারে। পরে বৃদ্ধা পোলিং এজেন্টদের ব্যালট পেপারে প্রদর্শন করলে ওই প্রিজাইডং অফিসার পালায়নের চেষ্টা করে গ্রেফতার হন। রাজধানী ঢাকা সহ সারাদেশের অসংখ্য ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী মাস্তান কর্তৃক ভোটকেন্দ্র দখল, পছন্দসই মার্কায় সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করার খবর পাওয়া গেছে। ভোটকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দলের পোলিং এজেন্টদেরও বের করে দেয় তারা।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমও ১২ জুনের নির্বাচন সম্পর্কে একই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। জাপার ব্যারিস্টার মওদুদ [বর্তমানে বিএনপিতে] কাজী জাফর প্রমুখেরা এ নির্বাচনকে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। এ কারণে তারা বিভিন্ন আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করেছেন। বিএনপি'ও একই কারণে ১১১টি আসনে পুনঃনির্বাচন দাবি করেছে।

www.pathagar.com

যেসব নির্বাচনী এলাকায় ভোট কারচুপি হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা তার বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন, ভুয়া ভোট সম্পর্কে যথাসময়ে যথা নিয়মে ভোট গ্রহন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের লিখিতভাবে জানানো হলেও তার প্রতিকার করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনকে এসব অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, ১২ জুনের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। জার্মানির তৈরি লিকুইড ক্লোরোফর্ম কারচুপি তথা ভূয়া ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচন কমিশন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে লিকুইড ক্লোরোর্ফম সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কিন্তু দুঃজনক হলেও এ কথা সত্য যে, এ বিষয়ে তারা কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। যার ফলে ১২ জুনের নির্বাচনে ব্যাপক হারে জাল ভোট দেয়ার পথ মহল বিশেষের কাছে সুগম হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে উদাস থাকার কারণ সত্যিই রহস্যজনক।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ১২ জুনের নির্বাচনকে পুকুর চুরির নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনার হিসেবে তালিকাভুক্ত ভোটারদের ৭৩ শতাংশ সপ্তম সংসদ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ইতিপূর্বে কোন সংসদ নির্বাচনে এতো ভোট পড়েনি। নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এতো ভোট কোনোভাবে পড়তে পারে না। বর্তমান নির্বাচনী কাঠামোতে এ পরিমান ভোট গ্রহন করা সম্ভব নয়।

একজন ভোটারকে ভোট কক্ষে নিজের পরিচয় প্রদান করা সই করা ব্যালট পেপার সংগ্রহ ও সীল মেরে বাক্সে ভরা ইত্যাদি কাজ শেষ করতে অন্ততঃপক্ষে তিন মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। এবার মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ ৮৮ হাজার ৯শ' ৬৬। এর ৭৩ শতাংশ হচ্ছে ৪ কোটিরও বেশি। ৪ কোটি ভোটারের মাথাপিছু তিন মিনিট করে ধরলে ভোটদানে সময় লাগে ১২ কোটি মিনিট বা বিশ লাখ ঘন্টা।

ভোটদানের নির্ধারিত সময় হচ্ছে ৮ ঘন্টা। এবারে নির্বাচনে ভোটকক্ষ ছিলো ১ লাখ ১০ হাজার, ৬শ ৪৭টি। অর্থাৎ সকল ভোট কেন্দ্রে মোট সময় ছিলো ৯ লাখ ১৭ হাজার ঘন্টা। হিসেব মতে ৭৩ শতাংশ ভোটারের ভোট প্রদানে সময় লাগবে বিশ লাখ ঘন্টা। এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে- তারা ৯ ঘণ্টায় এতো ভোট দিলো কি করে। নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে ইচ্ছে করে গড়ে ৭৩ শতাংশ প্রদত্ত ভোটের কতো শতাংশ জাল ভোট? [১৬/৬.৯৬, জনতার ডাক]

সংবাদ নেপথ্য নির্বাচনের ফল প্রচার, টিভির মূল স্টুডিওতে যা ঘটেছে

নির্বাচনের ফলাফল প্রচারে টিভির একশ্রেণীর কর্মকর্তা যে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছেন তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

রামপুরা টিভি স্টেশন থেকে ফলাফল প্রচারে বিলম্ব করা ভূল ফলাফল প্রচার বিএনপি'র আসনসংখ্যা প্রথমে বেশী দেখানো পরে সংশোধন করা এবং স্টুডিওতে বিরাজমান বিশৃংখল অবস্থা- অসংখ্য দর্শক- শ্রোতার কাছে রহস্যজনক ও ষড়যন্ত্রমূলক মনে হয়েছে। এসব ঘটনার পেছনে পরাজিত একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা কলকাঠি নেড়েছেন বলে টিভি ভবনের একটি সূত্র জানায়।

টিভি ভবনে সেদিন নির্বাচনী ফলাফল প্রচার করতে গিয়ে কি ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। সরকারের উর্ধ্বতন মহল এ ব্যাপারে নাখোশ হয়েছেন।

এবার নির্বাচনী ফলাফল প্রচারে টিভি দু'ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রচাররের জন্য নির্বাচন কার্যালয়ে এবং প্রাপ্ত দলীয় আসন সংখ্যা দেখানো ও সংবাদ বুলেটিন প্রচারের জন্য রামপুরা টিভি স্টুডিওতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে টিভির উপমহাপরিচালক মোস্তফা কামাল সৈয়দকে এবং রামপুরা টিভি কেন্দ্রে জেনারেল ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমানকে মুল দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকেফলাফল প্রচরে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু টিভি কেন্দ্র থেকে ফলাফল প্রচারে দারুণ ঘাপলা হয়।

নির্বাচনের পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের দিকে টিভি কেন্দ্রের স্টুডিওতে দীর্ঘক্ষণ দলীয় অবস্থান দেখানো হয়নি। এ সময় বিএনপি ১০৫টি আসন পেয়েছে বলে প্রচার করা হয়। নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে এ ব্যাপারে আপত্তি জানানো হলে বেশ কিছুক্ষণ পরে তা সংশোধন করে ১০৪টি আসন বিএনপি পেয়েছে বলে জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন স্টুডিও থেকে টেলিফোনে টিভি কেন্দ্র স্টুডিওর কর্মকর্তাদের দলীয় অবস্থান দেখানোর জন্য বলা হয়, কিন্তু তা দেখানো হয়নি। টিভির মহাপরিচালক (ডিজি) শাহরিয়ার জেড ইকবাল তখন সার্বক্ষণিকভাবে টিভির কন্ট্রোল রুমে অবস্থান করছিলেন। সরকারের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব তার কাছে টেলিফোনে ফলাফল প্রচারে অনিয়মের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডিজি কন্ট্রোল রুম থেকে স্টুডিওতে কয়েকবার টেলিফোন করে বোর্ডে দলীয় অবস্থান দেখানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু তা মানা হয়নি। এরপর ডিজি কন্ট্রোল রুম থেকে নেমে স্টুডিওতে প্রবেশ করে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ এবং অবিলম্বে দলীয় অবস্থান দেখানোর নির্দেশ দেন। তখন স্টুডিওতে মনোয়ারা বেগম সংবাদ বুলেটিন পাঠ করছিলেন। ডিজি উচ্চস্বরে কথা বলায় সংবাদ প্রচারে অসুবিধা হয় এবং এটাকে উপস্থিত কর্মকর্তারা ' অপমানজনক' মনে করে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। কয়েকজন কর্মচারী কমিশন কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনরত অতিরিক্ত সচিবকে বলেনঃ মন্ত্রণালয়ের সচিব নিজে টিভি স্টুডিওতে গিয়ে ডিজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কর্মচারীরা ফলাফর প্রচার বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। অতিরিক্ত সচিব ধমক দিয়ে যথাযথভাবে জাতীয় দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিলে সবাই চুপ হয়ে যান।

www.pathagar.com

টিভির একটি সূত্র জানায়, বিএনপি ১০৫টি আসন পেয়েছে প্রচার করা হয়েছে কর্মচারীদের ভূল হিসেব কষার জন্য। এ ব্যাপারে টিভির হিসাব বিভাগের অদক্ষতকে দায়ী করা হয়।

সূত্রটি জানায়, ফলাফল, প্রচারের সময় টিভি স্টুডিওতে 'দায়িত্ব দেয়া হয়নি এমন' কাউকে প্রবেশ না কারার জন্য নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে নির্দেশ কেউ মানেনি। তখন টিভি স্টুডিওতে হাটবাজারের মতো অবস্থা বিরাজ করে।

সূত্রটি জানায়, এবার টিভিতে নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের জন্য কম্পিউটর ব্যবহার করার কথা ছিল। এজন্য টিভি প্রকৌশল বিভাগ সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা তা ব্যবহার করেননি। একজন প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলেও কোন কাজ হয়নি। কম্পিউটার ব্যবহার করলে স্টিডিওতে বিশাল বোর্ড স্থাপন করার প্রয়োজন হত না।

নির্বাচনী ফলাফল প্রচার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা- কর্মচারীরা অতিরিক্ত টাকা খরচ করেছেন বলেও আপত্তি উঠেছে। দু'দিনে শুধু মেকআপে পাউডার সামগ্রী কেনার জন্য ১৮ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।

টিভিতে নির্বাচনী ফলাফল প্রচারে এমন অনিয়মের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। তারা মনে করেনঃ টিভির এতোদিনকার ভাবমূর্তি যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উন্নতি ঘটতে না পারে তার জন্য টিভির একটি মহল সুকৌশলে চেষ্টা করছে। (১৭/৬/৯৬ সংবাদ)

টিভি'র ১ জন কর্মকর্তার দলবাজি

গত ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিটিভিতে প্রচারে সময় টিভির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের ফলাফল একতরফাভাবে প্রচারে জন্যে টিভির জিএম, কর্মকর্তা ও সংবাদ পাঠক- পাঠিকাদের চাপ দেন এবং তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে নির্বাচনের দিন গভীর রাতে বিটিভির কর্মচারীরা টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল প্রচার প্রায় ২ ঘন্টা বন্ধ রাখেন। বিটিভির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গত ১৫ জুন টিভি ভবনে সমাবেশ করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও বাড়াবাড়ির কারণে বিটিভির'র মহাপরিচালকের অপসারণ দাবি করেছে।

বিটিভি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদেরকে হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার জন্যে টিভির মহাপরিচালককে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়েছে এবং তার অপসারণ চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। সূত্র জানায়, টিভির মহাপরিচালক গত ১২ জুন নির্বাচেনের ফলাফল ঘোষণাকালে বার বার হস্তক্ষেপ করছিলেন। আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থীদের নাম আগে ও বিএনপি বিজয়ী প্রাথীদের নাম পরে ঘোষণার জন্যে তিনি বার বার বিশেষ নির্বাচনী বুলেটিন পাঠক-পাঠিকাদের চাপ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে মধ্যরাতে যখন জনৈকা সংবাদ পাঠিকা নির্বাচনের ফলাফল পাঠ করছিলেন তখন তিনি ঘোষণাকক্ষে প্রবেশ করে উপস্থিত টিভি কর্মীদের অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। তিনি টিভির জিএমকে যাচ্ছেতাই বকাবকি করেন।

www.pathagar.com

বোর্ডে আওয়ামী লীগ যে বেশী আসন পাচ্ছে তা দেখানোর জন্যে সংবাদ পাঠক-পাঠিকাকে চাপ দিতে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের টিভি বুথ বন্ধ করে দিয়ে ডিজি রামপুরার টিভি ভবন থেকে প্রগ্রেসিভ ফলাফল পাঠানোর নামে এসব করেন। তখন নির্বাচন কমিশন টিভি বুথে বিশেষ বুলেটিন পাঠের দায়িত্বে রত আসমা আহমেদ মাসুদ ও এহসান আহমেদকে বসে থাকতে দেখা যায়। ডিজির আচরণের প্রতিবাদে ২ ঘন্টা ফলাফল প্রচার বন্ধ থাকলে টিভিতে ছায়াছবি দেখানো হয়। এ সময় কর্মকর্তারা জাতীয় স্বার্থে ফলাফল প্রচার চালু করার অনুরোধ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে টিভির ডিজির অপসারণের দাবির মধ্যে দিয়ে ঘটনার আপাত সমাপ্তি ঘটানো হয়। টিভির ডিজি ওইদিন রাতে টিভি ভবনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পাঠকদের দেখে নেয়া হবে। জবাবে উত্তেজিত কর্মীরা তাকে বলেন এটা ফুড ডিপার্টমেন্ট নয়। (দিনকাল) ১৮/৬/৯৬)।

www.pathagar.com

একটি জাতীয় দৈনিকের দৃষ্টিতে

নীল নকশার নির্বাচন, নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব এবং নির্বাচনের আগের রাতে দান খয়রাত

নীলনকশার নির্বাচন

নির্বাচনী সন্ত্রাসে ৬ জন নিহত ও ৫ শতাধিক আহত হলো, ১০৪টি কেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি হলো, ১২৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত হলো আওয়ামী মাস্তানদের প্রকাশ্য জালিয়াতি ও ভোট কেন্দ্র দখলের ঘটনায় পুলিশ ও নির্বাচনী কর্তারা পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা সাহেব তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললেন , নির্বাচন সার্বিকভাবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। গত বুধবার রাত ৯টায় নির্বাচন কমিশনার কার্যালয়ে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন তাঁর এই উৎফুল্ল মন্তব্য তুলে ধরছিলেন তখনই ৪১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিতের নিশ্চিত খবর পাওয়া গিয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বয়ং বলেছেন, স্থগিত কেন্দ্রের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আচরণবিধি লংঘন, আর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতি সত্ত্বেও কোথাও সেনাবাহিনী ডাকা হয়নি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাক্ষীগোপাল করে রাখাই কি তবে নির্বাচন কমিশন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্দেশ্য ছিল?

এর নাম যদি হয় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আর এই যদি হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার ধরন তাহলে দেশের মানুষ উচ্চকণ্ঠে এ কথাই বার বার বলবে, এমন নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই, এমন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও আমরা আর দেখতে চাই না, বাস্তবিকই, এবারের এই নির্বাচন ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খার ওপর দুরপনেয় কালিমা লেপন করেছে। যেন 'সাধু বেশে পাকা চোর'- এর ভূমিকাই নিপুণভাবে পালন করলেন কথিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ঘটনাগুলো আকস্মিক নয়, পূর্ব পরিকল্পিত। নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনার মধ্যদিয়েই জাল ভোট, প্রক্সি ভোট, ভাড়াটে ভোট যুক্ত করা হয়েছে, একের পর এক বুথ দখল করা হয়েছে, সর্বশেষে ভোট গণনা এবং ঘোষণার ক্ষেত্রেও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে বিএনপি প্রার্থীদের হারানো হয়েছে। কেবল বিএনপিই নয়, আওয়ামী মাস্তানি আর জালিয়াতির বেদনাদায়ক শিকারে পরিণত হয়েছেন জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং অনেক সচ্চরিত্র, জনপ্রিয় স্বতন্ত্র প্রার্থীও।

নির্বাচন '৯৬ এনজিও প্রশাসন কাল টাকা এবং কারচুপি-১৮৪

www.pathagar.com

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, বিএনপিকে ১০৪ আওয়ামী লীগকে ১৩৩, জাতীয় পার্টিকে ২৯, জামায়াতে ইসলামকে ২টি আসন দেয়া হয়েছে এবং ২৯টি আসনে ফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। গত পরশু রাত থেকেই নির্বাচনের ফল ঘোষণার ধরন দেখে সকলের কাছে পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে যে, নির্বাচনের প্রকৃত ফল নানা কৌশলে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেখা গেল, পোপালগঞ্জের ফলাফল নির্বাচন কমিশন রাত ১১টার আগেই ঘোষণা করলেন, অথচ রাজধানীর ফলাফল ঘোষণা করা হলো পরদিন সকালে। রাজধানীর ভোটকেন্দ্র গোপালগঞ্জের চেয়েও অনেক দূরে নাকি? রেডিও'র খবরে শোনা গেল বেশির ভাগ আসনে বিএনপি এগিয়ে , অথচ পরের টেলিভিশনের নিউজ বুলেটিনে দেখানো হলো আওয়ামী লীগ এগিয়ে। খবর পাওয়া গেল, বেশ কয়েকজন বিএনপি প্রার্থীর বিজয় প্রায় নিশ্চিত। কারণ, তারা অনেক ভোটে এগিয়ে। এর পরেই ওইসব আসনের কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বুলেটিনে প্রকাশ না করেই আওয়ামী প্রার্থীদের বিজয়ী বলে ঘোষণা দেয়া হলো।

নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুমের এইসব কন্ট্রোল্ড কারবার শুরু হওয়ার আগে যা কিছু ঘটেছে তা কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষেই সহনীয় নয়। জার্মানিতে তৈরি এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ' অমোচনীয় কালি' তুলে ফেলে হাজার হাজার জাল ভোট দিয়েছে আওয়ামী মাস্তানরা পুলিশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে। গোড়ান, মতিঝিল, লালবাগ, মিরপুরসহ প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় এই দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের অসংখ্য ভোটার একাধিক নির্বাচনী এলাকায় ভোট দিয়েছে। পুরান ঢাকার একটি নির্বাচনী এলাকায় কমপক্ষে দশ হাজার বহিরাগত নাগরিককে আওয়ামী প্রতীক বহন করে ভোট দিতে দেখা গেছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বেশির ভাগ ভোট কেন্দ্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করে প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে ইচ্ছেমতো দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করেছে। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম অভিযোগ করেছেন, চৌদ্দগ্রাম, ফেনী, শেরপুরে আওয়ামী মাস্তানরা জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্র দখল করেছে। শুধু চৌদ্দগ্রামেই ২৭টি কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়ে বাক্স ভর্তি করেছে তারা। একই ঘটনা ঘটেছে, জামালপুর জেলার ইসলামপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গফরগাঁও, ও সিরাজগঞ্জে। কুমিল্লার একটি আসনসহ রাজবাড়ী , ভোলা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহের অনেক ভোট কেন্দ্রে প্রশাসনের সহায়তায় আগের রাতেই ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করেছে আওয়ামী মাস্তানরা। এ ছাড়াও নির্বাচনের আগের রাতে ভোটারদের জানের হুমকি দিয়েছেন কোনো কোনো আওয়ামী প্রার্থী, নগদ টাকা-পয়সা, শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ করে নির্বাচনী আচরণবিধিও ভঙ্গ করেছেন তারা। এ ধরনের কোনো কোনো ঘটনার সচিত্র বিবরণও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

www.pathagar.com

এসব অপকীর্তি যে আওয়ামীওয়ালারা পরিকল্পিতভাবে করেছেন, তা অত্যন্ত পরিষ্কার। কারণ টিভি সাক্ষাৎকারেই আওয়ামী নেত্রী মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'আমাদের কিছু কৌশল আছে'। তাছাড়া নির্বাচনের দিনই আওয়ামী সমর্থক কয়েকটি পত্রিকা একই সুরে সম্পাদকীয় লিখেছে, যাতে ইনিয়ে- বিনিয়ে বলা হয়েছে, ফলাফল যাই হোক, মেনে নিন। হলুদ সাংবাদিকতায় যারা পারঙ্গমতা অর্জন করেছে এবং নির্বাচনের আগেই যারা কল্পিত কারচুপির নকশা আঁকেন, ফল না বেরুতেই তারা এমন কথা বলেন কিভাবে? নির্বাচন কমিশন কি ফলাফল দেবেন, তা তারা আগে থেকেই জানতেন নাকি?

এরপরও কি এই নির্বাচনকে 'গ্রহণযোগ্য' বলবার কোনো কারণ থাকতে পারে? আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, নির্বাচনের নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আওয়ামী নীলনকশার বাস্তবায়নের সাহায্য করে নির্বাচন কমিশন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা হারাতে বসেছেন। তাদের উচিত সত্যনিষ্ঠ হওয়া, প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং জনগণের প্রত্যাশা মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নচেৎ যে অমূল্য ক্ষতি হবে তার, দায়ভার সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের ওপরই বর্তাবে। এখানে স্মর্তব্য, দলীয় আমলাদের নির্বাচনী কাজে নিয়োগ করলে নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হবে না, সে বিষয়ে বিএনপি বার বার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যদের টহলদানের ব্যবস্থা না করলে কোথাও কোথাও দলবাজ আমলা, পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ যে 'বেড়ায় ক্ষেত খাওয়ার' ঘটনা ঘটাবে সে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলাম আমরা ৯ জুনের সম্পাদকীয় নিবন্ধে। আমাদের মন্তব্যই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। জেনেশুনেও সরকার এবং নির্বাচন কমিশন কেন সে সময় এই দাবীগুলোর ওপর উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন, তার সদত্তর তাদেরকে এখন দিতে হবে।

আমরা অন্তরের সমস্ত ঘৃণা দিয়ে নীলনকশার এই নির্বাচনের প্রতিবাদ করছি। নির্বাচনের রায় জনগণ মানবে কি মানবে না, সে সিদ্ধান্তই নিশ্চয়ই তারা দেবেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি নির্বাচনের নামে এমন প্রহসন, এমন পক্ষপাত ও অবিচার দেখবার দুর্ভাগ্য এই জাতিকে যেন আর কখনো বইতে না হয়। [১৪/৬/৯৬, দিনকাল]

নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব

২৭টি স্থগিত আসনের পুনঃ নির্বাচন নিয়ে সচেতন জনগণের মনে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল তা শেষমেষ সত্য বলে প্রমাণিত হলো। নির্বাচন কমিশন ১২ জুনের নির্বাচনে যে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, ১৯ জুনের পুনঃ নির্বাচনেও তার

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম ঘটেনি। সর্বত্রই চলেছে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীর পক্ষে ফলাফল ঘোষণার প্রাণান্ত চেষ্টা।

সিলেট-৫ আসনে প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহার করে ঘোষিত ফলাফল উল্টে দেয়া হয়েছে। এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী। তিনি গত ১২ জুন নির্বাচনের দিন ঘোষিত প্রাথমিক ফলাফলে ৮৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮৪টিতে ২৯হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের হাফিজ আহমেদ মজুমদার পান ২৭ হাজার ৫৬৪ ভোট। দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান দেখেই বোঝা যায়, স্থগিত একটি আসনের ওপর নির্ভর করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর জয়লাভ কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, সিলেটের প্রশাসন আওয়ামী লীগকে জেতানোর জন্যে ফলাফল পল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়। তারা জামায়াত প্রার্থীর ভোট কমিয়ে ২৮ হাজার ৭১ এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ভোট বাড়িয়ে ২৭৬৮৩ করে নির্বাচন কমিশনে সংশোধিত ফল পাঠায়। পূর্বে প্রাপ্ত জামায়াত প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান কমিয়ে ৩৮৮তে নামনো হয়। ১৯ জুন ১টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থী মাত্র ৫০ ভোট পান। পূর্বের প্রাপ্ত ভোটের সাথে স্থগিত কেন্দ্রের ৫০ ভোট যুক্ত হলেও তিনি যাতে বিজয়ী না হতে পারেন সেজন্যেই এই ষড়যন্ত্র ।

কুমিল্লা-৩ আসনেও ঘটেছে অনুরূপ পক্ষপাতিত্বের ঘটনা। এ আসনে আ'লীগ প্রার্থীকে পাস করানোর জন্য রিটার্নিং অফিসার নজিরবিহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেন। দৈনিক দিনকালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ আসনে জাতীয় পার্টির জনাব কায়কোবাদ বিজয়ী হবার পরও নির্বাচন কমিশন রহস্যজনক কারনে তাকে বিজয়ী ঘোষণা না করে বরং একটি কেন্দ্রে ফলাফল স্থগিত করে দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে জেতানোর জন্যই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ঘোষিত স্থগিত কেন্দ্রটির নাম ব্রাহ্মণচাপিতলা। এ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার প্রার্থীদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করে রেজাল্টসিট সই করে তাদেরকে কপি দিয়ে দেন। এতে দেখা যায়, এ কেন্দ্রে নৌকার প্রার্থী ৭শ ভোট এবং লাঙ্গলের প্রার্থী ২শ' ৬৬ ভোট পেয়েছেন। সর্বমোট ফলাফল যোগ করে দেখা যায়, জাতীয় পার্টির প্রার্থী পেয়েছেন ৫২ হাজার ৯০১ ভোট এবং নৌকার প্রার্থী পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৯৯৩ ভোট। হিসাব অনুযায়ী জাতীয় পার্টি ২ হাজার ৯শ' ৮ ভোটে বিজয়ী হন। কিন্তু রিটার্নিং অফিসার আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পাস করানোর জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাপিতলা কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশনে পাঠানো বন্ধ রেখে এ কেন্দ্রে গোলযোগের কথা বলে পুনরায় নির্বাচন দিতে বলেন। নির্বাচন কমিশন ২২ জুন এ কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

স্থগিত অন্যান্য আসনেও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি দৃশ্যমান। নারায়ণগঞ্জ- ২ ফেনী-২ এবং বরিশাল- ২ আসনে বিএনপি প্রার্থীরা যে পরিমাণ ভোটে এগিয়ে ছিলেন তাতে অন্য দলের প্রার্থীদের পক্ষে বিজয়ী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। নারায়ণগঞ্জ এবং ফেনীতে ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটকেন্দ্র আ' লীগের পক্ষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বরিশাল-২ আসনে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে গোলাম ফারুক অভির পক্ষে। বোঝাই যায়, বিপুল ভোটে এগিয়ে থাকা বিএনপি প্রার্থীকে হারানোর জন্যই এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়। হয়তো অনেক পিছিয়ে না থাকলে এ আসনটিও আ' লীগকে দিয়ে দেয়া হতো।

বলতে দ্বিধা নেই, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অঙ্গীকারাবদ্ধ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা দেখে আমরা হতভম্ব। নিরপেক্ষতার নামে তারা কারচুপি ও ভোট ডাকাতিকে যে ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে সবার কাছেই ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, একটি দল পর্যাপ্ত ভোট না পেয়েও যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারে, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকের ধারণা, ১২ জুনের নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির ঘটনা নিয়ে যদি কোনোরূপ প্রতিবাদ না হতো তবে স্থাগিত সবক'টি আসনের ফলাফলই তাদের পছন্দনীয় দলের পক্ষে ঘোষণা করা হতো যাতে সরকার গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট দলটিকে কারো ওপর নির্ভর করতে না হয়। এই যদি হয় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষতার নমুনা- তাহলে নিরপেক্ষতার সংজ্ঞাটি নতুন করে নির্নীত হওয়া উচিত। [২১/৬/৯৬, দিনকাল]

নির্বাচনের আগের রাতে দান-খয়রাত

ঢাকা শহরে গতকাল রিকশা চলাচল ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই সামান্য। দেখা গেছে, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও এর চেয়ে বেশি রিকশা চলাচল করে।রিকশার এই সংকটের কারণে গতকাল ধকল পোহাতে হয়েছে অনেক ভোটারকে, বিশেষ করে যারা ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির পর বাসা বদল করে চলে গেছেন দূরে কোথাও। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচন উপলক্ষে যেখানে বেশি রিকশা চলাচল করার কথা, সেখানে রিকশার এমন টানাপোড়েন কেন?

বলা প্রাসঙ্গিক, নির্বাচনকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করার জন্য গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আজ সকাল ছ'টা পর্যন্ত প্রাইভেট গাড়ী যথা- মোটর সাইকেল, বেবী টেক্সি, মাইক্রোবাস, জীপ ইত্যাদি যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এ জন্যও রিকশার ওপর বাড়তি চাপ পড়ার কথা।

বিষয়টি নিয়ে গতকাল অনেক ভোটারকেই জল্পনা করতে দেখা গেছে। তবে রহস্য আবিষ্কার হতে বেশি সময় লাগেনি। কয়েকজন রিকশা চালকের সঙ্গে আলাপ করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার সারসংক্ষেপ হচ্ছেঃ নির্বাচনের আগের দু'দিন যারা হঠাৎ দৈব সম্পত্তি পাওয়ার মতো ঘরে বসেই কিছু চাল-ডাল, শাড়ি, লুঙ্গি এবং চকচকে পাঁচশ' টাকার নোট হাতে পেয়েছেন, তাদের বেশির ভাগই নির্বাচনের দিন রিকশা নিয়ে রাস্তায় নামেননি।

www.pathagar.com

রিকশা চালকদের দেয়া তথ্য যে মোটেও অমূলক নয় তা গতকালের দিনকালের প্রকাশিত এটি খবর থেকেও আঁচ করা গেছে। খবরটি হচ্ছে নির্বাচনের আগের দু'দিন ঢাকা-৬ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে মতিঝিল-সবুজবাগ এলাকার বিভিন্ন বস্তি এবং কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় বিপুল পরিমান শাড়ি, লুঙ্গি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা -পয়সা বিতরণ করেছেন।

নির্বাচন কমিশন হয়তো রিকশা সংকটের কারণ নিয়ে কোনোরকম মাথা ঘামাবে না। এ নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর কথাও নয়। তবে কোনো কোনো প্রার্থী কর্তৃক সমাজের দরিদ্র বিত্তহীন মানুষের মধ্যে শাড়ি- লুঙ্গি, চাল ডাল ও নগদ টাকা বিতরণের অভিযোগসমূহ যে মোটেও মিথ্যা নয়, তা এ ঘটানা থেকে খুবই পরিষ্কার।

গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে শাড়ি, লুঙ্গি ও নগদ টাকা বিতরণ নিশ্চয়ই খারাপ কোনো কাজ নয়। বিত্তবানরা বিত্তহীনদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক এটা সবাই চায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দান-খয়রাত নির্বাচনের আগের রাতে বা নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে কেন? বলা দরকার, সাবের হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও তার কার্যকলাপ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় খবরাখবর ছাপা হয়েছে, বিশেষ করে ভোটারদের ঘরে ঘরে মিষ্টি ও ফুল বিতরণের ঘটনাটি সবার জানা।

নির্বাচনী আচরণবিধির ৩নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্য বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না। অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।

আইন খুবই ভাল জিনিস যদি তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে আইনের যদি বাস্তব প্রয়োগ না থাকে তবে তা থাকা আর না থাকা সমান কথা। সাবের হোসেন চৌধুরী জিতবেন, না হারবেন তা এ নিবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে তখন বলা মোটেও সম্ভব নয়। তিনি জিতুন বা হারুন সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়, তিনি জিতেছেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে নির্বাচনী আইন লংঘনের যেসব অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গুরুতর। এসব অভিযোগের ব্যাপারে যদি উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে নির্বাচনী আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, আইন লংঘনকারীরা যদি কোনোক্রমে বিজয়ী হন তবে তাতে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে যে, যারা নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলবেন তারাই ঠকবেন।

কাজেই নির্বাচন কমিশন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন বলে আমরা আশা করছি।
[১৩/৬/৯৬, দিনকাল সম্পাদকীয়]

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করে বিদায় নিলেন হাবিবুর রহমান

আবদুস শহিদ

সমস্যার সমাধান করতে এসে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুললেন। জাতির সামনে একরাশ জ্বলন্ত প্রশ্নের জন্ম দিয়ে হাজারো অভিযোগের বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদায় নিলেন তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ৮৬ দিনের সংক্ষিপ্ত সময়েও তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে ব্যর্থ হলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন নির্দলীয় লোক হলেই নিরপেক্ষ থাকবেন এমন আশা করা বুঝি দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় '৯১ সালের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে নির্বাচন এতই নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল যে কেউ এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ -আপত্তি তুলতে পারেননি। সেই নির্বাচনকে সুষ্ঠু নির্বাচনের মডেল ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এমন আকাঙ্খা জেগেছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।

একারণেই শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হলো। এ নিয়ে গড়ে ওঠলো জাতীয় ঐক্যমত্য। ভবিষ্যতের সকল সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের আইন প্রণীত হলো। রাজনৈতিক দল, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে প্রত্যাশা জেগেছিল একটি সচ্ছ সহনীয় গ্রহণীয় নির্বাচন উপহার দেবেন হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। নির্বাচনের আগে থেকেই অনেক অভিযোগ ওঠেছিল। সেসব অভিযোগ পড়ে থাকে নিষ্পত্তিহীন অবস্থায়। শেষ পর্যন্ত ১২ জুন নির্বাচন চলাকালে অনেক ভোট কেন্দ্র অভিযোগ আসতে থাকলো নির্বাচন কমিশনে। আর নির্বাচন শেষে একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া সবক'টি দলই কেন্দ্র দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের এজেন্ট বিতাড়ন, একটি বিশেষ প্রতীকে সীল মারা একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোটগ্রহন কর্মকর্তা, আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিতদের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কু- কারচুপির বিস্তর অভিযোগ উত্থাপনকারী '৯১ র নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি, আওয়ামী লীগের আন্দোলনের

www.pathagar.com

সহযোগী জাতীয় পার্টি , কেয়ারটেকার সরকারের রূপকারের দাবিদার দল জামায়াতে ইসলামী, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ অংশগ্রহণকারী প্রায় সবক'টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনেছে। এমনকি আওয়ামী লীগের কমপক্ষে দেড় ডজন প্রার্থী নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ করেছে। সর্বশেষ পুনঃ নির্বাচনের আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শুধু নিজেকেই বিতর্কিত করে যাননি, মীমাংসিত বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার গলায় বিতর্কের মালা পরিয়ে দিয়ে গেছেন।বিতর্কিত করে গেছেন প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনকেও।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩০ মার্চ সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। ৪ দিনের মধ্যে ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ পরিপূর্ণ হলো। দফতর বণ্টন হলো উপদেষ্টাদের মধ্যে। দেখা গেল গুরুত্বপূর্ণ ৩টি মন্ত্রণালয় সংস্থাপন, স্বরাষ্ট এবং তথ্য দফতর তিনি নিজের হাতে রাখলেন। সার্বিক মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে এই ৩টি মন্ত্রণালয়ের নিরপেক্ষতা নিয়েই বেশি অভিযোগ- আপত্তি ওঠেছে।

শুরুতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রজাতন্ত্রের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানালো। এই কর্মকর্তারা রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। প্রধান উপদেষ্টা নির্বিকার থাকলেন। শুরুতে বক্তব্য ভাষণে তিনি এমন কিছু কথা বললেন, যাতে এটা বুঝা যায় তিনি নিরপেক্ষ থাকার চর্চা করছেন।

বিসমিল্লাহ উচ্চারণ না করে করুণাময়ের নামে..... বাংলাদেশ জিন্দাবাদ না বলে বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক..... বলার ওপর খুবই গুরুত্ব দিলেন তিনি। কিন্তু একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের দাবি উপেক্ষা করলেন।

শুরুতে এটাও বলেছিলেন, প্রশাসন সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তার আশু তদন্ত করা হবে। পুলিশ ও কর্মকর্তাদের বলেছিলেন কর্তব্যে গাফিলতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দ্বিধা করবে না। মুখ ফসকে একবার বলে ফেললেনঃ সরকারি কর্মকর্তাদের কোনো দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ নেই। এরপরই দেখা গেলো জনতার মঞ্চে একাত্মতা প্রকাশকারী ৮ জনকে জেলা প্রশাসক পদে পোষ্টিং দিয়ে তাদের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হলো। অন্তত নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে ওই কর্মকর্তাদের সরিয়ে রাখার দাবি জানালো বিএনপি কিন্তু বিষয়টি কানেই তুলেননি প্রধান উপদেষ্টা। তিনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অথচ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এমনকি নির্বাচন ঘণিয়ে আসার মুহূর্তেও দলবিশেষের সুবিধামত পুলিশ প্রশাসনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের পোষ্টিং দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

জনাব হাবিবুর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই পুলিশ সারাদেশে বেছে বেছে বিএনপি কর্মীদের গ্রেফতার শুরু করে। অনেক স্থানে বাড়িতে হকিস্টিক পাওয়ার অজুহাত তুলেও গ্রেফতার করা হয়। শ' শ' মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। ফেনী, ভোলা, খুলনা, নারায়ণগঞ্জে এরকম অনেক ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে অবহিত করা হয় জনাব রহমানকে। তাকে জানানো হয়, পুলিশের পক্ষপাতিত্বের কারণে খালি হাতে ফেনী শহরে ঘর থেকে বের হতে পারছে না বিএনপি কর্মীরা। অথচ পুলিশের চোখের সামনে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা। বারবারই 'দেখবো' 'দেখছি' বলে মামুলি ধরনের আশ্বাস দেন তিনি। ঢাকার লালবাগে ছাত্রদল নেতা হত্যা, হাসপাতাল থেকে লাশ ছিনতাই করে মিছিল, ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মঞ্চ তৈরি করে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে অব্যাহত বিষোদগারের পরও কোনো পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। তথ্য মন্ত্রণালয় জনাব রহমানের দায়িত্বে থাকলেও শুরু থেকেই রেডিও টিভি ছিল আওয়ামী লীগের দখলে। ওই দলটির প্রচার প্রচারণার গুরুত্ব দিয়েছে এদু'টি সরকারি মাধ্যম।

সর্বশেষে নির্বাচনের ফলাফল প্রচারে যে নাটকের জন্ম দিয়েছে রেডিও-টেলিভিশন সে সম্পর্কে জনাব হাবিবুর রহমান আগাগোড়া নীরব থেকেই বিদায় নিয়েছেন। ১৩ জুন রাতে ও পরদিন সকালে রেডিওতে একবার প্রচার করা হয়েছে বিএনপি প্রার্থীরা ১১৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছে, একই সময়ে টেলিভিশন বলেছে এ সংখ্যা ১০৭। অন্তত ১৫ জন প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে পরে তা আবার পাল্টে দেয়া হয়েছে। দূরবর্তী অঞ্চলের আসনগুলোর ফলাফল প্রচার করা হয়েছে সন্ধ্যা এবং রাতে। গভীর রাতেও রাজধানীর ফলাফল পাওয়া যায়নি। পরে দেখা গেল বিএনপি'র বেশি সম্ভাবনাময় আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এসবই অভিযোগ আকারে যথা সময়ে উত্থাপন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনে। অভিযোগ-আপত্তির নিষ্পত্তি না করে দ্রুততম সময়ে সরকারি ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেছে গেজেট আকারে।

সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা দমন করে প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ দিলেন। তিনি পূর্বাপর ঘটনা জনগণকে অবহিত করলেন। প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করেই ব্যবস্থা নিয়েছেন। অথচ জনাব হাবিবুর রহমান তাঁর কথার মারপ্যাচে সারাদেশে জনগণের মধ্যে বাড়তি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও তার পরিষদ গঠিত হয়েছিল একটি মাত্র মূল উদ্দেশ্য নিয়ে-তা হলো অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। সকল পক্ষ এবং জনগণ মনে করেছিল একটি স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি সকল সন্দেহ-সংশয়ের ফয়সালা করে যাবেন। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট করে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে গেলেন তিনি জাতিকে। কেউ বলতে পারছে না জাতি এখন কোন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা করবে। [দিনকাল ১৯/৬/৯৬]

www.pathagar.com

মিম্‌মা প্রকাশন, ঢাকা